কালাচাঁদ।

প্রথম পর্ব্ব—আদিকথা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

১২৪৩ সালে, ভাদ্র মাসে সপ্তবিংশতি দিবসে, কৃষ্ণপক্ষে, অমাবস্যারজনীতে, শনিবারে মামার বাড়ী কালাচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। রংটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। জন্মিবার সময় কালাচাঁদের পিতা জীবিত ছিলেন না। মা, ছেলেকে মানুষ করেন।

ছেলেটী কালক্রমে পাড়ার 'কেষ্টঠাকুর' হইয়া উঠিল। দূর হইতে ঢিল মারিয়া গোয়ালিনীর কেঁড়ে ভাঙ্গা, ছোট ছোট ছেলের আঁচল হইতে মুড়ী গুড় কাড়িয়া লওয়া, গাছে উঠিয়া নৃত্য করা—অল্প দিন মধ্যেই তিনি এই তিন কার্য্যে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে দেহখানি দীর্ঘে প্রস্থে সুবিশাল হইল। তখন তিনি পাঁচীর ডিঙ্গাইয়া পড়িতে লাগিলেন। আম, তাল, নারিকেল—এই বৃক্ষত্রয়ে উঠিবার বিশেষ কৌশল শিখিলেন। স্ত্রী হউক, আর পুরুষই হউক, বৃদ্ধ অথবা বালকই হউক—দূরে অদূরে লোক দেখিলেই, তাহাকেই হঠাৎ গালি দেওয়া তাঁহার গুণ জন্মিল। কেহ ধর্-ধর্ করিয়া ধরিতে গেলে, তিনি এমনি বেগে দৌড়িয়া পালাইতেন যে, কেহই তাঁহার নাগাল পাইত না।

কালাচাঁদের পিতা না থাকুক, একমাত্র মাতা হইতেই তাঁহার সর্ব্বদুঃখ দূর হইয়াছিল। একদিন, আশ্বিন মাসে, তিনি একটী আম হাতে করিয়া দৌড়িতেছেন। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক তাঁহার পিছু পিছু ছুটিতে ছুটিতে বলিতেছেন;—"ওরে বাছা, তুই কি কল্লিরে!—নোকলা গাছে ঐ একটী আম মায়ের ভোগের জন্য আছে; দে, বাছা দে—"

কালাচাঁদ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া নক্ষত্রবেগে মায়ের ঘরে ঢুকিয়া খিল দিয়া, আমে কামড় দিলেন। বৃদ্ধাও হাঁপাইতে হাঁপাইতে, সেই গৃহে উপনীত হইল। কালাচাঁদের মা তখন চামুণ্ডা মূর্ত্তি ধরিয়া, এলোচুলে, চোখ কপালে তুলিয়া, গাছকোমর বাঁধিয়া, হাত নাড়িয়া বৃদ্ধাকে বলিতে লাগিলেন, "হেঁগা! তুমি কেমন মেয়ে গা? আমার দুধের ছেলেটাকে কিনা বাড়ী-ব'য়ে মাতে এসেছ?—তোমায় পাড়া-সম্বন্ধে মাসী-ব'লে মান্য করি তাই, তা না হলে, আজ দশ কথা শুনিয়ে দিতাম।"

বৃদ্ধা। সে কি মা?—নূতন গাছে নূতন ফল ফলেচে, একটী বৈ আম নাই—সবে ডাঁসিয়েছে—এখনও পাকে নাই—ঐ আমটী মায়ের অষ্টমীতে ভোগ দেবে ব'লে আমার ছেলে রেখেছে;—তোমার ব্যাটা কিনা, তাই আজ লুকিয়ে পেড়ে নিয়ে পালিয়ে এলো! আমার ছেলে শুন্‌লে ব'ল্‌বে কি?—আমটী দিতে বল মা—দিতে বল—

মা। তবে ল্যা—বুড়ী ডাইনী!—তুই আমাকে ছেলের মুখের গরাস কেড়ে নিতে বলিস্ নাকি?—বুড়ো বয়সে, দুধের ছেলের পেছু পেছু দৌড়ুতে তোর লজ্জা করে না? আমার ছেলেকে

বালক-কালাচাঁদ আমগাছে উঠিতেছেন।



এমন তাড়া ক'রে এলে, ছেলে যে কাহিল হয়ে যাবে—ছেলের যে রোগ-ভেরী জন্মাবে!

বৃদ্ধা। তুমি মেয়ে, কেমন গা?—ছেলে শাসন কর্‌বে না—আমাদিগকে কেবল তুমি গাল দেবে?—সেদিন তোমার ছেলে একটী চারা আমগাছ কেটে দিয়ে এলো,—আমি আমার ছেলেকে বুঝিয়ে বল্‌লাম, ছেলেয় কেটেছে, তার আর কি হবে?—আজ কিনা মা, আবার—

তখন কালাচাঁদের মা ঝাঁটা হাতে করিয়া, কালভৈরবীর ন্যায় দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"বেড়ো আঁটকুড়ী, ডাইনী, হতভাগী—তোর মেয়ে-মুখে পুরুষ-কথা?—মেয়ে-মদ্দানী মাগী। দূর হ—আমার বাড়ী থেকে—তুই জানিস্, ঝেঁটিয়ে এখনি বিষ ঝেড়ে দিব—"

হাঁকাহাঁকিতে লোক জড় হইল। বৃদ্ধা ব্যাপার দেখিয়া ম্লানমুখে ফিরিয়া ঘরে গেল।

তখন কালাচাঁদ-জননীর দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়িল। সমাগত রমণীমণ্ডলীকে ক্রন্দনের সুরে তিনি বুঝাইয়া বলিলেন, "ঐ বুড়ীমাগী আমার ছেলেকে গাল দিয়েছে, মেরেছে—আবার কিনা, বাড়ী ব'য়ে মাত্তে এয়েছিল! আমার পোড়া অদেষ্টে আমার আর "সে" বেঁচে আছে কি? আজ যদি "সে" থাক্‌তো,—তাহ'লে, ও কেমন মিত্তিরদের বড়গিন্নি, তা আমি বুঝে নিতুম।—"

সকলে চলিয়া গেলে, কালাচাঁদ খিল খুলিয়া হাসিতে হাসিতে বাহির হইলেন। আমটীর তখন পূর্ণগ্রাস ঘটিয়াছে, আঁটীর ছাল পর্য্যন্ত ছিঁড়িয়াছে,—তথাচ তখনও তিনি আঁটী চুষিতেছেন। মা আদর করিয়া পুত্রকে ডাকিলেন, "এস, আমার যাদু এস, ধন এস, মাণিক এস,—বল'ত বাবা তোমায় কে বকেচে? কে মেরেছে?"

জননীর ডাকে কালাচাঁদ অবশ্যই নিকটবর্ত্তী হইলেন না। তিনি এদিক্-ওদিক্ উঁকিঝুঁকি মারিয়া চাহিতে লাগিলেন। শেষে উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"মা, আমি যে হ'রে বামুনদের গাছথেকে পেয়ারা চুরি ক'রে ছিঁড়ে এনেছিনু, সে পেয়ারাটা কোথা গেল—মা?"

মা। সে পেয়ারা, বাবা আমি তোমার জন্তে লুকিয়ে তুলে রেখেছি;—দিচ্চি, নাওসে বাবা—

বামহাতে করিয়া পেয়ারা খাইতে খাইতে, ডান হাতে ছিপ লইয়া, কালাচাঁদ মাছ ধরিতে বাহির হইলেন। যাত্রাকালে কালাচাঁদের মা বলিয়া দিলেন, "বাবা আজ একটা পাঁচ সের রুই ধর্‌তে পারিলে বাহাদুর বল্‌বো।"

বলা বাহুল্য কালাচাঁদের মায়ের বা মামার গ্রামমধ্যে একটীও পুকুর ছিল না।

কালাচাঁদের বয়স নয় বৎসর পূর্ণ হইয়া দশে পড়িয়াছে। তিনি দত্তকুলোদ্ভূত কায়স্থ-সন্তান। নিবাস বর্দ্ধমান জেলায় কোন পল্লীগ্রামে।

এই সময়, কালাচাঁদ এবং তাঁহার মাতার বিক্রমে গ্রামবাসী সশঙ্কিত হইল। ঘোষেদের বাড়ী দুর্গোৎসব। কালাচাঁদ সপ্তমী-পূজার দিন রাত্রে, সকলে ঘুমাইলে, মাদুর্গার মুকুট এবং আঁচলা খুলিয়া লুকাইয়া ঘরে পলাইয়া আসেন। কালীপূজার রাত্রে, কালাচাঁদ আগুন লইয়া খেলা করিতে করিতে মজা দেখিবার জন্য, মিত্রদের খড়ের গাদায় আগুন ধরাইয়া দেন। এই ঘটনার কয়েক দিন পরে, গ্রামের কয়েকজন বিজ্ঞব্যক্তি কালাচাঁদের মাকে বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া বলিল, "তোমার ছেলেকে পাঠশালে

কালাচাঁদ খড় গাদায় আগুন ধরাইতেছেন।



লিখিতে দাও, কায়েতের ঘরে মূর্খ হয়ে থাক্‌লে, শেষে বড় কষ্ট পেতে হয়।"

কালাচাঁদ-জননী তখন ভয়-চকিত হইয়া বলিলেন,—"বাপ্‌রে! আমি এখন তা পার্‌বো না;—এই আমার দুধের ছেলে,—তার বয়েসই বা কি!—সব কথাও এখন তার ফুটে নাই; যাক্‌ যাক্‌, আরও দুচার বছর যাক্‌,—একেবারে স্কুলেই পাঠিয়ে দিব। আর আমার ছেলে যে রোগা,—এই এক ছটাক চেলের ভাতও সে খেতে পারে না—গুরুমোশায়ের কাছে পাঠশালে লিখ্‌তে গেলে যে, আরও কাহিল হ'য়ে যাবে।"

বিজ্ঞব্যক্তিগণ বিফলমনোরথ হইয়া, "কালাচাঁদ কাহিল কিসে"—এই কথা ভাবিতে ভাবিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

ক্রমশ, মায়ে-পোয়ের প্রাদুর্ভাবে গ্রাম যায়-যায় হইল। বাসু-কির ফণা কাঁপিল। ভগবানের বুঝি সৃষ্টিলোপের ভয় হইল। তখন হঠাৎ জ্বররোগে কালাচাঁদের মায়ের মৃত্যু ঘটিল। কতক সুবিধা হইল। অর্দ্ধেক প্রাণ ধড়ে আসিল!

কালাচাঁদের মামা বর্দ্ধমানে মোক্তারী করিতেন। তিনি, সমগ্র গ্রামবাসীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, লেখাপড়া শিখাইবার জন্য, কালচাঁদকে বর্দ্ধমানে লইয়া গেলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মামা মোক্তার। বর্দ্ধমানের বাসাটী দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। বাড়ী দুইখণ্ড। অন্দরে বালি-চূণকামবিহীন ইটের একতালা একটা পুরাণ ক্ষুদ্র 'দালান'। বাহিরে, দুইপাশে-দুই-কুঠারি, মধ্যে-চাতালবিশিষ্ট খ'ড়ো বৈঠকখানা। তুলসীমণ্ডপ দুইটী; একটী সদরে, একটী অন্দরে। ঘরদ্বার পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইলেও, অতি যত্নে সুরক্ষিত বলিয়া, এখনও যেন ঝক্-ঝক্ করিতেছে।

মামা নবীনও বটেন, প্রবীণও বটেন। বয়স ৪৫ বৎসরেরও বেশী হইবে কি? হ্রস্বও নন, দীর্ঘও নন। শরীরে আজও শক্তি বিলক্ষণ। আজও পাঁচ সাত ক্রোশ পথ হাঁটিতে তাঁহার কষ্টবোধ হয় না। প্রত্যহ প্রাতে স্নানের পর কলাপাতে একশত-আটটী কৃষ্ণনাম লিখিয়া জলগ্রহণ করেন। সন্ধ্যার পর মালা লইয়া সহস্রাধিক হরিনাম জপ করা হয়।

মামা দিব্য ফিট্‌ফাট। বাউরি চুলে কলপটী যথানিয়মে লাগান আছে। সপ্তাহান্তে যথানিয়মে গোঁফ ছাঁটাই হয়। গামছাখানির রঙ চাঁপাফুলের মত। এত যত্নে কাছারির কাপড় পরেন যে, এক-মাসেও তাহা কালো হয় না। একজোড়া চটী জুতায় আড়াই বৎসর যায়। বিছানা, বালিস সাদা ধপ্‌ধপে। অন্দরের খাটের গদী এবং বাহিরের বৈঠকখানার সতরঞ্চ বহুপুরাতন হউক,—কিন্তু এখনও কাজের বাহির হয় নাই। মামার অঙ্গে ময়লা নাই, ঘরে ধূলাবালি নাই।

মামা আজিকালি বৎসরান্তে একবার বাটী যান। ৺শারদীয়া পূজায় বন্ধে গিয়া, কার্ত্তিক পূজার পর বর্দ্ধমানে আসেন। ছেলে হয় নাই বলিয়া পূর্ব্বে দেশে কার্ত্তিক পূজা করিতেন; এক্ষণে চারি বৎসর হইল, সহধর্ম্মিণীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সে পূজা বন্ধ করিয়াছেন। মামার পুত্র নাই, চারিটী কন্যা মাত্র। কন্যাগণ বিবাহিত—শ্বশুর বাটীতে ঘর-কন্না করে। সুপাত্রে কন্যাদান করিয়া মামা নিশ্চিন্ত।

বলা বাহুল্য, সেকালে সহরে, কর্ম্মস্থানে পরিবার আনার প্রথা তত প্রচলিত ছিল না। সুতরাং মামী ইহজীবনে কখন বর্দ্ধমান দেখেন নাই।

বাড়ীটী কার? ভাড়াটে, না মামার নিজের? নিজের বলিয়াই বোধ হয়। ভাড়া ত কেহ লয় না, আর তিনি কাহাকেও ত দেন না। বৈঠকখানা ছাওয়াইতে হইবে, মামা নিজে জন-মজুর করিলেন, নিজ বাক্স হইতে তাহাদের মজুরি দিলেন।

মামা নিজে রাঁধেন। স্বপাক ভিন্ন খান না নাকি? মামা স্বয়ং রাঁধেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় না। একটী স্ত্রীলোক বাটনা বাটিয়া, কুটনা কুটিয়া, মাছ বাছিয়া, চাল ধুইয়া, ডাল পাছড়িয়া, উনান ধরাইয়া সমস্ত উদ্যোগ-সংযোগ করিয়া মামাকে ডাকে,—"এস, ৺মত্তিরজা—এসগো,—সব তৈয়ের হয়েছে,—সব তৈয়ের হয়েছে,—বেলা হলো।" সেই স্ত্রীলোকের পরিদর্শন-গুণে, রন্ধনে মামার পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইত।

স্ত্রীলোকটী কোন্ জাতি বলিব না। তবে এইমাত্র বলিব, সে ব্রাহ্মণ বা কায়স্থের মেয়ে নহে। বর্ণটী আধ-ময়লা; তবে মেজে-

ঘষে এক রকম দেখায়। পরিধান রাঙ্গাপেড়ে কাপড়। গলায় সোণার দানা। হাতে রূপার তাগা। স্ত্রীলোকটী কর্ম্মিষ্ঠা। ঘরঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, বিছানা করা প্রভৃতি সমস্তই তাহার দ্বারা সম্পাদিত হয়। গৃহিণী বলুন, চাকুরাণী বলুন, আর যাহাই বলুন, সবই সেই সে। একটা বুড়ো ঠিকে চাকর আছে, সে হাট-বাজার করে, কখন বা বাহিরে তামাক-টামাক সাজে; বাকী গৃহের সমস্ত কাজই স্ত্রীলোকটীর দ্বারা সুসাধিত হয়।

স্ত্রীলোকটীর নাম করুণাময়ী। কোষ্ঠীতে বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হইলেও, মামার ধারণা ছিল, করুণার বয়স বাইশের অধিক নহে। করুণার স্বভাব বিনয়-নম্র, প্রকৃতি ধীর। তবে মামার সঙ্গে মাঝে মাঝে তাহার গণ্ডগোল হইত। মামাকে দু'দশ কথা শুনাইয়াও দিত। সে সময় মামা কিন্তু বড় বেশী কথা কহিতেন না। প্রায়ই নীরব হইতেন। ঝগড়ার পর আর মুহূর্ত্তকালও করুণাময়ীর রাগ থাকিত না। আবার যে-ভালমানুষ, সেই ভাল মানুষ। হয়ত কখন কখন সে, মামার তোষামোদ করিতে বাধ্য হইত।

মামা, সমবয়স্কগণের নিকট, করুণাময়ীর বড়ই প্রশংসা করিতেন। বলিতেন, করুণা উনুনের গোড়ায় মুখটী দিয়ে, একবার ফুঁ দিলেই অমনি আগুন জ্বলিয়া উঠে। করুণা পিতলের বাসন মাজিলে ঠিক সোণার হয়, কাঁসার বাসন মাজিলে ঠিক রূপার হয়। গ্রীষ্মকালে করুণার কলসীর জল ঠাণ্ডা, শীতকালে ঈষৎ গরম। কখন বা বলিয়া ফেলিতেন, অমন সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী বুঝি আর নাই!

পাড়ার লোক বলিত, মামার কপাল ভাল। কেহ কেহ

কাণা-কাণি করিত, অদৃষ্টের তেমন জোর না থাকলে কি, মামা এমন দু-মহল বাড়ীটা অমনি অমনি ভোগ-দখল করিতেছেন?

বাড়ীটা কার? করুণাময়ীর কি?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদের একাদশ বৃহস্পতি। মা মরিল ভাল হইল; সুখ বাড়িল। বর্দ্ধমানে আসার পর, কালাচাঁদ আদরের অনন্ত ক্ষীরোদ-সমুদ্রে একবারে ডুবিলেন। ঐশ্বর্য্যের সীমা রহিল না।

বিধাতার বিচিত্র লীলা কে বুঝিবে? করুণাময়ী কালাচাঁদকে এত ভালবাসিল, এত যত্ন-সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিল যে, তাহা দেখিয়া অনেকে অবাক্ হইল। কালাচাঁদের কোন কাল্পনিক কষ্ট হইলেও, করুণার অন্তর কাঁদিত। কালাচাঁদকে খানিকক্ষণ না দেখিলে, করুণা তাহাকে দশবার ডাকিতে পাঠাইত।

বাপ-পিতামহ যাহা কখন দেখে নাই, কালাচাঁদ তাহা দেখিলেন। সাটিনের জামা, শান্তিপুরে কাপড়, বার্ণিস-করা জুতা,—এসব কালাচাঁদের শ্রীঅঙ্গে উঠিল। সকালবেলা উঠিয়াই ঘর-গেয়ের আধ সের কাঁচা দুধ এবং খানিক মাখম, তাঁহার উদরস্থ হইতে লাগিল। বৈকালে দশ-বার-খানি গরম গরম ফুল্কা লুচি তিনি অবলীলায় জলযোগ করিতে লাগিলেন। দেহ ফুলিয়া উঠিল। এ-মাসের জামা, ও-মাসে গায়ে হয় না। করুণাময়ীর হৃদয়ে আনন্দ আর ধরে না।

এইরূপে তিন মাস অতীত হইলে, কালাচাঁদ বর্দ্ধমান-রাজস্কুলের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। ক্লাসের এক অপূর্ব্ব বাহার হইল! পাঁচ-ছয়-সাত বৎসরের ছোট ছোট ছেলে ক, খ, গ, অক্ষর চিনিতেছে; কেহবা বড় গাছ, ছোট পাতা, লাল ফুল পড়িতেছে; কেহবা 'প্রতিদ্বন্দ্বী' বানান শিখিতেছে, তার মাঝে পূর্ণদশবর্ষবয়স্ক, হৃষ্টপুষ্ট, দীর্ঘাকার, নিরক্ষর কালাচাঁদ শোভিতে-ছেন। ক্ষুদ্র তারাদল মাঝে যেন অমাবস্যার কালো রঙের পূর্ণচন্দ্র বিরাজ করিতেছেন! কোমল কলাগাছের ঝাড় যেন বৃহৎ বট-বৃক্ষের আওতায় আশ্রয় লইয়াছে। ছোট ছোট রুইপোণার ঝাঁক যেন তেজী চেতলমাছের সম্মুখে পড়িয়াছে। অধিক কি, মাষ্টারটীও একটু বিব্রত হইলেন। তিনি অন্যান্য ছেলেকে পড়া বলিয়া দেন, আর মাঝে মাঝে কালাচাঁদের চেহারা পানে চাহিয়া দেখেন।

প্রথমমাসে কালাচাঁদ সাতখানা প্রথমভাগ ছিঁড়িলেন। পড়ার তেজ দেখিয়া, করুণার আনন্দ হইল।

দ্বিতীয় মাসে ক্লাসের ছেলেদের বৈ চুরি যাইতে আরম্ভ হইল। ক্রমশ কাগজখানা, পেনসিলটা, কলমটা পর্য্যন্ত টান ধরিল। কখন কম, কখন বেশী, প্রায় একবৎসর কাল এই ভাবেই চলিতে লাগিল। কিন্তু চোর কেহ ধরিতে পারিল না। কালাচাঁদ এই এক বৎসরে উনপঞ্চাশখানা প্রথমভাগ ছিঁড়িয়া দ্বিতীয়ভাগ ধরিলেন।

দ্বিতীয় বৎসরও চুরি যথানিয়মে চলিতে লাগিল। সমগ্র শিক্ষকমণ্ডলী এ চুরি নিবারণের কিছুই উপায় স্থির করিতে পারি-লেন না।

তৃতীয় বৎসর কালাচাঁদ, বাঙ্গালা তৃতীয়ভাগ এবং ইংরেজী

ফাষ্টবুক আরম্ভ করিলেন। এবার চুরির কিছু বেশী প্রাদুর্ভাব হইল। পকেটে এই পয়সা আছে, আর খানিক পরে, পকেটে হাত দিয়া দেখি, পয়সা আর নাই! সকলে অবাক্! বড় বড় সেলেট যেন যাদুমন্ত্রে উড়িয়া যাইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে মাষ্টারদের ভাল ভাল ছাতাও হারায়। স্কুল-লাইব্রেরির ওয়েবষ্টার-ডিক্সনারীখানি একদিন আর দেখিতে পাওয়া গেল না। বিষম বিভ্রাট! মহাহুলস্থুল কাণ্ড!!

অনেকেরই দ্রব্যাদি হারাইল, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কালাচাঁদের কোন জিনিস চুরি গেল না। কেহ কেহ সন্দেহ করিল,—কালাচাঁদই চোর। এ কথা হেডমাষ্টারের কাণে গেল। তিনি বলিলেন, "তা'ও আমার মনে হয় না। কালাচাঁদ ঝগ্‌ড়াটে বটে, বালকগণের সঙ্গে মারামারি করে বটে,—কিন্তু তা ব'লে চোর হবে কি?"

একদিন দ্বিতীয়শ্রেণীর কোন এক বালকের একখানি দু-মুখো রজসের ছুরী হারাইল। বেলা দুইপ্রহরের সময় ছুরী চুরি যায়; বেলা ১টার সময় কালাচাঁদ চৌর্য্য-অপরাধে অভিযুক্ত হইলেন। এ কথা শুনিয়া, কালাচাঁদ কখন হাসেন, কখন কাঁদেন, কখন বা রাগ করেন। প্রথমশ্রেণীর তিনজন বালক একবাক্যে সাক্ষ্য দিল, "আমরা ঐ ছুরী এই-মাত্র কালাচাঁদের হাতেই দেখিয়াছি। উহারই নিকট নিশ্চয় ছুরী আছে।"

তখন শিক্ষকের হুকুম মতে কালাচাঁদের কাপড়ঝাড়া হইল; কিন্তু ছুরী কোথাও পাওয়া গেল না। বিচারে কালাচাঁদেরই জয় হইল। তিনি একটানা-সুরে কেবল কাঁদিতে লাগিলেন। ক্রন্দনের বুলি এইরূপ;—"আমার নামে কেবল শুধু শুধু মিছে বদনাম!

দশজনে যদি আমার উপর এরূপ চক্র করে, তাহ'লে আমি আর ক'দিন বাঁচ্‌বো।" শেষে কালাচাঁদ মনে মনে বলিলেন,— "আচ্ছা আমিও মজা দেখাতে পারি।'

স্কুলের ছুটীর পুর্ব্বে কালাচাঁদ হেডমাষ্টারকে চুপি চুপি বলিলেন, "ঐ, যে বালকটী কাশ্মীরি-কোট গায়ে দিয়া আসিয়াছে, উহারই পকেটে ছুরী আছে। ঐ বালকটী নিজে চুরি করিয়া মিছে আমার নামে দোষ দিয়াছিল।"

বলা উচিত, ঐ বালকটী ক্লাসের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ভালমানুষ ছাত্র এবং কালাচাঁদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় প্রথম সাক্ষী ছিল। হেডমাষ্টার তাহাকে ডাকাইলেন, তাহার পকেট টিপিলেন, পকেট শক্ত বলিয়া বোধ হইল; শেষে পকেটে হাত দিয়া তিনি ছুরি বাহির করিলেন। বালকটী ফ্যাল্ ফ্যাল্ চাহিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল, "আমি ইহার বাপ্পও জানি না।" বালক আর কোন কথা কহিতে পারিল না; তাহার চক্ষু দিয়া ঝর্-ঝর্ জল পড়িতে লাগিল। কালাচাঁদ চোখ ঘুরাইয়া, হাত নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন, "এখন কেঁদে জিৎলে ত আর হবে না! পরের নামে যে বড় দোষ দিয়েছিলে? জলখাবারের ঘরে গিয়ে আমাকে ছুরীর আধা-আধি ভাগ দিতে চেয়েছিলে যে! হাঃ হাঃ!"

বিচারে সেই ভাল-মানুষ বালকটীর নাম-কাটা গেল। স্কুলে কালাচাঁদের বিশেষ প্রভুত্ব হইল। তাহার কাছে আর এগোয় কে?

পরদিন কালাচাঁদের একখানি নিজের কেতাব হারাইল। কালাচাঁদ মহা-হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি আরম্ভ করিলেন। "সর্ব্বনাশ হইয়াছে, সর্ব্বনাশ হইয়াছে"—এইরবে তিনি দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া ফেলিলেন। হেডমাষ্টারের নিকট গিয়া দড়াম্ করিয়া, আছাড়

খাইয়া পড়িলেন। প্রধান শিক্ষক জিজ্ঞাসিলেন, "ব্যাপার কি? কি হয়েছে?"

কালাচাঁদ। (ক্রন্দন সুরে) আমার ফাষ্টবুকের মানের বৈ হারিয়েছে, আমি গেলাম, আমি মরিলাম! আমি আর কাল থেকে পড়া তৈয়ারি কর্‌বো কেমন করে গো! (এই বলিয়া মুখে কাপড় দিয়া ক্রন্দন)।

হেডমাষ্টার। বৈ কে লইল, কোথা গেল, তার কিছু জান কি?

কালাচাঁদ। বৈ এই স্কুলেই আছে। এইমাত্র হারিয়েছে, এখনও নিয়ে পালাতে পারে নাই। আমি দরোয়ানকে ফটক বন্দ কর্‌তে বলে এসেচি।

হেডমাষ্টার। কোন্ ক্লাসের কোন্ ছাত্র নিয়েচে, তোমার কি কাহাকেও সন্দেহ হয়?

কালাচাঁদ। তা কেমন ক'রে জান্‌বো? প্রথমশ্রেণী থেকে শেষ-ক্লাস-পর্য্যন্ত দেখুন,—বৈ অবশ্যই মিল্‌বে;—এখনও ত কেউ পালায় নাই।

স্বয়ং হেডমাষ্টার কালাচাঁদকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যেক বালকের কাপড় ঝাড়া, পুস্তক ঝাড়া, জুতা ঝাড়া—ইত্যাদিরূপ খানাতল্লাসি আরম্ভ করিলেন। অবশেষে তৃতীয়শ্রেণীর একটী সৎ এবং ভাল ছাত্রের পুস্তকের ভিতর কালাচাঁদের সেই মানের বৈ বাহির হইল। সে বালকটী 'ভ্যাবাচ্যাকা' খাইয়া, ভীত হইয়া কাঁপিয়াই আকুল। বালক বলিল, "আমি ইহার কিছুই জানি না,—কে, কখন, ঐ মানের বৈ আমার পুস্তকের ভিতর রাখিয়া গিয়াছে,—আমি তাহার বিন্দুবিসর্গও জানি না।" সে কথা আর কে শুনে? চোর ধৃত হইয়াছে দেখিয়া, কালাচাঁদের

কোমল কলেবর আহ্লাদে স্ফীত হইয়া উঠিল। বিচারে এ বালকটীরও নাম কাটা গেল।

কালাচাঁদের অদ্বিতীয় প্রভাব। নিম্নশ্রেণীর শিক্ষকগণ পর্য্যন্ত ভীত হইলেন। অশ্বমেধ-যজ্ঞের ঘোড়ার ন্যায় কালাচাঁদ দিগ্বিজয়ী হইয়া চারিদিকে বেড়াইতে লাগিলেন। বালকমণ্ডলী কালাচাঁদকে দেখিলেই ভীত, তটস্থ, কম্পিত-কলেবর হইত।

স্কুলে ডাকাতি আরম্ভ হইল। কোন বালক জলখাবার খাইবার জন্য চারিটী পয়সা আনিয়াছে; কালাচাঁদ তাহাকে, বলিলেন, "আমাকে দুইটা পয়সা ধার দাও।" সে যদি একটু ইতস্তত করে, তবে কালাচাঁদ অমনি চোখ রাঙ্গাইয়া, দাঁত কিড়মিড় করিয়া বলেন,—"আচ্ছা, তুমি দেবে না,—দেবে না,—তুমি কেমন ছোকরা, আমি একবার বুঝে নেবো।" বালক ভয়ে জড়সড় হইয়া পয়সা দিত। এইরূপ ব্যাপারে স্কুলে কালাচাঁদের বেশ দু-পয়সা রোজগারও চলিতে লাগিল! এবম্প্রকারে বর্দ্ধমান রাজ-স্কুলে কালাচাঁদের পাঁচ বৎসর অতীত হইল।

অবশেষে স্কুলে বাঘ ঢুকিল। কালাচাঁদ বালকগণকে চড়চাপড় কীল, ঘুষি, কামড় পর্য্যন্ত আরম্ভ করিলেন। যে শ্রেণীর যে বালকের সঙ্গে যাহার কেন গণ্ডগোল হউক না—কালাচাঁদ তাহার একপক্ষে নিযুক্ত হইতেন। ক্রমে কালাচাঁদ স্কুলের দাঙ্গা ফুরাইয়া লইতে লাগিলেন। কালাচাঁদের হাতে ॥৹ আনা নগদ দাও, আর বল, অমুক বালককে মারিতে হইবে,—কালাচাঁদ তখনি বলিবেন,—'তথাস্তু'! সুতরাং স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রই কালাচাঁদের বশ, অনেকেরই তাঁহার সহিত ভাব!

ধীরে ধীরে, অল্পে অল্পে কালাচাঁদের অত্যাচার-কাহিনী হেড-

মাষ্টারের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। একদিন একটী বালকের গণ্ডদেশে বিষম দংশন-করা-অপরাধে, কালাচাঁদ অভিযুক্ত হইলেন। বালকটীর গাল দিয়া ঝরঝর্ রক্ত পড়িতেছে। দুইজন শিক্ষক সাক্ষ্য দিলেন, কালাচাঁদেরই এ কাজ। কালাচাঁদ কিন্তু কাট-কবুল; বলিলেন, "আমি কিছুই জানি না।" প্রমাণ পাইয়া হেড-মাষ্টার কালাচাঁদের মাথায় গাধার টুপি দিয়া তিন ঘণ্টা 'একঠেঙ্গে' করিয়া রাখিলেন, পৃষ্ঠদেশে দশ বেত কসিলেন এবং যৎপরোনাস্তি ভৎ'সনাও করিলেন।

পরদিন কালাচাঁদ স্কুলে আসিলেন না। বর্দ্ধমানের মামীকে বলিলেন, "ও, রাজার স্কুলে মাইনে নেই, ভাল পড়া হয় না, ওখানে আমি আর পড়্‌বো না।" মামী বলিলেন, "তা বাবা, তোমার লেখাপড়ার জন্য আমি কি আর মাইনে দিতে কাতর?—যা মাহিনা লাগে, তা আমি দিব—তুমি ভাল স্কুলে ভর্ত্তি হওগে।"

এ কাজে খোদ মামার সম্মতি ছিল না,—তবে মামীর মতেই মামার মত,—ইহা চিরপ্রসিদ্ধ। কাজেই কালাচাঁদ মাসিক ১৲ টাকা মাহিনা দিয়া অন্য একটা স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন।

ভর্ত্তি হইয়া, দু-দশদিন স্কুলে গিয়া, কালাচাঁদ সে স্কুলে আর গেলেন না। কিন্তু গৃহ হইতে প্রত্যহ দশটার সময় আহারাদি-পূর্ব্বক, বই হাতে করিয়া, তিনি বাহির হইতেন; আর মাস অন্তে মামীর নিকট হইতে ১৲ টাকা স্কুলের মাহিনা আদায় করিতেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি প্রত্যহ ময়রার দোকানে, মণিহারির দোকানে, খাইয়া-খেলিয়া বেড়ান কেহ বা, গুলির আড্ডায় ঢুকিতে তাঁহাকে দেখিলেন। যে পল্লিতে মূর্ত্তিমতী স্ত্রীস্বাধীনতা, সেখানেও কালাচাঁদকে এক-আধদিন কেহ কেহ দেখিতে পাইলেন।

কালাচাঁদ টেরাসিঁথি কাটেন, পমেটম মাখেন,—মিহিধুতি না হ'লে পরেন না, আতর-লেবেণ্ডার না হ'লে পথ চলেন না, ছাকা-টপ্পা ছাড়া অন্য পুস্তক হাতে করেন না,—ভাগিনার ক্রমশ এইরূপ শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া করুণাময়ীর হৃদয়ে আনন্দের লহরীলীলা উঠিতে লাগিল। করুণা, ভালবাসামাখা কালাচাঁদকে দেখিত, আর মনে মনে বলিত, "আহা! ছেলেটী যদি বাঁচে, তাহ'লে আর আমার দুঃখ কি?—বিধেতা কি আমার এমন অদেষ্ট করেচেন যে, ও বাঁচবে!!"

কোন আপদ্ বালাই নাই, কালাচাঁদ সুস্থ-শরীরে স্বচ্ছন্দমনে, নির্ব্বিঘ্নে দিব্য বাড়িতে লাগিলেন। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, কালাচাঁদ চিরদিনই পূর্ণচন্দ্র।

পিতৃভূমির সহিত কালাচাঁদের বিশেষ কোন সম্পর্ক ছিল না। মাতুলালয়ে জন্ম, মাতুলালয়ে মানুষ,—বর্দ্ধমানে মাতুলের নিকট লেখা-পড়া শিক্ষা,—সমস্তই তাঁহার মাতুল। পিতার যা-কিছু যৎসামান্য বিষয়-সম্পত্তি ছিল, মাতুলই তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। বর্দ্ধমানের বাসায় অবস্থানকালে তিনি একবার মাত্র পিত্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

শ্রীমান্ কালাচাঁদ দত্ত,—মাষ্টার কিসে? প্রশ্ন বড় গুরুতর। সমস্যা বড় বিষম। স্বয়ং কালাচাঁদ এ-কথার কোন উত্তর দেন না। অথচ এ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অনেকেই তাঁহাকে কালাচাঁদ মাষ্টার বলিয়া ডাকেন।

কালাচাঁদের একজন পার্শ্বচরের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে যে আভাস পাইয়াছি, তাহাই এ স্থলে বিবৃত হইল। বিংশতি বৎসর বয়সে, কালাচাঁদের বর্দ্ধমানে পাঠশেষ হয়। ইতিপূর্ব্বেই তিনি সর্ব্ব-স্কুলে আউট হইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার মামার মৃত্যু ঘটে। করুণাময়ীর দারিদ্র্যদশা উপস্থিত। গহনাপত্র যা ছিল, সমস্তই গেল। বাড়ী বন্ধক পড়িল। ক্রমে দিন যাওয়া ভার হইল। পিতল কাঁসার থালা, ঘটি, ঘড়া, ঘরে আর কিছুই নাই। তখনও কিন্তু তিনি কালাচাঁদকে ছাড়েন নাই। করুণাময়ী বিড়ালটাকে তাড়াইলেন, ময়না পাখীটাকে উড়াইলেন, লক্ষ্মী-পূজার কড়ী কয় কড়াও বেচিলেন, কিন্তু কালাচাঁদকে ছাড়িতে পারিলেন না। কালাচাঁদ সন্তানতুল্য;—করুণাময়ীর জীবনধন সর্ব্বস্ব,—অন্ধের নড়ি, আঁধারের আলো, দরিদ্রের সোণা!

করুণা এই সময় মাঝে মাঝে বলিতেন, "বাবা, তোমার একটী চাক্‌রী দেখে মত্তে পার্‌লেই আমার দুঃখ ঘোচে। চাক্‌রীর এক-বার চেষ্টা চরিত্তির দেখলে হয় না?" এ সব কথায় কালাচাঁদ বড় একটা উত্তর দিতেন না। করুণাময়ীর উপর তাঁহার ঔদা-সীন্যের আরও বিবিধ কারণ জন্মিল। সে-রকম [illegible] দুধ, সর, চাঁচি

—তিনি আর কিছুই পান না; ঘি মজুমদার কাজ যেন দেশ হইতে উঠিয়া গিয়াছে। অর্দ্ধেক মাছ, অর্দ্ধেক ভাত না হইলে, কালাচাঁদ পূর্ব্বে ভাত খাইতে বসিতেন না;—কিন্তু করুণাময়ীর অদৃষ্ট-দোষে আজ তাঁহাকে পুঁইশাক চড়চড়ি ও আমড়া-ভাতে দিয়া আউশ চালের ভাত খাইতে হয়।

জঠরজ্বালায় কালাচাঁদ মাঝে মাঝে দুই এক দিন নিরুদ্দেশ হইতেন। করুণার অমনি দুই চক্ষু দিয়া হুহু জল পড়িত।

একবার একমাসকাল কালাচাঁদ ঘরে ফিরিলেন না। বর্দ্ধমানস্থ বন্ধুবান্ধবগণও তাঁহার কোন সংবাদ বলিতে পারিল না। করুণা সাধ্যমত অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু কিছুই ফল হইল না। ক্রমে এক মাস অতীত হইল,—কালাচাঁদকে বর্দ্ধমানে কেহ দেখিল না। করুণাময়ী ভিখারিণী—কোন দিন খাইতে পান, কোন দিন পান না। কালাচাঁদের জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া তিনি অন্ধ হইয়াছেন। মাথা রুখু, কাপড় ছেঁড়া,—জল খাইবার একটা ভাঙ্গা ভাঁড়মাত্র অবশিষ্ট আছে। করুণা উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন,—সেবা করিবার কেহ নাই, ঔষধ-পথ্য দিবার কেহই নাই,—করুণা সংসারে একাকিনী। দিবসত্রয় মধ্যে তিনি শমন-সদনের অতিথি হইলেন।

কালক্রমে বর্দ্ধমানের বন্ধুগণ সংবাদ পাইল, কালাচাঁদ নিজগুণে ভবেশগ্রামের ইংরেজী-স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদে মনোনীত হইয়াছেন। হেডমাষ্টার হইয়া তিনমাসকাল তিনি খুব প্রতিপত্তি ও সমারোহের সহিত কার্য্য করেন। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ও বিদ্যার প্রাচুর্ভাব দেখিয়া, গ্রামের সকলের ঈর্ষ্যা-প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া উঠিল। তাহারা একযোট হইয়া, ষড়যন্ত্র করিয়া, ফৌজদারী আদা-

লতে তাঁহার নামে এক গুরুতর অভাবনীয় অভিযোগ আনিল। শেষে বর্দ্ধমানে দায়রার বিচারে তাঁহার তিন বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাদণ্ড হইল। জেলখানা ঢুকিবার পূর্ব্বে কালাচাঁদ নিজদলস্থ বর্দ্ধমানের বন্ধুগণকে বলিয়া গেলেন, "কোন ভয় নাই; আমি শীঘ্র ফিরিতেছি,—তোমরা মনে করিও না যে, মাষ্টারি-পদ আমি হারাইয়াছি!" কালাচাঁদের "মাষ্টার" উপাধির ইহাই আরম্ভ—সূত্র—আদি—মূল—কারণ—যা'বল তাই। এ সম্বন্ধে আর কিছু কেহই জানে না। সে যাহাই হউক, সম্ভবত এইরূপেই কালাচাঁদ,—মাষ্টার হইলেন।

কালাচাঁদ কিন্তু চিরদিনই 'মাষ্টার' বলিলে চটিতেন। যেখানে মাষ্টার-নাম উচ্চারিত হইত, সেখানে তিনি আর তিষ্ঠিতেন না। জেলে ঢুকিবার পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন বটে, "মনে করিও না যে, আমি মাষ্টার-পদ হারাইয়াছি,"—কিন্তু জেল হইতে বাহির হইবার পর, মাষ্টার-নাম শুনিলেই তাঁহার কেমন আতঙ্ক হইত। ইহাকে বালকত্বই বল, আর ধাতুদৌর্ব্বল্যই বল,—ফল কথা ইতিহাস এইরূপই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ঘটনাচক্রে পড়িয়া, কালাচাঁদ বৰ্দ্ধমান হইতে অন্য কতকগুলি কয়েদীর সহিত হুগলী-জেলে আনীত হইলেন।

কারাবাসে কালাচাঁদ কি করিলেন? ভাবনা নাই, ভ্রূক্ষেপ নাই, স্বচ্ছন্দে, পরমানন্দে তিনি তথায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম তিনি আহ্লাদে ঘোর-রবে ঘানি ঘুরাইয়া তেল বাহির করিতেন। গায়ে বিলক্ষণ জোর ছিল;—অপরে বহুকষ্টে আট ঘণ্টায় যে তেল বাহির করিত, কালাচাঁদ তাহা পাঁচ-ছয় ঘণ্টায় শেষ করিতেন। কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মে ক্রটী নাই, অবহেলা নাই, আলস্য নাই, কালাচাঁদ কৰ্ম্মকে যেন ঈশ্বর-জ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন। জেলখানার মোড়ল, বরকন্দাজ, নায়েব, দারোগা, বড় সাহেব—সকলেই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইল।

কিন্তু এক উৎপাত ঘটিল। তাঁহার ক্ষুধা কিছুতেই ভাঙ্গে না। প্রাতে পাঁচ ছটাক, আর সন্ধ্যাবেলা চার ছটাক—এই নয় ছটাক চেলের অন্ন তাঁহার'ত—জলপান! উদরের এক কোণ পূরে কি না সন্দেহ! প্রত্যহ অৰ্দ্ধাশনে বা অনশনে তাঁহার ঈষৎ উদরাময় জন্মিল। দেহও দুৰ্ব্বল হইতে লাগিল।

কষ্টের উপর কষ্ট। পূৰ্ব্বে তিনি প্রায় ২৪ ঘণ্টাই তামাক খাইতেন; তামাক না হইলে তাঁহার একদণ্ডও চলিত না। কিন্তু প্রথমমাসে জেলে একটী দিনও তামাক পাইলেন না। সরস কলিজা শুকাইতে লাগিল।

কিন্তু একমাস মধ্যেই তিনি জেলখানার হাটহদ্দ সমস্ত হৃদয়-

ঙ্গম করিলেন। এখন কারা-নিয়ম কিরূপ তাহা জানি না বুঝি না; কিন্তু সে সময় নিয়ম বুঝি একটু স্বতন্ত্র ছিল।

কালাচাঁদের ডাইরিতে এইরূপ সাঁটে লেখা আছে;—"বড়-মোড়লের সঙ্গে ভাব। বুঝাইলাম, আমি একজন ধনশালী ব্যক্তি। মুক্তির পর তোমার ভাল করিব। বড়-মোড়ল মুসলমান। সে আমার গোলাম হইল। * * * প্রাতে উঠিয়াই গুড়-মুড়ি। বেলা ১১টার সময় মাছের ঝোল, অম্বল, দই, ডাল, তরকারী ও প্রায় একসের মিহি-চেলের ভাত। কাজ-করা সখের উপর নির্ভর। * * *। অদ্য গয়ার তামাক; সন্দেস-গুলায় গন্ধ—গাঁজা ফুরাইয়াছে। * * *। বড় মজা। পৌষমাসের কন্‌ক'নে শীত—গরম গরম চেনাচুর—১৮৷৷৹ ভাজা; অল্প সুধা,—ঢালাও সিদ্ধি। * * *। শ্রীপঞ্চমীতে যাত্রা—কেলুয়া ভুলুয়া বেশ সেজেছিল। * * *। দাঙ্গা, রক্তপাত, জয়—প্রভূত্ববৃদ্ধি। ১২টা সীতেভোগ—৬ খানা লুচি—এক মালসা দই * * * তাস খেলা—পাশা—দশপঁচিশ—জুয়া। * * *। কালাপেড়ে ধুতি, রেশমের চায়নাকোট, বার্ণিস করা জুতা, এলবার্ট টেড়ি। * * *।—"

ইত্যাকার ডাইরি দেখিয়া কি বুঝিব, তাহা জানি না। মোদ্দা, ছয় মাসের মধ্যে কালাচাঁদের দেহ মত্তমাতঙ্গের মত হইল। সকলে তাঁহাকে হাতী বলিয়া ডাকিত।

অষ্টম মাসের ওজনে কালাচাঁদ ৩ মন ১৫ সের হইলেন। তখন কারাধ্যক্ষ একজন গৌরাঙ্গ সাহেব,—হাস্যময়ী, স্থূলোদরী, স্ফীতাঙ্গী, বিড়ালাক্ষী বিবিটী স্বামিপার্শ্বে পঞ্চমবর্ষীয়া কন্যার আঙ্গুল ধরিয়া দণ্ডায়মান। স্ত্রীপুরুষে অনিমিষ-লোচনে, কালাচাঁদের ওজন-কাণ্ড দেখিতেছিলেন। ওজন দেখিয়া বিবি হাসিয়া

উঠিলেন। সাহেব ইংরেজীতে তামাসা করিয়া বলিলেন, "তুমি আর হাসিও না।" বলা বাহুল্য, বিবিটী একটু মোটা। বিবির কৃত্রিম কোপের সহিত আবার ফুটন্ত হাসি মিশিল।

কালাচাঁদ ওজন-যন্ত্র হইতে নামিলে, বিবির মেয়েটী কালাচাঁদের কোলে উঠিবার চেষ্টা করিল। কালাচাঁদ এ সুবিধা ছাড়িলেন না। অমনি ব্যস্ত হইয়া, মেয়েটীকে কাঁধে করিলেন। কন্যা কাঁধে চাপিয়া, বড়ই আহ্লাদিত হইয়া, টব-স্থিত গোলাপ গাছ হইতে একটী ফুল ছিঁড়িবার বহু চেষ্টা করিল;—কিন্তু পারিল না। কালাচাঁদ বাঁ হাতে করিয়া, পট্ করিয়া ফুল ছিঁড়িয়া, মেয়েটীর হাতে দিলেন। কন্যারত্ন, আনন্দে ভোর হইয়া, কালাচাঁদের কাঁধে দোলিতে দুলিতে, খেলিতে লাগিল। অন্যান্য কয়েদীগণ 'হাতীর' কাণ্ড দেখিয়াই অবাক্!

এইরূপ পাঁচ মিনিট অতীত হইলে, বিবি, কন্যাকে কালাচাঁদের কাঁধ হইতে নামাইবার জন্য, হাত পাতিয়া কোলে লইতে গেলেন। কন্যা এ ব্যাপার দেখিয়া হাসিয়াই আকুল,—দুই হাতে করিয়া কালাচাঁদের গলা জড়াইয়া ধরিল,—কোন মতেই নামিতে চাহিল না। মহামুস্কিল। তখন বিবির আদেশ অনুসারে কালাচাঁদ কন্যাকে কাঁধে করিয়াই দ্বিতলের গৃহে বিবির অনুগমন করিলেন। তিনি প্রায় একঘণ্টা পরে, বহুযত্নে কন্যাকে বিবির কোলে দিয়া নীচে অবতরণ করিয়া অন্যান্য কয়েদীর সহিত মিশিলেন।

কালাচাঁদের পদবৃদ্ধি হইল। জেলখানায় আবার পদোন্নতি কিরূপ? তা ত জানি না। কিন্তু লোকে কাণাকাণি করিল, কালাচাঁদের এইবার সুখের কাল হইয়াছে।

জেল-প্রাচীরের বাহিরে, ঠিক বড় ফটকের সম্মুখে, একটী

সাহেব, বিবি এবং কালাচাঁদ।



ক্ষুদ্র ঘর আছে। সেই ঘরে বসিয়া একজন কয়েদী তৈল বিক্রয় করে। যে কারাবাসী, এই তৈল-বেচা-ভার পায়, তাহাকে লোকে ভাগ্যবান্ বলিয়া থাকে। কালাচাঁদ কালক্রমে এই পদে পরিস্থিত হইলেন। এই সূত্রে বহুলোকের সহিত তাঁহার আলাপ-পরিচয় দেখাসাক্ষাৎ হইল। একক্রোশ ব্যাপিয়া চতুঃসীমাবর্ত্তিনী ঝী-মণ্ডলী, ক্রমশ কালাচাঁদের গুণে মুগ্ধ হইয়া, দোকানে তেল-কেনা একেবারে বন্ধ করিল,—সকলেই জেলখানার খাঁটি-সরিষার ঝাঁজালো তেল কালাচাঁদের কাছ হইতে আনিতে লাগিল। চাকর, খানসামা, ভারী,—পুরুষজাতীয় বহুবিধ ব্যক্তির সহিতও তাঁহার সদ্ভাব জন্মিল।

জেলখানায় থাকিয়া, অনেক পুরাণ, পাকা কয়েদীর সহিত মিশিয়া, কালাচাঁদ নানা রোগের ঔষধ এবং মন্ত্র শিখিয়াছিলেন। ঝী চাকর প্রভৃতিকে নানা ঔষধের উপদেশ দিতেন। দ্রব্যগুণে তাহারা বিষম বশীভূত হইল। এই সময় পতিতপাবন নামক কোন নাপিতের সহিত কালাচাঁদের বিশেষ প্রীতিসৌহার্দ্দ জন্মে।

এই অবস্থায় মাঝে মাঝে কোন কোন চাকরাণীর সহিত কালাচাঁদের ঝগড়াও হইত;—তৈল কেহ কেহ বেশী, কেহ কম পাইত;—তাঁহার ওজন ঠিক ছিল না। একদিন একজন জেল-গোয়েন্দা, তাঁহার নামে চুরীর অভিযোগ আনিল। কালাচাঁদ তৈল বিক্রয়ার্থ যেস্থলে বসিতেন, সেই স্থলের মাটির নীচে নগদ ৫৲ টাকা এবং ।৶১০ পয়সা দেখা গেল। কালাচাঁদ জেল-সাহেবের কাছে অনেক কাঁদিলেন-কাটিলেন,—বলিলেন, "আমি ইহার কিছুই জানি না;—কোন মন্দ ব্যক্তি, কু-অভিপ্রায়ে আমাকে বদ্ধ করিবার জন্য, ঐ টাকা পুঁতিয়া রাখিয়া গিয়াছে।" কালা-

চাঁদের বিষম ক্রন্দনে মেম-সাহেব পর্য্যন্ত দ্বিতল হইতে নিম্নতলে অবতরণ করিলেন। বিচারে প্রমাণ হইল, "কালাচাঁদ নির্দ্দোষ।" সাহেব কালাচাঁদকে খুব সাবধানে কাজকর্ম্ম করিতে অনুমতি দিয়া বিবির হাত ধরিয়া উপরে উঠিয়া গেলেন!

ক্রমশ কারাগারে কালাচাঁদের অদ্ভুত বিক্রম বাড়িল। তেলের ঘরে বসিয়া তিনি মিহিসুরে গান করেন, সিস্ দেন, হাসি তামাসা ইয়ার্কি করেন,—আর চাকর-চাকরাণীকে তেল বেচেন। প্রকৃতই তাঁহার সুখের সীমা রহিল না। জেলখানা শ্বশুরবাড়ী হইল কি? না, তা অপেক্ষা কিছু অধিক হইল। লোকে বলে,—

শ্বশুরবাড়ী মথুরাপুরী,
তিনদিন পরে ঝেঁঙ্গার বাড়ী।

কিন্তু কালাচাঁদ, বারমাস সমভাবে থাকিয়া, একটী-দিনের জন্য কামাই না করিয়াও, জেলখানায় নিতি নিতি নব নব আদর পাইয়াছিলেন। অবশেষে কাল পূর্ণ হইলে, তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বে, জেলগৃহ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। খালাস হইবার দিন, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে, কালাচাঁদ বিবিকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। বিবি হাসিয়া বলিলেন, "কালেচাঁড! টুমি মড্যে মড্যে হামার সহিট্ ডেখা করবে।"

কালাচাঁদ ভগ্নহৃদয়ে শূন্যমনে বিদায় হইয়া চলিলেন। খানিক যান, আর পেছন ফিরিয়া জেলখানা পানে এক একবার চাহিয়া দেখেন। দেখিতে দেখিতে তিনি গলিমধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতই কালাচাঁদকে লইয়া আমি এখন বিব্রত। এ চিত্র কি আঁকা যায়?—এ চরিত্র-ফুল কি ফুটান যায়? আমি ত অক্ষম? তবে না জানিয়া, না শুনিয়া,—না ভাবিয়া, না বুঝিয়া,—হঠাৎ এ কাজে হাত দিয়াছি, চারা নাই;—তাই যেমন করিয়াই হউক, শেষ করিতেই হইবে;—আধা-আধি ফেলিয়া রাখিলে গ্রন্থকারের অধঃ-কপালে ধরিতে পারে। আর তাহাতে কালাচাঁদ রুষ্ট, পাঠকের মনঃকষ্ট, বাঙ্গালা-সাহিত্যের সম্ভ্রম নষ্ট, মানস-গ্রন্থখানি কীটদষ্ট,—বন্ধুগণ অসন্তুষ্ট, বিপক্ষ-পক্ষ হৃষ্টপুষ্ট হইতে পারে। অতএব লিখি।

কিন্তু সুখ নাই, তৃপ্তি নাই! বাল্মীকির মত দৈববল, বেদ-ব্যাসের মত বিদ্যাবল, যদি একাধারে থাকা সম্ভব হইত, তাহা হইলে একদিন ষড়ৈশ্বর্য্যশালী কালাচাঁদের পূর্ণশোভা লোক-সমাজে দীপ্তি পাইতে পারিত। কিন্তু গ্রন্থকার অধম,—নির্গুণ, নিশ্চেষ্ট, নির্ব্বিকার! মহামতি কালাচাঁদ! দুঃখ করিও না; বিধাতার নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাইবে বল?

অথবা ভয় কি?—দুর্গতিনাশিনী, গণেশ-জননী দুর্গার স্মরণ লইয়া লেখনী ধরিলাম!—চিন্তা কি?

হুগলীই কালাচাঁদের প্রথম প্রধান লীলাভূমি। হুগলীতেই তিনি বিষম অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং হুগলীতেই তিনি তাঁহার প্রথম অশ্বমেধযজ্ঞ শেষ করেন। হুগলীই তাঁহার কুরুক্ষেত্র, হুগলীই তাঁহার নিধু-নিকুঞ্জবন।

শ্রীমান কালাচাঁদ দত্তের লীলাক্ষেত্র হুগলীর ঐতিহাসিক-রহস্য একটু ভেদ করিলে ক্ষতি কি?

হুগলী সমৃদ্ধিশালী জনপদ। জ্ঞান, বিদ্যা ধনধান্যে পূর্ণ। এখানে লক্ষ্মী-সরস্বতীর বিবাদ নাই। তবে ইংরেজ-শাসনের যখন ক্রমশঃ পূর্ণ-ষোলকলা বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল, তখন অবধি জ্বর বৃদ্ধি, মোকদ্দমা বৃদ্ধি এবং অন্নকষ্টের সূত্রপাত!

এত অধিক লোকসংখ্যা পৃথিবীর আর কোন জনপদে নাই। ১৮২২ খৃঃ অব্দের গণনায় ঠিক হয়, হাবড়া বাদ দিয়া হুগলী-জেলার বিস্তৃতি ১২২৩ বর্গমাইল,—লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ ৫৭ হাজার ৩৮৫ মাত্র। কিন্তু ৯ বৎসর পরে ১৮৮১ সালের গণনায় দেখা যায়, ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৬১৭ জন লোক কমিয়াছে। জ্বর এবং অন্নকষ্ট, হ্রাসের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়।

হুগলী-জেলা ব্রাহ্মণ-প্রধান স্থান। ব্রাহ্মণ ৭৬ হাজার ২৭১ জন, কায়স্থ ২৫ হাজার ৪৮৪ জন; খৃষ্টান ৬৫৬ জন, বৌদ্ধ ২৯০ জন এবং ব্রাহ্ম ১৬ জন।

ভাগীরথী, দামোদর, রূপনারায়ণ—নদীত্রয় হুগলী জেলায় প্রবাহিত। পর্ব্বত নাই, হ্রদ নাই, প্রস্রবণ নাই।

ঐতিহাসিকের চক্ষে বোধ হয় দিল্লীর পরেই হুগলী অধিক রমণীয়, আদরণীয় হইবে। হুগলী জেলা প্রাচীন ইতিহাসের অনন্ত-খনি। এক হুগলী নামে ইতিহাসের নানা স্তর হৃদয়ে অঙ্কিত হয়।

গঙ্গার উপকূলবর্ত্তী আদালত-গৃহের সম্মুখস্থ ভূখণ্ডটুকুকেই হুগলী বলিয়া কেহ যেন না বুঝেন। দেড় ক্রোশ দূরস্থিত সপ্তগ্রাম হুগলীর জন্মভূমি। সপ্তগ্রাম এখন বিজন-কানন বলিলে অত্যুক্তি হয়

না ;—কয়েক ঘর মাত্র লোকের বসবাস আছে। ইষ্টইণ্ডিয়া-রেল-কোম্পানীর হুগলী এবং মগরা—এই ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ত্রিশ-বিঘা ষ্টেশনের কাছেই—বিঘাকয়েক জমী পরেই, বর্ত্তমান সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁয়ের শেষ—চিহ্ন,—কঙ্কালাবশিষ্ট বিদ্যমান। প্রস্তর বা ইষ্টকনির্ম্মিত অতি প্রাচীন গৃহের ধূলিসাৎ ধ্বংসব্যাপার এখনও সেখানে অতি কষ্টে ঈষৎ দেখা যায়। মহাকালের কি বিচিত্র লীলা!—আজ ত্রিশবিঘার নামে সপ্তগ্রামের পরিচয় করিতে হইল। যে সপ্তগ্রাম একদিন ভারতের সর্ব্বপ্রধান নগর ছিল; তৎকালের ইউরোপীয় সভ্যতার সর্ব্বোচ্চস্থানে অ[illegible] রোমীয় বনিকগণ যে সপ্তগ্রামে অর্ণবপোত লইয়া বাণিজ্য আকাঙ্ক্ষায় উপনীত হইত; ভারতের সমগ্র শিল্পজাত দ্রব্য, রপ্তানির জন্য যে সপ্তগ্রামে স্তূপীকৃত হইত; সুন্দরতটশালিনী জাহাজমালা-ভূষিতা স্রোতস্বতী, যে সপ্তগ্রামের একদিন অবিরত পাদপদ্ম বিধৌত করিত; বিদ্যা, ধন, বল যে সপ্তগ্রামের একদিন একচেটিয়া ছিল, সে সপ্তগ্রাম আজ শ্মশান,—শৃগাল-কুক্কুর-শূকর-সর্পের আবাস-ভূমি!—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ত্রিশবিঘার নামে সুপরিচিত। অহো! বসুন্ধরা সেইরূপই পতিত, বিস্তৃত, কিন্তু সে সপ্তগ্রাম, [illegible] নাই! কবি কহিয়াছেন,—

কাল সৃষ্টি, কাল স্থিতি, কাল করে লয়।
সুখ দুখ সব সেই অতিক্রম্য নয়॥
কাল নিদ্রা জাগরণ কাল জল স্থল॥
কাল স্বর্গ কাল মর্ত্ত্যসুধা হলাহল॥
কাল বাপ কাল সাপ ভিক্ষুক ভূপতি।
সংসারের সার সেই নাহি অন্যগতি॥

মুসলমান-বাদসাহের আমলে মন্ত্রিবর তুদরমল্ল, সপ্তগ্রামকে এক প্রধান 'সরকারে' বিভক্ত করেন। তখন তথায় কেল্লা, গড়, নবাবের বাড়ী ছিল; টাকশাল বসিয়াছিল। সেই 'সপ্তগ্রাম সরকারের' এলেকা ছিল,—আধুনিক হুগলী, বর্দ্ধমান, হাবড়া কলিকাতা এবং ২৪ পরগণা। প্রলয়কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া একমাত্র ব্রহ্মে বিলীন হয়। সেই শস্য-শ্যামল, সৌধমালা-সুশোভিত সুবিস্তৃত সপ্তগ্রাম, আজ যেন অতি সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করিয়া, কয়েক বিঘামাত্র জমীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

প্রায় পাঁচ শত বৎসর অতীত হইল, সরস্বতী নদীতে বালি পড়িতে আরম্ভ হয়। কালক্রমে সপ্তগ্রামে বড় বড় জাহাজ আসিবার ব্যাঘাত জন্মিল। বালুকাস্তূপে নদী ক্রমশই ভরাট হইতে লাগিল। ক্রমে নৌকার গতায়াতও বন্ধ হইল। ভাগীরথীর প্রবল-প্রতাপ এই সঙ্গে বৃদ্ধি পাইল। তৎকালে ইউরোপীয় সওদাগরগণমধ্যে পর্ত্তুগীজরাই সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। তাঁহারা সপ্তগ্রাম ছাড়িয়া হুগলীতে বন্দর খুলিলেন। সপ্তগ্রাম হইতে যাবতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উঠিয়া আসিয়া হুগলীতে বাস করিলেন। ১৫৩৭ অব্দে, ৩৫২ বৎসর পূর্ব্বে এ ঘটনা ঘটে।

এই হুগলীতেই ইউরোপীয় জাতির সহিত মুসলমান-বাদসাহের প্রথম মহাযুদ্ধ ঘটে, পর্ত্তুগীজ-সওদাগরগণ হুগলীতে ব্যবসা-উপলক্ষে আবাসগৃহের দৃঢ়ভিত্তি স্থাপন করিলেন। ক্রমশ তাঁহারা হুগলীরাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া নবাবকে বেদখল করিয়া দিলেন। ১৬২১ অব্দে নবাবসৈন্যের সহিত পর্ত্তুগীজ-সৈন্যের ঘোরতর যুদ্ধ ঘটিল এই সংগ্রামে এক হাজার পর্ত্তুগীজ-সৈন্য হত, তিন শত জাহাজমধ্যে ২৯৭ খানি জাহাজ ভাগীরথীসলিলে নিমজ্জিত হয়, আর স্ত্রী পুরুষ

বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা—সমুদায়ে প্রায় ৪ হাজার পর্ত্তুগীজ, মুসলমান-হস্তে বন্দী হয়। রণে ভঙ্গ দিয়া হুগলী ফেলিয়া দুর্গ ছাড়িয়া, সমস্ত পণ্যদ্রব্য হারাইয়া, পর্ত্তুগীজ সওদাগরগণ পলাইয়া গেলেন।

এই সময় মুসলমান বাদসাহ, হুগলীকে রাজকীয় বন্দর করিলেন। দেওয়ানী, ফৌজদারী আদালত হুগলীতে স্থাপিত হইল। সপ্তগ্রাম ডুবিল, হুগলী উঠিল।

বঙ্গদেশে হুগলীই ইংরেজের প্রথম বাণিজ্যস্থান। ১৬৪০ অব্দে হুগলিতে ইংরেজ প্রথম কুঠীস্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হন। ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যাস্থ বালেশ্বরের অন্তর্গত পিপলী নামক স্থানে ইংরেজ ব্যবসার নিমিত্ত প্রবেশ-অধিকার পাইয়াছিলেন।

এই হুগলীতেই ইংরেজের সহিত মুসলমানের প্রথমে সংঘর্ষণ ঘটে। ১৬৮৫ অব্দে আখড়াধারী ইংরেজ-বণিকের সহিত নবাবের বিবাদ হয়। বণিক্‌গণ নরম হইলে বিবাদ সহজেই মিটিত। এই সময় কয়েক জন গোরা হুগলীর বাজারে বেড়াইতে যায়। কথায় কথায় নবাব-সৈন্যের সহিত তাহাদের ঝগড়া হয়। ক্রমে গালাগালি আরম্ভ হইল। শেষে হাতাহাতি চলিল। এই সামান্য কারণেই অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। হুগলীতে যত গোরাচাঁদ ছিলেন, সকলেই এ দাঙ্গায় যোগ দিলেন। তখন সশস্ত্র মুসলমান-সৈন্য কাতারে কাতারে বাহির হইল। ঘোরতর সংগ্রাম বাধিল। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইংরেজ-সৈন্যাধ্যক্ষ হুগলী সহরে আগুন ধরাইয়া দিয়া নৌকাযোগে পলাইলেন, পাঁচ শত ঘর পুড়িল; সেই সঙ্গে ইংরেজ-বণিকের গুদামও দগ্ধ হইল। এই ব্যাপারে ইংরেজের প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার মাল নষ্ট হয়।

হুগলীতেই ইউরোপীয় জাতির প্রথম খৃষ্টানগির্জা বিনির্ম্মিত হয়; ১৫৯৯ অব্দে পর্ত্তুগীজগণ ব্যাণ্ডেল-চর্চ্চ স্থাপিত করেন।

শুধু পর্ত্তুগাল বা ইংলণ্ড নহেন, ইউরোপের অধিকাংশ জাতিই সে সময় হুগলী জেলায় আধিপত্য বিস্তার করেন। সপ্তদশ সতাব্দীতে ওলন্দাজগণ চুঁচুড়া অধিকার করিয়া লয়েন। ১৮২৫ অব্দে যবদ্বীপ বদল দিয়া ইংরেজ, ওলন্দাজের নিকট চুঁচুড়া-টুকু গ্রহণ করেন। শ্রীরামপুর, দীনেমার-সওদাগরগণের দখলে আইসে। ১৮৪৫ অব্দে ইংরেজ নগদ সাড়ে বার লক্ষ টাকা দিয়া, শ্রীরামপুর এবং আরও দুইখানি গ্রাম দীনেমারের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লয়েন। চন্দননগর আজও ফরাসীর অধিকারভুক্ত। তাই বলিতেছিলাম, হুগলী ইতিহাসের অনন্ত খনি

অদূরে দেখ, ভট্টপল্লী পণ্ডিতমণ্ডলীর আবাসভূমি। গৌরীভা-কাঞ্চনপল্লী বৈদ্যগণের বাসস্থান। আর শিবপুর-বংশবাটী অবধি চন্দননগর পর্য্যন্ত গঙ্গার দক্ষিণ-উপকূল সম্ভ্রান্ত, সঙ্গতিপন্ন, স্বকার্য্যক্ষম বণিক্‌ এবং শিল্পকরগণ কর্ত্তৃক সুশোভিত ছিল।

কালে সমস্তই বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, এক্ষণে কেবল চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট আছে। তালগাছ নাই,—কেবল তালপুকুর নামটী আছে।

আজও স্থানে স্থানে গঙ্গাগর্ভে ইটের বনিয়াদ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান-হর্ম্ম্যের কি ইহাই পরিণাম? হুগলী-জেলখানার ঠিক পাশেই ঘোলঘাটে পর্ত্তুগীজ-দুর্গের শেষ চিহ্ন (কবির চক্ষে) আজও ঈষৎ দৃষ্ট হয়। ব্যাণ্ডেলগির্জার বাঁধাঘাট হইতে ভাগীরথী প্রায় পাঁচ শত হাত সরিয়া আসিয়াছেন,—ঘাট সেইরূপেই পড়িয়া আছে,—জল নিকটে নাই।

ক্ষণজন্মা পুরুষ, দৈববশে আপন উপযুক্ত লীলাক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়া লয়েন। নচেৎ মহামতি কাঁলাচাঁদ এই ঐতিহাসিকভুমি হুগলীতে পদার্পণ করিবেন কেন?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কারাবাস-কালে হুগলীতে কালাচাঁদের অনেক বন্ধু বান্ধব ত যুটে-ই; তা ছাড়া, তাঁহার কয়েকজন আত্মীয় "দেশের লোক" বা জ্ঞাতি-কুটুম্ব হুগলীতে তখন ছিলেন।

কালাচাঁদের ঠাকুরদাদা হুগলী-প্রবাসী। নাম হরিতারণ। ইনি কি রকম ঠাকুরদাদা বুঝা উচিত। রামতারণ এবং হরিতারণ দুই সহোদর। জ্যেষ্ঠ রামতারণ, কনিষ্ঠ হরিতারণ। কালাচাঁদ জ্যেষ্ঠ রামতারণের পৌত্র এ বংশের আর কেহই নাই,—কেবল একমাত্র কালাচাঁদ।

কাজেই হরিতারণ কালাচাঁদের ঠাকুরদাদা। তিনি হুগলীর জজ-আদালতে সেরাস্তাদারী বা দেওয়ানী কাজ করিতেন। একটু দূর-সম্পর্কীয় এক মেসো নাজির ছিলেন। কালাচাঁদের গ্রামবাসী একজন ব্রাহ্মণ, হুগলীর প্রসিদ্ধ মোক্তার ছিলেন। গ্রামের আরও কয়েক ব্যক্তি দোকানপসার করিত।

কালাচাঁদ জেলখানা হইতে মুক্ত হইয়া হুগলীস্থ কোনও আত্মীয়-স্বজনের গৃহে গেলেন না;—বন্ধু পতিতপাবন পরামাণিকের বাটীতে অবস্থিতি করিলেন।

পতিতপাবন বেশ সভ্য নাপিত। এরূপ প্রসিদ্ধি,—ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য ভিন্ন অন্য কোন জাতিকে পতিত কামায় না। তবে গোয়ালা, ধোপা বা সুবর্ণবণিক্—বড়মানুষ হইলে, ইহাদের বাড়ী পতিত পদার্পণ করিয়া থাকেন। হাতে-পাতে ধরিয়া যদি জিজ্ঞাসেন,—"কিহে পতিত! তুমি গয়লা বাড়ী কামাও নাকি?" পতিত উত্তর দেন, "কি কর্‌বো বলুন,—পতিত কারো কথা ঠেল্‌তে পারে না।—সেদিন ঘোষজা-ম'শাই গাড়ী করে যাচ্চেন,—আমিও রাস্তা দিয়ে যাচ্চি—তাঁকে দেকে ছাতার আড়াল দিলেম—ঘোষজা কিন্তু আমাকে দেখ্‌তে পেয়ে, গাড়ী থামিয়ে ফেল্‌লেন; তিনি ডেকে আমাকে বল্‌লেন,—'এসো এসো, পতিত! এসো!'—আমি কি করি,—নিকটে গেলাম,—তখন ঘোষজা আমাকে আদর করে পিঠ চাপ্‌ড়ে বল্‌লেন, পতিত! কামিয়ে আর কোথাও সুখ পাইনা। তোমার কামানো যেমন মিষ্টি, তেমন আর কারু নয়। খুর চ'লে যায়—ঠিক যেন জল চ'লে যায়। কামাতে কামাতে ঘুম আসে। তা, কাল থেকে তোমাকে আমায় কামাতে হবে।'—এই ব'লে তিনি ঠংক'রে একটী টাকা আমার হাতে ফেলে দিলেন। আমি বড় বিপদে পড়িলাম। এই কথায় বলে,—

মুখ এড়াতে নারে যে।
শতেক পতি করে সে॥

তা, পতিতের হয়েছে তাই। কি কর্‌বো বলুন,—তা ঘোষজা অতি সদ্বংশ;—গোয়ালা হ'লে হয় কি?"

পতিত, ব্রাহ্মণবাড়ী কামাইতে গিয়া বলেন,—আমার ঠাকুর্দ্দা ব্রাহ্মণ ছাড়া আর কাহারও দাড়ীতে খুর দিতেন না। তবে আমরা, কি জানেন,—কাচ্চা বাচ্ছা নিয়ে ঘর করি, দু-টাকা দু'সিকে রোজ-

পতিতপাবন পরামাণিক।



গার না কর্‌লে চলে না,—কাজেই ভদ্দর ভদ্দর দেখে দু-চারি ঘর কায়স্থবাড়ী কামাইতে হয়। তবে কায়স্থদের পায়ের নখ আমি কাটি না। ঠাকুদ্দার নিষেধ আছে।"

কায়স্থ-গৃহে গিয়া পণ্ডিত বলেন, "দেশের যা বড়লোক, তা আপনারাই! জমীদার বলুন, হাকিম বলুন, দেওয়ান বলুন,—সকলেই কায়স্থ। তা, আপনাদের চরণসেবা ক'রে দু-মুঠা অন্ন পাই বলেই আমি এখনও সংসার চালাচ্ছি। বামুন জেতের পয়সা নাই,—আছে কেবল মুখে ভুয়া আশীর্ব্বাদ।"

বেশ সাজ-সজ্জায় পণ্ডিত কামাইতে বাহির হন। মাথায় পুরাণ কাপড় জড়াইয়া পাগড়ী বাঁধা হয়। গায়ে হাপ্‌-চাপকান। পায়ে জুতা। চিঁড়িয়া-বুটির একখানি জামিয়ার আছে—পণ্ডিত ১লা কার্ত্তিক হইতে চৈত্রের সংক্রান্তি পর্য্যন্ত সেখানি গায়ে দেন। শাল পুরাতন, নানাস্থানে তালিযুক্ত হইলেও সে শালের যত্ন কত!! শাল অঙ্গে উঠিলে, তাহার উপর একখানি মলমলের চাদর গায়ে দেওয়া হয়। অনেক চল্লিশবর্ষ-বয়স্ক ব্যক্তি বলেন, তাঁহারা চিরদিনই পণ্ডিতকে ঐ শাল এবং মখমলের চাদর গায়ে দিতে দেখিতেছেন। কিন্তু শালের ভাব চিরদিনই সমান—অমাবস্যা-পুর্ণিমা নাই, জোয়ার ভাটা নাই,—হ্রাস-বৃদ্ধি আদৌ নাই।

এই শাল-বিষয়ক এক অপূর্ব্ব গল্প পণ্ডিত মুখে প্রচলিত হইয়াছিল। শালখানির প্রথম অধিকারী দিল্লীর বাদ্‌সা। দিল্লীর বাদসা হইতে মুরশিদাবাদের নবাব তাহা প্রাপ্ত হন। নবাব হইতে উজীর। উজীরের বাটী হইতে চোরে শাল চুরি করিয়া লয়। পণ্ডিতের প্রপিতামহ, চোর ধরিয়া, শাল কাড়িয়া তাহা দখল করেন। সেই অবধি এই নাপিত-বংশ, ঐ শালের উত্তরাধিকারী।

যাহাই হউক, পণ্ডিত হুগলীতে দু-টাকা রোজগার করেন এবং তিনি অপরের নিকট আপনাকে সম্ভ্রান্ত ও সঙ্গতিপন্ন বলিয়া পরিচয় দেন। হুগলী ঘুটেবাজারে জেলখানার নিকটেই তাঁহার বাসা। জমার জমীতে নিজে ঘর তৈয়ারি করিয়াছেন। দুখানি ঘর। ঘরে মাটীর দেওয়াল,—খড়ের চাল। একখানি ঘর বড়—সেখানিতে রন্ধন ও শয়ন—দুই-ই হয়। আর একখানি ছোট,—বৈঠকখানার ধরণ। সেখানেতে বসিয়া গৃহে সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে পণ্ডিত কামাইয়া থাকেন। কখন কোন আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধব আসিলে, সেই ঘরেই থাকে, বসে, শোয়।

ইহা ব্যতীত পণ্ডিতের একটী হরিনামের ঝুলি ছিল। একখানি ৺বৃন্দাবনের নামাবলী ছিল। গলায় তিনকণ্ঠী তুলসীর মালা ছিল। তিলকমাটী এবং "রাধা-কৃষ্ণ"—নাম-লেখা এক কাঠের ছাবা ছিল। সন্ধ্যার পর সময়ে সময়ে কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে "লক্ষ্মণের শক্তিশেল" "তরণীসেন-বধ" ইত্যাদি পাঠ হইত। ফল কথা, অনুষ্ঠানের কোন অঙ্গই অসম্পূর্ণ ছিল না।

পণ্ডিতের বাসা হুগলীতে,—বাটী ছিল হুগলীর অন্তর্গত ধনেখালি গ্রামে। পণ্ডিতের বয়স এখন পঞ্চাশ। বৎসরের মধ্যে একবার ৺পূজার সময় বাটী যান।

কালাচাঁদ যখন জেলখানায় বসিয়া তেল বেচেন, তখন পণ্ডিতের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। পণ্ডিত উপযুক্ত পরামাণিক,—সুতরাং শীঘ্রই সহজেই পরস্পরের ভাব ঘনীভূত হইল। পণ্ডিত একসের তেল কিনিতে গেলে, কালাচাঁদের নিকট পাঁচ পোওয়া পান। পণ্ডিতও, আমের সময় আম, লিচুর সময় লিচু, বর্ষাকালে চাল কড়াই-ভাজা, শীতে নূতন খেজুরে-গুড়ের সন্দেশ দিয়া নিয়ত

আহার চলে। টাকা ধার করিতে গেলেন,—কোথাও পাইলেন না। সম্পদের বন্ধুসম্প্রদায় এ সময় সরিয়া দাঁড়াইল।

অধিক কি, বন্ধু-পতিতপাবনও এসময় কালাচাঁদের সহিত বড় একটা বেশী বাক্যালাপ করিতেন না। কালাচাঁদ তাঁহার ছোট ঘরে রাঁধিয়া খাইতেন,—পতিতও প্রত্যহ কালাচাঁদের পয়সায় নিজের জন্য ব্যাদণ-ব্যঞ্জন উদ্যোগ করিয়া লইতেন,—কিন্তু আজ-কাল কালাচাঁদ খাইতে পাইল, কি না-পাইল, তাহা একবার চাহিয়া দেখেন না।

বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর হইল,—অভুক্ত কালাচাঁদ ছেঁড়া মাদুরের উপর শুইয়া আকাশ পানে চহিয়া আছেন। এমন সময় বন্ধু-পতিতপাবন পরামাণিক দ্রুতপদে আসিয়া, ভাঁড় ফেলিয়া কালাচাঁদকে স্পষ্টাক্ষরে বলিল, "তোমার আর এখানে থাকা হইবে না। তুমি আজই চলে যাও। হরে মুদী তোমার নামে উঠনার বাকী দরুণ ১নং ছোট আদালত ক'রেছে; শুন্‌লেম, শমন নিয়ে পেয়াদা বেরিয়েছে। শেষে কি তোমার দেনার দায়ে আমার বাড়ী নিলাম হবে?—তুমি আজ এখনই আপন পথ দেখ।"

কালাচাঁদ পরামাণিকের মুখপানে খানিক চাহিয়া, হাসিয়া, উঠিয়া পড়িলেন। কালাচাঁদ একটী পিতলের ঘটীমাত্র সম্বল লইয়া, মলিনবসনে ধীরভাবে চলিলেন। যাত্রাকালে—হাসি-হাসি মুখে বন্ধু-পতিতপাবনকে বলিলেন, "সাঙ্গাৎ! তোমার কাছে বেশ সুখে ছিলাম,—আমাকে ভুলিও না; যদি বেঁচে থাকি, আবার দুই এক বছর মধ্যে দেখা হবে।"

পরামাণিক কথার উত্তর দিতে সাহস করিল না। আনম্রিত-লোচনে বন্ধু কালাচাঁদের পানে চাহিয়া রহিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অন্ধকার। বৈশাখ মাস—অমাবস্যার সন্ধ্যা—মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। ব্যোমপথ হইতে মাঝে মাঝে মেঘগর্জ্জনের গুড়গুড় শব্দ আসিতেছে। কিন্তু জল হয় হয়,—আর হয় না; দুই এক ফোঁটা বারিবিন্দু পড়ে-পড়ে—আর পড়ে না। বহুদিন বৃষ্টি হয় নাই। পৃথিবী যেন জলের জন্ত হা হা করিতেছে। পথ ধূলি-রাশিতে পূর্ণ।

অল্প ঝড় উঠিল। ধুলা উড়িল। মানুষের নাক, কাণ, মাথা,—ঘর, দ্বার, বসন, ভূষণ, ধূলিময় হইল। ধুলার রাজত্ব, ধুলার লীলাখেলা আরম্ভ হইল। যে দুই একজন পথিক পথে চলিতেছিল, তাহারা পলাইয়া নিকটস্থ গৃহস্থের গৃহে আশ্রয় লইল। দেখিতে দেখিতে, একটা দমকাবাতাসে, হুগলীর কাছারি ঘাটের একটা অশ্বত্থ বৃক্ষের কচি ডাল ভাঙ্গিয়া গেল। পথ, প্রান্তর, জনশূন্য। মেঘ, ঝড়, ধুলা, অন্ধকার,—এই চারি বিভীষিকায় পৃথিবী ভয়ঙ্করী-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

হুগলীর আদালত-গৃহ গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত। ঘাটের নিকটে গঙ্গা নাই, চড়া পড়িয়াছে। বৈকালে, সন্ধ্যা-সমীরণ সেবনের জন্ত অনেক বাবু এবং স্কুলের ছোকরা-বাবু সেই ঘাটের সোপান-শ্রেণীতে বসেন, দাঁড়ান এবং বিচরণ করেন। বাবু ভিন্ন অনেক অ-বাবুও, যথা দাঁড়ী, মাঝা, মুটে, মজুর—সেই ঘাটের এক পার্শ্ব অধিকার করিয়া কখন বা মাদুর বিছাইয়া বসে, হাসে, গান গায়, তামাক খায়, হিসাবপত্র করে, তাস খেলে। ইহা ব্যতীত, তরুমূল

—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, বৃদ্ধ দোকানদার, স্বধর্ম্ম-নিরত সাধু ব্যক্তি, প্রত্যহ যথানিয়মে ঘাটে আসিয়া পতিতপাবনী ভাগীরথী দেবীকে নিরীক্ষণ করিয়া যান। ঘাটটী বড়ই রমণীয়। সম্মুখে গঙ্গা অর্দ্ধচন্দ্রবৎ কোর হইয়া প্রবাহিত; পশ্চাতে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষাবলী-পরিশোভিত রাজপথ [illegible] ঘাটের নিম্ন [illegible] উপকূল [illegible] বিস্তৃত মাঠ। [illegible] [illegible] শ্মশান ঘ[illegible] মনোহারিত্ব অপূর্ব্ব।

সেইদিন বেলা ৫টার সময় একজন দারিদ্র-ব্যাধিলক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তি, সেই ঘাটের সর্ব্বোচ্চ সোপানে আসিয়া বসিল। কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা নাই, কোনরূপ অঙ্গভঙ্গি নাই,—সে, নীরব, নিশ্চল, অটল। পাঁচটার সময় ঘাটের সান্ তপ্ত,—তথাচ তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই;—হেঁটমুণ্ডে তাহারই উপর বসিয়া রহিল। তাহার সঙ্গী বা সম্বল, একগাছি লাঠি এবং একটী পিতলের ঘটী। লাঠিতে দুই কাজই হয়;—বাবুগিরির বেড়ানও চলে, আর কুকুর, শেয়াল বা মানুষ-মারাও চলে। খানিক হেঁট হইয়া বসিয়া সেই লোকটা উত্তপ্ত ভূমে শুইয়া, আকাশ দেখিতে লাগিল। মুখে রোদ লাগায় চোখ বুজিল। তাহার কাপড়, আধময়লা; কোমারে চাদর জড়ানো; পায়ে দিল্লীর নাগড়া। চেহারা ষণ্ডা, চোক দুটা বড় বড়; রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ।

চিনিলেন কি?—ইনিই কালাচাঁদ। অভুক্ত কালাচাঁদ, পরম-বন্ধু-পতিতপাবন পরামাণিকের গৃহ হইতে বেলা তৃতীয় প্রহরে বিদায় লইয়া, আপন মনে হুগলী সহর পরিভ্রমণ করিলেন। গঙ্গার ধারের রাস্তা ধরিয়া, তিনি মোগলানের হাট, জেলখানা, মল্লিক-ঘাট, বাবুগঞ্জ এড়াইয়া চুঁচুড়ার বড়বাজারে উপনীত

হইলেন। রোদে রোদে, কেন এখন তিনি ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন, তাহা কেমন করিয়া বলিব? ভিক্ষা দ্বারা জঠর-জ্বালা শান্তির জন্য কি তিনি বাহির হইলেন?—তাই কি?—তবে পথি-মধ্যস্থ কোন কোন বড় চক্‌মিলান বাড়ীতে ঢোকেন, আর উঁকি মারিয়া সরিয়া আসেন কেন?—না, চুরি করা মতলব? কিন্তু দিনের বেলা, সদর দরজা দিয়া, প্রকাশ্যে কখন চুরি-বৃত্তি চলে কি? সে যাই হোক, কালাচাঁদ কিন্তু মাঝে মাঝে বিশুষ্ক মুখে, সতৃষ্ণ নয়নে, গৃহস্থের গৃহে, সদর দরজায় উঁকি মারিয়া যাইতে লাগিলেন। এইরূপে হুগলী-কলেজঘাট, ষাঁড়েশ্বরতলা, কেঁকশিয়ালী অতিক্রম করিয়া কামারপাড়ার বাজারের দিকে আসিলেন। শেষে মল্লিক কাসেমের হাট হইয়া, চক্‌ দিয়া হুগলীর সেই কাছারির ঘাটে আসিয়া বসিলেন।

তখন বেলা পাঁচটা। রোদটা যেন আগুন; ধূধূ জ্বলিতেছে। গাছগুলা যেন পুড়িয়া ঝলসিয়া গিয়াছে। গঙ্গার জলটা যেন টগবগ ফুটিতেছে। রাস্তায় ধূলি-কণা 'যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ উড়িতেছে। ছাতাহীন কালাচাঁদ ঘামে যেন অবগাহন করিয়াছেন। অদ্য এ পর্য্যন্ত তিনি জলস্পর্শ করেন নাই; কিন্তু এইবার বুঝি সেই বদনমণ্ডল-বিনিঃসৃত ঘর্ম্মরূপ প্রবল বারিধারা- সেই বিশুষ্ক অধর ভিজাইয়া, কালাচাঁদের সেই নীরস রসনায় আসিয়া নিপতিত হয়!! কিন্তু কালাচাঁদ তাহা ঘটিতে দিলেন না। তিনি অঞ্চল দ্বারা ঘামজল মুছিয়া ফেলিলেন। মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "আজ যে আমার নিরম্বু ভীম একাদশী! আমি কি এ জীবনে একটাও একাদশী করিতে পাইব না?" সোপান উত্তপ্ত দেখিয়া কালাচাঁদ মনে মনে বলিলেন, "মুনি ঋষি যোগীরা, প্রখর

রৌদ্রে, সূর্য্য পানে চাহিয়া, চারিদিকে আগুনের রাশি রাখিয়া প্রত্যহ কঠোর তপস্যা করেন, আমি কি একদিনও কেবল এই গরম স্নানে বসিয়া কঠোর ব্রত সাধন করিতে পাইব না ?”

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কালাচাঁদ প্রথমে হেঁটমুণ্ডে নীরবে ঘাটে বসিলেন,—তার পর শুইলেন ; সূর্য্য পানে চাহিলেন,—কিন্তু চোখ রাখিতে পারিলেন না—মুদ্রিত করিলেন।

ক্রমে সন্ধ্যার পূর্ব্বে আকাশে মেঘ দেখা দিল,—ঝড় উঠিল। ঘাট হইতে সকলে পলাইল। কালাচাঁদ কিন্তু নড়িলেন না,—ঘাটে এক কী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কোমর হইতে চাদর খুলিয়া মাথায় জড়াইলেন। ধূলায় দেহ পূর্ণ হইয়া গেল। যখন সেই দমকা-ঝড়ে, অশ্বত্থগাছের ডাল ভাঙ্গে, তখন কালাচাঁদের মাথা হইতে সেই চাদরটা উড়িয়া পলাইল ; একেবারে, সে গঙ্গাজলে পড়িয়া সাগরমুখে ভাসিয়া চলিল। কালাচাঁদ হাসিয়া, চাদরকে বলিলেন ;—“হেঁরে, তুই কি বিলাত যাবি নাকি ?—জাহাজ-ভাড়া নাই ব'লে বুঝি সাঁতার দিয়ে যাচ্ছিস্ ?” চাদরটার কাণ্ড দেখিয়া, কালাচাঁদের মুখে আর হাসি ধরে না

———

নবম পরিচ্ছেদ।

ঝড় কতক থামিল। কিন্তু অন্ধকার অধিক বাড়িল। রাত্রি ৮টা বাজিয়া গেল। কালাচাঁদ সেই জন-শূন্য ঘাটে একাকী আর কোথাও আলোকের চিহ্নমাত্র নাই,—কেবল ঘাটের চাঁদনীতে লণ্ঠনের একটি নির্ব্বাণোন্মুখ অতি সূক্ষ্ম-আলো মিটি মিটি জ্বলিতেছে; আর, অদূরে কালীতলার শ্মশান-ঘাটে একটী শবদাহ হইতেছে। কালাচাঁদের মুখমণ্ডলে দাহের সেই উজ্জ্বল আলোক-রশ্মি যেন নিপতিত হইল। প্রকৃতিদেবীর মূর্ত্তি এ আলোকে, আরও ভয়ঙ্করী হইল। কালাচাঁদ অনন্যমনে একদৃষ্টে একঘণ্টা কাল সেই আলোর প্রতি চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে আলো নিবিল, আগুন নিবিল, শ্মশানে শান্তিজল পড়িল, সব ফুরাইল। হরিবোল দিয়া সকলে ঘরে গেল।

কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন,—মানুষ মরিল ত ফুরাইল! কারো সঙ্গে কারু সম্পর্ক নাই—সমস্তই ছায়াবাজী! পাপই কি, আর পুণ্যই কি,—সৎকর্ম্মই কি, আর অসৎ-কর্ম্মই কি,—সব সমান; ম'রে গেলাম ত, সবই গেল,—কে কার খোঁজ লয়, তার ঠিক নাই! সংসার অনিত্য। এই মাটীর দেহ কোন্ দিন যে মাটীতে মিশাইবে, তাহা কে বলিতে পারে? তবে কেন আর কষ্ট করিয়া মরি?—যে ক-দিন বাঁচি, মজা করি! খাই দাই, সুখে থাকি, মজা করি! সংসারের যেরূপ গতি দেখিতেছি,—যে লোকটা পুণ্য-ধর্ম্ম সৎকর্ম্ম করিতে যায়, সে-ই কষ্ট পায়। পুণ্য ধর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহা ত বুঝি না! পুণ্যটা কি? পুণ্য করিলে খাইতে পরিতে পাইবে

না;—আর পাপ করিলে বেশ সুখে রাজার হালে থাকিবে।—ইহাই কি পাপ-পুণ্যের তারতম্য! এমন পুণ্য কর্ম্মের খুরে শত কোটী দণ্ডবৎ।—আমি ত এ কাজে নাই—”

এই কথা বলিয়া, ভাবমগ্ন কালাচাঁদ বাস্তবিকই সেই অন্ধকার রাত্রে ঘাটে বসিয়া আপনা-আপনি, উন্মত্তের মত প্রায় পঁচিশ বার যোড়হাতে প্রণাম করিলেন।

বাল্যকালে পঠদ্দশাতেই কি, গ্রাম্যস্কুলে মাষ্টারির অবস্থাতেই কি, আর কারাগারেই কি,—কালাচাঁদের ধারণা ছিল,—এই তিন কালেই তিনি অতিশয় দুর্জ্জয়, দুরন্ত বদলোক ছিলেন। কারা-মুক্তির পর ভাবিতে ভাবিতে ঠিক করিলেন, “আমি কাহারও অনিষ্টে বা মন্দ কাজে আর থাকিব না।” কালাচাঁদ নারী-জাতিকে জননীর ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। প্রকৃতই তিনি নিতান্ত ভাল মানুষ, সৎলোক হইলেন,—সংসারের সৎকর্ম্মে, পরোপকারে মন দিলেন। পতিতপাবনের বাসায় থাকিয়া গরীব দুঃখীকে অন্ন-বস্ত্র দিলেন। কিন্তু দুই চারিজন তোষামোদপ্রিয় ব্যক্তি ব্যতীত আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাকে ঘৃণা করিল, উপহাস করিল। কালাচাঁদ ভাবিলেন, “ইহাত এক মন্দ মজা নয়! যখন আমি বদমাইস ছিলাম, চোর ছিলাম, তখন আমায় কত লোকে আদর অভ্যর্থনা করিত; কিন্তু এখন ভাল লোক হইয়াছি,—এখন লোকে এত অশ্রদ্ধা, তামাসা করে কেন?” বিশেষ, ক্রমে যখন কালাচাঁদের পয়সা ফুরাইয়া আসিতে লাগিল, তখন সেই দুই-চারিজন প্রিয়-বন্ধুও প্রকাশ্যে কালাচাঁদকে টিটকারী দিতে লাগিল। শেষে, যেদিন তিনি নিঃসম্বল হইলেন, সেদিন প্রাণের বন্ধু পতিতপাবন পরা-মাণিকও তাঁহাকে গৃহ হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল।

কালাচাঁদ উদরান্নের জন্য কখন চিন্তিত হন নাই; আজও হই-লেন না; তিনি কেবল ভাবিতে লাগিলেন, কেন এমন হয়? পতিতপাবন শেষে ছাড়িল কেন?”

পতিতপাবনের মুখে নালিসের কথা শুনিয়া কালাচাঁদ হাসিয়াছিলেন। হাসির কারণ এই যে, “নালিসের শেষ ফল’ত আমাকে জেলে দেওয়া। কিন্তু জেলে গেলে যে, আমি রাজা হইতে পারি,—মূর্খ পতিতপাবন, তাহা বুঝে না।”

ভিক্ষাই তাঁহার নগরপরিভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল।—“চুরি, ডাকাতি, প্রবঞ্চনা আর কস্মিন্‌কালে করিব না,—ভিক্ষা করিয়া সাধুভাবে দিন কাটাইব;”—মনে মনে এই কথা কহিয়া, তিনি বেলা তৃতীয় প্রহরে ভিক্ষার্থ বহির্গত হন। কিন্তু নিদারুণ লজ্জা আসিয়া, কেমন এক অনৈসর্গিক দুর্ব্বলতা আসিয়া তাঁহার ভিক্ষা-পথে বাধা দিল। “মাগো, দুটী ভিক্ষা দাও,”—বলিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না,—ঐ কথা মনে মনে উচ্চারণ করিতেই তাঁহার যেন মাথা কাটা যাইতে লাগিল; সুতরাং ভিক্ষার কথা মুখ দিয়া ফুটিল না। তিনি আরও ভাবিতে লাগিলেন, “আমার এমন সবল সুস্থ শরীর,—ইহাতে ভিক্ষার কথা বলিলে, লোকেই বা মনে করিবে কি?” কালাচাঁদের ভিক্ষা করা হইল না; কেবল নগর-ঘুরিয়া ঘাম এবং এক-পা ধূলাশুদ্ধ কাছারির ঘাটে আসিয়া বসিলেন।

তিনি চাকুরির চেষ্টা করেন নাই কেন? কারামুক্তির পর—ভদ্র, অভদ্র বহুলোকেই তাঁহাকে উপহাস করিল। গ্রামস্থ আত্মীয়-স্বজনের নিকট গেলেন,—তাঁহারাও কালাচাঁদকে ঘৃণার চক্ষে দেখিলেন। হাঁদা চেহারা, কালো রঙ, মোটা কাপড় দেখিয়া,

নিশাথে গঙ্গার ঘাটে কালাচাঁদ।



কালাচাঁদকে কেহই পছন্দ করিল না। সুতরাং তিনি চাকুরির প্রস্তাব করেন কা'কে? মহাবিরক্ত-চিত্তে তিনি উচ্চপদস্থ ভদ্র লোকের সহিত একরূপ দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করিলেন।

আজ বড় সঙ্কটকাল। এক দিকে জুয়াচুরি প্রতারণার সঙ্গে সুখ-সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য; অন্য দিকে সৎকর্ম্ম সাধুপথের সঙ্গে লাঞ্ছনা, অবমাননা, অনাহার। কোন পথে যাবেন? সেই অমাবস্যার নিশীথে, গঙ্গার উপকূলে বসিয়া, শ্মশানের দিকে চাহিয়া, কালাচাঁদ তাহাই ভাবিতে লাগিলেন। শেষে, সেই শবদাহ-অগ্নি-নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে সেই উপরি-কথিত কথাগুলি তাঁহার হৃদয়ে উত্থিত হইল,—অবশেষে পুণ্যকর্ম্মের খুরে তিনি শত কোটী প্রণাম করিলেন;—বুঝি পুণ্যকর্ম্মকে গঙ্গাসলিলে জন্মের মত ভাসাইয়া দিলেন।

কালাচাঁদ আরও ভাবিতে লাগিলেন, "এ সংসারে জুয়াচোর, শঠ, প্রবঞ্চক কে নয়?—কেবল আমিই কি ধরা পড়িয়াছি?—চুরি কে না করে? মিথ্যা কথা কে না কয়? বঞ্চনা কাহাতে নাই? তবে বড়লোকে ধরা পড়ে না; আমার মত ছোট লোকেই ধরা পড়ে। দূর-সম্পর্কীয় আমার মেসো, নাজীর; ঠাকুরদাদা, সেরেস্তাদার; এ দুজনের পসার-প্রতিপত্তি, ধূমধাম দেখে কে? লোকে উভয়কেই ধর্ম্মাবতার বলিয়া নমস্কার করে, প্রণাম করে। কিন্তু এ দুজনেই কি জুয়াচোর, বঞ্চক নহে? মেসোর মাহিনা ৩০৲ টাকার অধিক নয়; কিন্তু তাঁহার বাসায় দুই বেলা ৪০ খানি পাত পড়ে। মাসীর গায়ে প্রায় দুই হাজার টাকার গহনা। বাটীতে প্রতিবৎসর দোল দুর্গোৎসব হয়। মেসো, সম্বন্ধীর নামে তালুক কিনিয়াছেন। জিজ্ঞাসা কর, মেসো এত টাকা পান কোথা?

নিশ্চয়ই চুরি-করা ধন। ছোট-লোকে সিঁধ কাটিয়া চুরি করে, আর বড়-লোকে কথার কৌশলে, বুদ্ধির জোরে চুরি করে। আমরা অসভ্য চোর; তাঁহারা সভ্য চোর। মেসোর বাসায় দুই-জন নাপিত-পেয়াদা, খানসামা;—দুইজন ব্রাহ্মণ-পেয়াদা, রসুয়ে। তাহারা মাহিনা খায়—কোম্পানীর; কিন্তু কাজ করে মেসোর। এ সব কথা সকলেই জানে—অথচ, মেসোর জেল হয় না কেন? ঠাকুরদাদার অবস্থাও তথৈবচ। তাঁহার গ্রাম্য-খড়ো ঘর আমার ত অবিদিত নাই,—আজ তাঁহার চকমিলন বাড়ী! প্রত্যহ সন্ধ্যার পর লক্ষ্মীনারায়ণের আরতির সময় নহবৎ বাজে। কেহ কেহ বলে, ঠাকুরমার নামীয় কোম্পানির কাগজ আড়াই লক্ষ উপচাইল। জুয়াচুরী ভিন্ন এত টাকা কোথা হইতে আইসে? ঠাকুরদাদা ত আর পরেশপাথর কুড়াইয়া পান নাই যে, ঠেকাইলেই সব সোণা হইয়া যাইতেছে!! ঠাকুরদাদা যে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে কাছারি হইতে আসিবার সময় চাপকানের বুকপকেট-পূর্ণ টাকা এবং নোট লইয়া আইসেন, হাকিম বাহাদুর কি তাহা দেখিতে পান না? তবে সে কিসের হাকিম? সে কিসের বিচারক? যে এত অন্ধ, তাহাকে উচ্চ বিচারাসনে বসান কেন?

"আর উকীল মোক্তারই বা কি? যত ফেরেফ ফন্দি,—সব ইহাঁদেরই হাতে। এমন অকথা, কু-কথা নাই যে, ইহাঁরা মক্কেলকে উপদেশ দিয়া না থাকেন। একই আইনের একদিন এক রকম অর্থ হইল,—আবার সুবিধামত, অন্যদিন সেই আইনের অন্যরূপ অর্থ হইল। হাকিমকে ঠকানো, হাকিমের চক্ষে ধূলা দেওয়া, ইহাদের ব্যবসা। মনে করুন, আমি উকীল, আমার হাতে মোকদ্দমা কম,—একটী মোকদ্দমা লইয়া, হাকিমের কাছে

বাজে বক্তৃতা করিয়া, সেই একদিনের মোকদ্দমায় দশ দিন করিলাম। মনে মনে নিশ্চয় বুঝিলাম, মক্কেল দোষী, এদিকে বক্তৃতার সময় হাকিমকে বুঝাইলাম, মক্কেল নির্দ্দোষ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক! এ কি রকম কাজ বুঝি না,—এ কি রকম ধর্ম্ম জানি না, এ কি রকম সভ্যতা হৃদয়ঙ্গম হয় না!

"আর বিচারপতি হাকিমই বা কি?—নাজির তাঁহার বাজার-সরকার। নাজিরবাবু যেমন সস্তায় জিনিষ কিনিতে পারেন, এ ত্রিভুবনে তেমনটী আর কেহই পারেন না। ঘৃত টাকায় দেড় সের,—কিন্তু নাজির কেনেন, এক টাকায় তিন সের। বাজারে চারি আনা মাছের সের; কিন্তু নাজির মহাশয় দশ সের মাছটা অনায়াসে এক টাকায় লইয়া আসেন। হাকিমের চক্ষে সাক্ষী দুই প্রকার,—দুয়ো অরে সুয়ো। কোন সাক্ষীকে ধমক দিয়া, চক্ষু রাঙ্গাইয়া, তাহার এজেহার লইতেছেন; সাক্ষী এক কথা বলিলে অন্য কথা লিখিতেছেন, অথবা তাঁহার মনোমত কথা না বলিলে তাহা লিখিতেছেন না। বিচার ঠিক হউক, আর নাই হউক,—সে দিকে বিচারকের দৃষ্টি নাই;—কিসে উপর আদালতে তাঁহার রায় বজায় থাকে,—ইহাই তাঁহার চেষ্টা। ধর্ম্মাধর্ম্ম কে বুঝে, জালজুয়াচুরি কে বুঝে,—রায় বজায় থাকিলেই, চাকুরি বজায়,—পদোন্নতি!—সেইটা ঠিক থাকিলেই হইল।

"ব্যবসায়িগণের ত মিথ্যাকথার ব্যবসা। কাপড়ের দোকানে যাও, লম্বোদর ভদ্র দোকানদার বলিবে, "মহাশয়। গঙ্গাজলিমাসে বলিতেছি এ কাপড়জোড়াটী ৩৶১০ টাকায় খরিদ,—তা, আপনার নিকট চারিগণ্ডা পয়সার বেশী লাভ লইব না।" শেষে, একঘণ্টা—কষাকষি, মাজামাজি, হেস্তাহেস্তিতে ২৸০ টাকায় দোকানদার

কাপড় বিক্রয় করিল। দশ গজ থান কেনো,—ঘরে আসিয়া মাপো, সাড়ে নয় গজের অধিক হইবে না। ইহারা কি চোর বঞ্চক নয়?—তবে আমি একলা কালাচাঁদ ধরা পড়ি কেন? সমাজের অন্যান্য লোক অপেক্ষা আমি যে কি অধিক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, তাহা'ত আমি বুঝি না। সকলেই জানে, গোয়ালা দুধে জল দেয়; এ তত্ত্ব হাকিম, উকিল, জমীদার, রাজা সকলেই অবগত আছেন। এ প্রবঞ্চনা-অপরাধের জন্য সে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয় না কেন? প্রকাশ্যত পথে পথে ফেরিকর অবিরত চীৎকার করে, 'চাই, ভালো আম্! খাসা মিষ্টি আম্;' ফেরিকর ডাকিয়া, আম্ কাটিয়া, চাকিয়া দেখ,—টক্ আমড়া তার কাছে কোথায় লাগে? এইরূপ কতশত মূর্ত্তিমান্ প্রবঞ্চক প্রত্যহ রাজপথে সর্ব্বজন-সমক্ষে প্রবঞ্চনা-গীত গাহিতে গাহিতে হেলিয়া-দুলিয়া হাসিয়া-খেলিয়া চলিয়া যায়,—তাহার সংখ্যা কে করিবে?—কিন্তু ইহাদিগকে কারাগারে পাঠান হয় না কেন?"

মহামতি কালাচাঁদের ভাবনার শেষ নাই। তিনি যতই ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিল,—"সমাজের প্রায় সকল লোকই তাঁহা অপেক্ষা অধিক জুয়াচোর, বঞ্চক, শঠ।" কালাচাঁদ আরও দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইলেন,—"দুষ্কর্ম্মের জন্য যাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হওয়া উচিত ছিল,—সেই লোকটাই কিনা আজ সমাজের মান্য-গণ্য-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি।"

শেষে কালাচাঁদ ঠিক্ করিলেন,—"সংসারে আবার পাপপুণ্য কি?—ধর্ম্মাধর্ম্ম কি?—মারিলাম ত সব ফুরাইল। ঐ যে লোকটা কালীতলার ঘাটে পুড়িয়া ছাই হইল,—উহার আর কি রহিল বল দেখি? বড় বড় দুষ্কর্ম্মের কথা ধরি না,—এই একটু সামান্য,

সহজ কার্য্য—চুরি করায় দোষটা কি? পরের দ্রব্য না বলিয়া গ্রহণে পাপটা কি?—ধরা না পড়িলেই হইল!—রাজদ্বারে দণ্ডিত না হইলেই হইল! আর আমার পক্ষে রাজদণ্ড—কারাবাস,—সে ত সুখের কথা! কোন্ দ্রব্যটা আমার, তা'ত আমি বুঝি না। এই যে কোম্পানী, এ মুলুকটা নিয়েচে, এ মুলুকটা কি পরের নয়? জোর যার মুলুক তার;—আপন-পর ইহাতে কি আছে? রাজা বলেন, 'ঐ পাহাড়টা আমার, ঐ নদীটে আমার' ঐ জমীটে আমার।' কিন্তু কেন যে উহা রাজার হয়, তাহা'ত বুঝি না! সবই যদি ঈশ্বরের সৃষ্টি,—তবে উহা আমার হইল না কেন? আমি পাহাড়ে কাট কাটিতে গেলে, রাজা তাড়াইয়া দেয় কেন? ফল কথা, এ সংসারে কাহারই কিছুই নয়,—যে যাহা জোর করিয়া লইতে পারে, সে বস্তু তাহারই হয়। সংসারে বাস করিতে হইলে, কেবল কল, বল, কৌশল চাই। তাই বলি, পরদ্রব্য-গ্রহণে অর্থাৎ চুরি করায় আর দোষ কি?

"সাধু হওয়ার অর্থ,—সমাজ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত এবং অনাহারে থাকা। কেন ভোগে বঞ্চিত হইব?—আমার অপরাধ কি?—এঁ —এঁ—

চুরি করায় দোষ কি?—"

কালাচাঁদ এইবার ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন,—আকাশ হইতে এ কথার উত্তর আসে কি না? চমকিয়া পশ্চাতে চাহিলেন; তাঁহার যেন মনে হইল, "চুরি করায় দোষ কি?"—এই প্রশ্নের উত্তর পশ্চাৎ হইতে আসিতেছে। কিন্তু পিছন ফিরিয়া তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। সম্মুখে তাঁহার সেই শ্মশান-ঘাট

ঈষৎ দৃষ্টিগোচর হইল। সেই শান্তি-নিকেতন, সুপবিত্র মহা-শ্মশানকে সম্বোধন করিয়া কালাচাঁদ মনে মনে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিলেন, "শ্মশান! তুমি সর্ব্বজীবের পরিণাম, শেষ আশ্রয়স্থল। তুমি বলিয়া দাও, আমি আজ অনাহারে মরি কেন? হুগলী সহরে চাল, ডাল, দুগ্ধ, ঘৃত, ছানা, চিনির ত অভাব নাই,—আমি তাহার কিছুই পাইব না কেন? আমার অপরাধ কি?" নিম্নে প্রসন্ন-পুণ্যসলিলা ভাগীরথী কুলকুল-নাদে প্রবাহিতা। কালাচাঁদ গঙ্গার দিকে চোখ ফিরাইয়া যোড়হাতে জিজ্ঞাসিলেন,—"মা, তুই-ই না হয় ব'লে দে,—আমার অপরাধ কি?—আমি না-খেতে পেয়ে মরিব কেন?"

কালাচাঁদের চোখে জল আসিল। বারিধারায় গণ্ডস্থল ভাসিল। কালাচাঁদের ইহজীবনে, অন্তরের ক্রন্দন আজ এই নূতন।

অবনী নীরব। শ্মশান নীরব। আকাশ নীরব। গঙ্গা নীরব। কালাচাঁদের কর্ণে কেহই সদুত্তর দিল না। বহুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষায় রহিলেন,—কিন্তু কেহই তাঁহার সহিত কথা কহিল না।

অমাবস্যায় অন্ধকার-রাত্রি। আড়াই প্রহর অতীত। কালা-চাঁদ মালকোঁচা-কাপড় পরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভাবে বিহ্বল হইয়া, তীব্র চীৎকারে, আঁধার-তরঙ্গ কাঁপাইয়া, ভাগীরথীর জল ভেদ করিয়া কালাচাঁদ বলিলেন,—

"চুরি করায় তবে দোষ কি?

কিছুই নাই, কিছুই নাই।"

এবার গঙ্গা ঠিক উত্তর দিলেন, "চুরি করায় তবে দোষ কি? -কিছুই নাই, কিছুই নাই।" প্রতিধ্বনিতে পৃথিবী চমকিল।

কালাচাঁদ তখন হৃষ্টচিত্তে, সেই লাঠি ঘাড়ে করিয়া, লম্ফ-ঝম্পে ঘাটের চাঁদনীর ভিতর গেলেন। দেখিলেন, তথায় প্রহরী-কনষ্টবল ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। কালাচাঁদ, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপবিশিষ্ট লণ্ঠনটীকে, লাঠির আঘাতে ভাঙ্গিয়া, হাসিয়া দৌড়িলেন। লণ্ঠন-পতনের ঘোর শব্দে কনষ্টবলের কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিল। সে চমকিয়া উঠিয়া, এদিক ওদিক চাহিয়া, প্রকৃতিস্থ হইয়া, ব্যাপার দেখিয়া বলিল,—"এ—এঃ ঝড়ুমে লণ্টেনটোভি গির্ পড়া!"

প্রথম পর্ব্ব সমাপ্ত।

মুটে সঙ্গে মাছ হাতে লইয়া কালাচাঁদ।



কালাচাঁদ।

দ্বিতীয় পর্ব্ব-পিতামহ-দর্শন

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতে কালাচাঁদ হুগলী পিপুলপতিসায়রে ঠাকুর-দাদার বাসাভিমুখে হন্ হন্ চলিয়াছেন। তাঁহার হাতে একটা দশ সের রুই মাছ, সঙ্গে একটা মুটে। আজ কালাচাঁদের সহজ শরীর,—বেশ ভাল মানুষ। কোন ভাবনা চিন্তা নাই। যেন সদানন্দ ভাব—হাসি-হাসি মুখ। বাসায় পৌঁছিয়া, চৌকাট ডিঙ্গাইতে না ডিঙ্গাইতেই, কালাচাঁদ উচ্চকণ্ঠে হাঁক্ দিলেন, "দাদা মোশাই!—অ, দাদা মোশাই! বাড়ীতে আছেন কি?"

ডাকটীতে ভক্তি আছে, আদর আছে, আবদার আছে;—যেন নাতী-ঠাকুরদাদায় কত মাখামাখি ভাব,—উভয়ের মধ্যে প্রত্যহ কতই যেন স্নেহভক্তির বেচা-কেনা হইয়া থাকে; কিন্তু রহস্য এই, এ জীবনে কালাচাঁদের সহিত ঠাকুরদাদার তিনবারের অধিক দেখা হয় নাই।

কালাচাঁদের মাতুলালয়েই জন্ম,—নিজের পৈতৃক ভিটা, এক-বার ব্যতীত, কখন তিনি দেখেন নাই। যখন তিনি বর্দ্ধমানে

রাজস্কুলে পড়েন, সেই সময় লোক পাঠাইয়া ঠাকুরদাদা তাঁহাকে স্ব-গ্রামে লইয়া যান। ৺শারদীয় উৎসবের সময় এ ঘটনা ঘটে। ঠাকুরদাদা পূজার ছুটীতে বাটী আসিয়া এ কাজ করেন।

ঠাকুরদাদারা দুই ভাই। জ্যেষ্ঠ রামতারণ, পরলোকগত, কনিষ্ঠ হরিতারণ—স্বয়ং ঠাকুরদাদা। রামতারণের পুত্রও মৃত,—এখন একমাত্র বংশধর স্বয়ং কালাচাঁদ। হরিতারণ অর্থাৎ বর্ত্তমান ঠাকুরদাদার এক্ষণে ধনে-পুতে লক্ষ্মীলাভ।

হরিতারণ স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ। স্বয়ং স্বহস্তে, স্বকলমে, স্বীয় ভাগ্যবলে বহুতর বিষয়-বিভবের অধিকারী হইয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি বিশেষ কিছুই ছিল না বলিলেই হয়।

জ্যেষ্ঠ রামতারণ কোন জমীদারের তরফে নায়েব ছিলেন। অন্নকষ্ট ছিল না; বেশ গুছাইয়া গাছাইয়া তিনি স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতেন। তিনি বড় তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার কথায় যেমন ক্ষুরের ধার ছিল, শরীরেও তেমনিই অসীম শক্তি ছিল। সে সময় জমীদারীতে সদাই দাঙ্গা-হাঙ্গামা, ধর্ম্মঘট হইত। রাম-তারণ, বিদ্রোহী প্রজা-শাসনে এবং লড়াই জয়-করণে সুপটু ছিলেন। প্রজারা রামতারণের নামে থর-থর কাঁপিত।

এক সময় রামতারণ, একটা বিষম দাঙ্গায় জয়ী হইয়া, মনিবের নিকট দুই শত টাকা পুরস্কার পান। তিনি একদিন সেই বিবাদী গ্রামে, কাছারির ঘরে রাত্রে বেশ সুখে নিদ্রা যাইতেছিলেন, এমন সময়ে ডাকাত পড়িয়া তাঁহাকে কাটিয়া গেল। কেহ কেহ এমনও বলেন, প্রজারাই দলবদ্ধ হইয়া, ডাকাত সাজিয়া, তাঁহার নিধন সাধন করে।

রামতারণের এক পুত্র; নাম ভবানীচরণ। পিতার মৃত্যুর

কয়েক বৎসর পরে, তাঁহারও জ্বররোগে অকালে মৃত্যু ঘটে। ভবানীর মৃত্যুকালে কালাচাঁদ জননী-জঠরে অবস্থিত।

স্বামীর পরলোক-গমনের পর, কালাচাঁদ-জননী অগত্যা পিতৃ-গৃহে গমন করেন। শ্বশুর-সংসারে আর কেহই নাই; জন্মের মত কালাচাঁদ-জননীর শ্বশুর-ঘর করা ফুরাইল!

কালাচাঁদের যে কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, তাহাতে সামান্যই আয় হইত। কিন্তু দখল বজায়ের জন্য মামা সে আয় টুকু ছাড়িতেন না;—তিনি কালাচাঁদের বাটী হইতে ভাদ্র মাসে নারিকেল পাড়াইয়া আনিতেন, জ্যৈষ্ঠ মাসে আম আনিতে লোক পাঠাইতেন; দুই এক মাস অন্তর মাঝে মাঝে মাছ ধরিতে বর্দ্ধমান হইতে জেলে প্রেরণ করিতেন। সম্পত্তির মধ্যে এক আম বাগান, দুই পুকুর এবং কয়েক বিঘা জমি ছিল। রামতারণ ও হরিতারণের ইহা যৌথ-সম্পত্তি।

তার পর কালাচাঁদের মাতুলালয়ে জন্ম, বৃদ্ধি, প্রভাব, প্রতি-পত্তির ইতিহাস, পাঠক অবশ্যই অবগত আছেন।

এদিকে যেমন রামতারণ দত্তের বংশ নির্ব্বংশ হইবার উপক্রম হইল,—একমাত্র কালাচাঁদে কেবল বংশফল পর্য্যবসিত হইল; অন্যদিকে সেইরূপ হরিতারণের বংশাবলীর শাখা-প্রশাখা, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে না হউক, পরোক্ষভাবে, বহুবিস্তৃতি লাভ করিল। তাঁহার এক পুত্র, চারি কন্যা, এখনও তাঁহার সহধর্ম্মিণী বর্ত্তমান। ঐ এক পুত্র হইতে তিনি এক গুণময় পৌত্র লাভ করিয়াছেন।

ঐ চারি কন্যার চারি স্বামী ঘর-জামায়ে। দ্বাদশটী দৌহিত্রী। দ্বাদশটী দৌহিত্রীর স্বামীর মধ্যে আটটী "ঘর-নাতি-জামায়ে।" দৌহিত্র সাতটী। ইহাদের আবার যথানিয়মে বংশবিস্তার।

সুতরাং হরিতারণের গৃহ একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এদিকে কালাচাঁদ একা—অন্যদিকে ঠাকুরদাদা একশত; কোথাও বালুকাময় ভূমে একটী অর্দ্ধশুষ্ক বটবৃক্ষ; আর কোথাও নন্দন-কাননবৎ সুরম্য, সুগন্ধিত উদ্যানে যুঁই-গোলাপ-বকনাগন্ধের —আম-জাম-কাঁটাল-তাল নারিকেলের সমাবেশ। কোথাও পূর্ণিমার শারদ-গগনে তারাদলের সহ শশধর হাসিতেছে; আর কোথাও অমাবস্যার মেঘময় আকাশ, চন্দ্র-অভাবে বারিবর্ষণ-ছলে কাঁদিতেছে। কাহারও দুধে চিনির উপর ক্ষীরের মণ্ডা; কাহারও শাকে বালির উপর ঘুঁটের কুচি।

দেখিতে দেখিতে, আট দশ বৎসরের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামতারণের বাড়ীর পাঁচীর পড়িল, ঘরের চাল উড়িল, কবাট জানালা কে খুলিয়া লইয়া গেল। প্রথম প্রথম দু-একবৎসর কালাচাঁদের মামা দুই এক টাকা খরচ করিয়া, ঘরের চালে খড় দিয়া, গোঁজা-মিলনগোছ করিয়া, ঘর ছাওয়াইয়াছিলেন। কিন্তু ভগ্নবাড়ী ক্রমশই ভঙ্গের দিকে প্রবণ হইল। মামা ক্ষান্ত হইলেন; ক্রমশঃ বাটী সমভূম হইল, জঙ্গলে পরিণত হইল। আমগাছ, আতাগাছ, পেয়ারাগাছ, ভেরেন্দাগাছে সেস্থান পূর্ণ হইল। শেষে তথায় বসতবাটীর চিহ্নমাত্রও রহিল না। কিন্তু এদিকে হরিতারণের খড়ো-ঘর হইতে তে-তোলা চকমিলন বাটী উত্থিত হইল। ফটকের উপরে নহবৎখানা বসিল; খিড়কীতে অন্দরের সামিল, একটী দীঘি খনন এবং বাগান তৈয়ারি হইল। দ্বারে দুইজন দ্বারবান্ কেবল গাঁজা টিপিতে লাগিল। বৎসর বৎসর দোল, দুর্গোৎসব, রাস হইতে লাগিল। শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। দেবালয়ের সংলগ্ন একটী অতিথিশালাও স্থাপিত হইল। প্রাতঃ-

কালে ও সন্ধ্যার সময় ঠাকুরবাটীতে শঙ্খ, ঘণ্টা এবং বম্‌বম্‌ হরহর-ধ্বনির ধমকে ধরা বিকম্পিত হইল।

দুই ভাই—ঠাকুরদাদাদ্বয়, জীবদ্দশাতেই পৃথক্‌-অন্ন হন। অন্যান্য সম্পত্তি যৌতায় রহিল, কেবল বাস্তভিটার ভাগ হইল। খিড়্‌কীতে একটা ছোট পুকুর ছিল,—বলা বাহুল্য, সেটার অংশ হইল না; তখন সে আবশ্যকও ছিল না। সেই ছোট পুকুরটাই এক্ষণে হরিতারণের টাকার জোরে দীর্ঘিকায় পরিণত হইয়াছে।

হরিতারা পাকা-লোক। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেই জঙ্গলময়, অধিকারি-বিহীন বাস্তভিটাটা সহজেই দখল করিতে পারিতেন, কিন্তু একমাত্র উত্তরাধিকারী কালাচাঁদের জন্য, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তবে সেই খিড়কীর পুকুরটীর লোভ তিনি সম্বরণ করিতে পারেন নাই। যথাকালে হরিতারণ জ্ঞাতিবর্গকে, প্রতিবেশি-মণ্ডলীকে কৌশলে জানাইলেন, এ পুকুরটী তাঁহার জ্যেষ্ঠ জীবৎকালে তাঁহাকে বিক্রয় করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তিনি ঐ পুকুরটীকে সম্পূর্ণরূপ আয়ত্তাধীনে আনিতে সমর্থ। ঠাকুরদাদার তখন বুধাদিত্য মহাযোগ উপস্থিত, সম্পদের ষোলকলা পূর্ণ, সুতরাং কেহই এ বিষয়ে উচ্চবাচ্য করিতে পারিল না। তিনি আপন মনে স্বচ্ছন্দে দীঘি কাটাইলেন। হরিতারণ তাঁহার বাটীর তিন পার্শ্বের স্থান খরিদ করিয়া, গৃহের পরিসর খুব বৃদ্ধি করিলেন বটে, কিন্তু একপার্শ্ব যে, কেবল কালাচাঁদের কারণে জঙ্গলময় থাকিবে, সেই জঙ্গলের জন্য যে তাঁহার বাটীর শোভা বিনষ্ট হইবে, ইহা তাঁহার সহ্য হইল না। বিশেষ, সেই স্থানটুকু পাইলে, তাঁহার চকমিলন বাটীর এক-পেশে দোষ ঘুচিয়া যায়; পূর্ণচন্দ্রে কলঙ্ক-কালিমা আর থাকে না।

তাঁহার জামাতা এবং দৌহিত্রগণ জোর করিয়া সেই জঙ্গলভূমি অধিকারের জন্য বড়ই বিব্রত হইল, কিন্তু বৃদ্ধ তাহাদিগকে বুঝাইয়া থামাইয়া রাখিলেন।

ঠাকুরদাদা হিসাবী, পাকা, ঝুনো লোক। প্রথম প্রথম তাঁহার কেমন মনে হইত,—কালাচাঁদ আর ক-দিন? ও ছোঁড়া বাঁচিবে না,—শীঘ্রই মরিবে! যার পিতা, পিতামহ, মাতা অকালে মরে,—সে কখনই দীর্ঘজীবী হয় না। বিশেষ, কেলে-ছোঁড়াটা মামার বাড়ী খেতে-মাখতে না পেয়ে, পেটের পীড়ায় আক্রান্ত হ'য়ে, শীঘ্রই সহজেই শমনসদনে গমন করিবে!

কিন্তু দুঃখের বিষয়, কালাচাঁদ মরিলেন না! তিনি বর্দ্ধমানে মামার বাসায় হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ, কর্ম্মিষ্ঠ হইলেন। ঠাকুরদাদা একবার পূজার ছুটিতে বাটী আসিয়া, একথা শুনিয়া মহা বিরক্ত এবং চিন্তিত হইলেন। কালাচাঁদকে দেখিবার তাঁহার সাধ হইল। ধুতি, চাদর, এক হাঁড়ি সন্দেশ দিয়া তিনি কালাচাঁদের তথ্য লইলেন। সেই সঙ্গে কালাচাঁদের মামাকে পত্র লিখিলেন,—"আমার নাতীটী কেমন হইল একবার দেখিবার বড়ই ইচ্ছা। কালাচাঁদ বাঁচলে দাদার বংশরক্ষা, নামরক্ষা হয়; ভিটায় সন্ধ্যা পায় আর পিণ্ডলোপও হয় না। আহা! ছেলেটী এক-শ বছরের হয়ে বেঁচে থাকুক। আমার এমনি দুরদৃষ্ট! কেলেসোনার মুখটি এপর্য্যন্ত একবারও দেখিতে পাইলাম না। বারমাস বিদেশে থাকা, সরকারী কাজ,—অবকাশ ত এক দিনের জন্যও নাই, কাজেই বাছার মুখটী দেখতে পাই না। যাহা হউক, এই পূজার বন্ধে আমি বাটী আসিয়াছি, এসময় একবার কালাচাঁদকে পাঠিয়ে দিলে বড়ই সুখী হইব। বাটীতে মা এসেছেন—যাত্রাগান ভোজ

হবে; কালাচাঁদ পূজাবাটীতে দেখবে শুনবে, খেয়ে খেলিয়ে, নেচে কুঁদে বেড়াবে; আমার আনন্দ হবে। কালাচাঁদ'ত আমার পর নয়।"

পত্র পাইয়া, মামা ঈষৎ হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, "এই যে দেখছি, বহুকালের পর ঠাকুরদাদার নাতীকে মনে পড়েছে। আদর কিছু গুরুতর দেখচি।" মামা, পত্রানুযায়ী, ভাগিনেয় কালাচাঁদকে ঠাকুরদাদার বাটীতে পাঠাইলেন,—কোনরূপ ওজর-আপত্তি করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন না।

কালাচাঁদের সহিত, ঠাকুরদাদার ইহাই প্রথম সাক্ষাৎ।

কালাচাঁদ তখন বড় দুরন্ত বালক। স্বগ্রামে গিয়া চারিদিন কাল থাকিয়া গ্রামকে তোলপাড় করিয়া তুলিলেন। সমবয়স্ক ছেলেপিলেকে মারিয়া ধরিয়া দিগ্বিজয়ী হইলেন। ঠাকুরদাদার পুত্রের পুত্র, প্রিয়তম নাতী শ্রীমান্ সুরেশচন্দ্রের গালে কালাচাঁদ এমনি এক বিভীষণ চড় মারিলেন যে, সুরেশ সরিষা-ফুল দেখিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া গেল। বিজয়া-দশমীর দিন বৈকালে ঠাকুরবিসর্জ্জনের পূর্ব্বেই, কালাচাঁদ বাঘের মত ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভগবতীর মুকুট ছিঁড়িয়া খুলিয়া লইয়া দৌড়িলেন। ইতিপূর্ব্বে পল্লীগ্রামে মাতুলালয়ে কালাচাঁদ যে সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, ঠাকুরদাদার গৃহে আসিয়া তদনুরূপ কার্য্য-সম্পাদানে অমনোযোগ করিলেন না। কালাচাঁদের কাণ্ড দেখিয়া ঠাকুরদাদা ত অবাক্! তিনি, একাদশীর দিনই নাতীকে মাতুলালয়ে পাঠাইলেন। ইহাই নাতী-ঠাকুরদাদার প্রথম সাক্ষাৎ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

প্রথম-সাক্ষাতের দুই বৎসর পরে নাতী-ঠাকুরদাদার দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। এবার ঠাকুরদাদা স্বয়ং বর্দ্ধমানে গিয়া কালাচাঁদের সহিত দেখা করিলেন। স্বয়ং সশরীরে যাইবার একটু কারণও ছিল।

প্রাতে বর্দ্ধমানে পৌঁছিয়া ঠাকুরদাদা কালাচাঁদকে বহুরূপ আদর অভ্যর্থনা করিলেন; ধুতি, চাদর, সন্দেশের সঙ্গে কালাচাঁদের বিদ্যাশিক্ষা-কার্য্যের সৌকর্য্যার্থে মামার হাতে নগদ পাঁচটী টাকাও দিলেন। ক্রমশ একটু বেলা হইলে ঠাকুরদাদা কালাচাঁদকে কোলে বসাইলেন, গায়ে হাত বুলাইলেন, চুম খাইলেন, হায়-হায় করিলেন, চোখে দুফোঁটা জলও ফেলিলেন।

অপরাহ্নে নিভৃতে ধীরে ধীরে তিনি নানা ছন্দেবন্দে মামাকে বলিলেন, "আপনার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ আলাপ ইতিপূর্ব্বে ছিল না,—কিন্তু আজ আপনার কথাবার্ত্তায় বড়ই প্রীত হইয়াছি। আপনি আমা চেয়ে বয়সে এবং সম্পর্কে ছোট বটেন, কিন্তু আমা অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞ বলিয়া মনে হয়। ইতিপূর্ব্বে আপনার সত্যপ্রিয়তা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা অনেক ভদ্র-ভদ্রলোকের মুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু অদ্য আমি স্বয়ং স্বচক্ষে আপনার সততা, সাধুতা ও ধর্ম্মতৎপরতা দেখিয়া বড়ই মোহিত হইয়াছি।"

যিনি যেমন কেন লোক হউন না,—তোমামোদের হাত হইতে এড়ানো বড় কঠিন কাজ। মামা সেকেলে মোক্তার—এবং স্বল্পার্থ-উপার্জ্জনক্ষম; আর ঠাকুরদাদা প্রবীণ সেরেস্তাদার, এবং বহু

অর্থরোজগারী। সুতরাং বয়সে, সম্পর্কে, অর্থে, সম্মানে, প্রভুত্বে ঠাকুরদাদা বড়, মামা ছোট। এরূপ স্থলে ঠাকুরদাদার কথায় মামা যে সহজে গলিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বিশেষ সুবিধামত, সুকৌশলে, ধীরগম্ভীরে, নরমে গরমে তোষামোদ-সুধা যদি কাহারও কাণে ঢালিতে পারা যায়, তবে তিনি যেমন কেন হোঁমরা-চোমরা বড়লোক হউন না, তাঁহাকে নিশ্চয়ই নিপতিত হইতে হইবে। মামা'ত কোন্ ছার!—কোন্ কীটাণুকীট!

ঠাকুরদাদার সেই প্রশংসা-খাঁড়ার কোপটা একেবারে অধিক-মাত্রায় বসিয়া যাওয়ায়, মামা কিছু কাতর হইলেন। ঠাকুরদাদা এ সব বিষয়ে ওস্তাদ,—রোগ বুঝিলেন। তখন তিনি কিছু নরম ভাঁজে, খাদে আরম্ভ করিলেন, "দেখুন, আমি মনে মনে একটী মানস করিয়াছি। এ পর্য্যন্ত সে-কথা কাহাকেও বলি নাই। কিন্তু আপনাকে না বলিলে আর চলে না। কারণ, আপনি সহায় না হইলে, আমার সে কাজ উদ্ধার হইবে না। তা,—"

মামা। বলুন, বলুন—আমার সাধ্য থাকে, নিশ্চয়ই আমার দ্বারা হবে। আপনি, মহাশয়-ব্যক্তি, পূজনীয় লোক,—আমার বাটীতে আজ আপনি পায়ের ধূলা দিয়েছেন, তা, প্রাণপর্য্যন্ত পণ ক'রে আপনার কার্য্যোদ্ধারে চেষ্টা করিব;—সে কথা বলাই বাহুল্য।

ঠাকুরদাদা। দেখুন, আমার বয়স হয়েচে,—দেহও ক্রমে দুর্ব্বল হইয়া আসিতেছে,—তিনকাল গিয়ে এই এককালে ঠেকেচে,—আমরা আর ক-দিন বাঁচবো? চাকুরী-বাকুরী আর ভাল-লাগে না; ছেলেপিলের সদাই কিচি-কিচি ঝিকি-ঝিকি আর

সহিতে পারি না;—আজ এর অসুখ, কাল ওর মাথা-ধরা, পরশু তার গা-জ্বালা, বুড়া-বয়সে এ-সব আর কত শুনিব বলুন? আপনি আমার সন্তানতুল্য, আপনাকে বলি,—আমি সংসারের দায়ে, হাড়ে-নাড়ে জ্বালাতন হয়েচি,—চারিদিকে যেন সহস্র বিছায় দংশন করিতেছে! একদণ্ড যে, ঠাকুর-দেবতার নাম করি, এমন অবকাশটুকু নাই। এই দেখুন না কেন,—কালাচাঁদকে আমি প্রাণের চেয়ে ভালবাসি;—ওর বাপ-ঠাকুরদাদা নাই, আমার নিজের ছেলে-নাতীর অপেক্ষা ওকে বেশী ভালবাসা উচিত। কিন্তু এমনি অদৃষ্ট, এমনি বিধির বিড়ম্বনা,—বাছার আমার, মাসে মাসে খবরটী লইতে পারি না। তা আপনার কাছে কালাচাঁদ আছে ব'লেই, আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিয়াছি। আপনি পরম ধার্ম্মিক লোক। সে যা'হউক, এখন বুঝেছি, সংসারে সুখ নাই! আমার যেন সংসার, ছাড়লে-বাঁচি, ছাড়লে-বাঁচি হয়েচে।

মামা মোহিত। পূর্ণ-মাত্রায় ঔষধের গুণ ধরিয়াছে। মামা ঘাড় দুলাইয়া বলিলেন, "আপনি যা বলিতেছেন, সবই সত্য!—"

ঠাকুরদাদা, মামার নিকট আরও একটু সরিয়া গেলেন। ক্রমে অঙ্গে অঙ্গে ঠেকাঠেকি হইবার উপক্রম হইল। তখন ঠাকুরদাদা, মামার কাণের নিকট মুখ লইয়া গিয়া, খুব আস্তে আস্তে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন, "দেখুন, এ-কথা পূর্ব্বে কাহাকেও বলি নাই, আজ আপনাকে বলি,—এখন গোপনে রাখিবেন।—আমি ৺শ্রীবৃন্দাবন-বাসের মনন করিয়াছি। বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই ৺লক্ষ্মীনারায়ণ জিউর সেবার জন্য উইল করিয়া যাইতেছি।—ছেলে-পিলের জন্য মাসিক মাসহারার বন্দোবস্ত করিয়াছি; যে যেমন উপযুক্ত, তার জন্য সেইরূপ হিসাবে কিছু কিছু বিষয়ও দিয়াছি। কিন্তু দেবতার

সেবায় অবশিষ্ট যথাসর্ব্বস্বই অর্পণ করিয়াছি। এ সংসারে সবই মিথ্যা, কেবল এক লক্ষ্মীনারায়ণই সত্য! তাঁদের সেবা উত্তমরূপে চালাইবার জন্ত কোন্ ব্যক্তি না সর্ব্বস্ব প্রদান করিবে? আহা! সে যাহা হউক কিন্তু এ অতুল বিষয় রক্ষা করিবার উপযুক্ত লোক আমি দেখিতে পাই না। তবে আপনি যদি এ সময় আমার একটু উপকার করেন, তাহা হইলে, আমার শ্রীবৃন্দাবনবাসটী হয়।”

মামা। আমাকে যা করিতে বলেন, সাধ্য থাকিলে, আমি তাহাই করিব।

ঠাকুরদাদা। এই আমার সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধানের ভার আপনাকে লইতে হইবে। আপনার মত দূরদর্শী লোক, এ গ্রাম জেলায় কয়জন আছে? আপনি কষ্ট স্বীকার করিয়া এই ভার গ্রহণ না করিলে, আমার আর উপায় নাই। আপনি আমার ৺শ্রীবৃন্দাবন-বাসে আর বাধা দিবেন না।

মামা। আমি ক্ষুদ্র মনুষ্য। আমার উপর এত গুরুতর ভার দিবেন কেমন করিয়া? আপনার পুত্র এবং জামাতারাও বেশ উপযুক্ত হয়েছেন—একজন জামাই উকিল হয়েছেন নয়?

ঠাকুরদাদা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) শিব যদি উপযুক্ত হবে, তা'হলে আমার ভাবনা কি ছিলো?

ঠাকুরদাদার পুত্রের নাম শিবচন্দ্র।

মামা জিজ্ঞাসলেন, “কেন? কেন? তিনি বড় অমায়িক লোক শুনেচি—”

ঠাকুরদাদা। সে,—যে শিব, সেই শিব!—সদাশিব—ভোলানাথ। কিছুই জানে না,—বিষয় কর্ম্ম কিছুই বুঝেন

তার দ্বারা কি কখন বিষয় রক্ষা হয়?—আর, কি জানেন, কলিকালে,

জন জামাই ভাগ্‌না।
তিন নয় আপনা॥

তা, জামাইদিগে বিষয় রক্ষার ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি কৈ?—টাকা অতি খারাপ জিনিস! এক ভরসা, সুরেশের উপর। সে খুব চালাক চতুর হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে। তবে সুরেশ এখন বালক। সুরেশ একটু বড় হইলে, আপনার পরিশ্রমের অনেক লাঘব হইতে পারে। তাই ঠিক করেছি,—দেবসেবার জন্য একজন উপযুক্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত ক'রে বিষয়ের আয় থেকে ছেলে-পিলেকে কিছু কিছু মাসহারা ভাগ করিয়া দিব।

মামা ক্রমশ গলিয়া দ্রব হইলেন। তাঁহার বাক্‌শক্তি পর্য্যন্ত যেন লোপ পাইল।

ঠাকুরদাদা আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন, "আপনার অবকাশ কম বটে, কিন্তু আমার খাতিরে এ-কাজটা করিতেই হইবে। তা, আমি এমন বন্দোবস্ত করিয়া দিব, যে তাহাতে মোক্তারীর বিশেষ কোন ব্যাঘাত পড়িবে না; এই বর্দ্ধমানে বসিয়াই কাজ চলিতে পারে। তবে মাসের মধ্যে আমার বাটীতে গিয়া দু'চারি দিন থাকিলেই হইবে।—আপনার পরিশ্রম এবং দক্ষতার উপযুক্ত, আমি টাকা দিতে পারিব, সেরূপ আমার সঙ্গতি নাই; মাসিক একশত টাকার অধিক দিতে পারিব না। আপনাকে আমি যোড় হাতে বলিতেছি, আমার এই উপরোধটি আপনি রক্ষা করুন।"

মামা বহুকাল ধরিয়া মোক্তারি করিতেছেন, জমিদারী বিষয়-

সংক্রান্ত কাজ কখনও করেন নাই, তথাচ কেমন তাঁহার মন হইল তিনি এ-কাজে সক্ষম হইবেন। নিজের বল, বুদ্ধি অভিজ্ঞতা কেহই কম দেখে না।

মামা আমৃতা-অ মৃতা করিতে লাগিলেন—"এঁ—আমি আপনার অগাধ-সম্পত্তির পর্য্যবেক্ষণে সমর্থ হইব কি?"

ঠাকুরদাদা। কার্য্যনির্ব্বাহ করিতে অনেকেই সক্ষম,—আপনি ত নিশ্চয় সক্ষম হইবেনই। কিন্তু আপনার মত বিশ্বাসী, ধার্ম্মিক লোক আমি পাইব না। (পকেট হইতে কাগজ বাহির করিয়া) এই দেখুন, উইলের সবই লেখাপড়া হইয়াছে, কেবল অনুমতি করিলেই, আপনার নাম বসাইয়া, কল্য ষ্ট্যাম্পে তুলিয়া রেজেষ্টরী করিয়া পাকা করি।

মামা। আচ্ছা, তবে রেজেষ্টরীর পর তিন চারি মাস আপনি এখানে থাকিয়া যদি বিষয়-কার্য্য কতক কতক বুঝাইয়া দেন, তাহা হইলে কার্য্য চালাইতে পারিব বলিয়া বিশ্বাস হইতেছে। তা, আমার জানত আপনার পাই-পয়সা লোকসান হইতে দিব না। আপনার একটী পয়সা আমার পক্ষে গো-রক্ত, ব্রহ্ম-রক্ত বলিয়া জানিবেন।

ঠাকুরদাদা। (হাসিয়া) তা, নহিলে কি এত লোক থাকিতে আপনাকে আসিয়া এ কাজের জন্য ধরি?—

মামা, খসড়া-উইলনামা লইয়া নাড়িতে চাড়িতে লাগিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে, তিনি উইলটা খুলিয়া পড়েন। কিন্তু ঠাকুরদাদার অনুমতি ব্যতীত, সে কাজে সাহসী হইলেন না। বিচক্ষণ-বুদ্ধি ঠাকুরদাদা, ব্যাপার বুঝিয়া বলিলেন, "আপনিও ত আইন কানুন বেশ ভাল বুঝেন, আজ ২৫ বৎসর আদালতে

কাজ করিতেছেন—একবার উইলটা পড়িয়া দেখুন না—যদি কোন দোষ থাকে ?”

মামা কৃতার্থ হইয়া, একাগ্রমনে উইল পড়িতে লাগিলেন। উইলের শেষভাগে এই মর্ম্মে লিখিত আছে, “কালাচাঁদ আমার বড় স্নেহের পাত্র। সে মাতৃপিতৃহীন। তাহাকে আমি বার্ষিক তিনশত টাকা মুনফার কিসমৎ মহেশপুর নামক আয়মাটী দান করিলাম। নিম্ন-তপশীলে ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য। আর তাহাকে কুড়িবিঘা লাখেরাজ-জমী, একটী পুষ্করিণী, বসত-বাটী নির্ম্মাণের জন্য নগদ ৫০০৲ টাকা ও আড়াই বিঘা জমী দান করিলাম। নিম্নে বিবরণ দ্রষ্টব্য। ইহা ব্যতীত কালাচাঁদ মাসিক কোম্পানী এগার টাকা মাসহারা পাইবে। কালাচাঁদ সাবালক হইলে, এই বিষয় স্বয়ং ভোগদখল করিবে। তখন আর মাসহারা পাইবে না।”

মামা চমকিলেন। ঠাকুরদাদাকে যথার্থ সাধুপুরুষ জ্ঞান করিলেন। কালাচাঁদের কপালে ভবিষ্যতে এত সুখভোগ আছে, তাহা তিনি ভাবেন নাই। মামা বলিলেন, “এ উইল অতি সুন্দর হইয়াছে; এতদনুসারে কাজ করিলে, সন্তান-সন্ততির মধ্যে বিবাদের আশঙ্কা কিছুই থাকিবে না। বেশ সুখস্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ হইবে। ৺লক্ষ্মীনারায়ণের কীর্ত্তিকলাপও বজায় থাকিবে। আর, কালাচাঁদের উপর আপনার স্নেহ মমতা দেখিয়া আমার মন বড় পুলকিত হইয়াছে—”

ঠাকুরদাদা। (হাসিয়া) কালাচাঁদ কি আমার পর ?

এইবার ঠাকুরদাদা তাকিয়া ঠেশ দিয়া চক্ষু মুদিয়া, তামাক খাইতে লাগিলেন। রাত্রি প্রায় সাতটা বাজিল। তখন তিনি হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া মামার হাতে হাত দিয়া বলিলেন,—“দেখুন,

এখনও একটা বিবাদের বীজ আছে। সে বীজের আর অঙ্কুর যাহাতে না হইতে পায়, এখন হইতেই তাহার উপায় বিধান করা কর্ত্তব্য। এখন ঘোর কলি উপস্থিত। ছেলেপিলের সব, মেজাজ গরম।—কথায় কথায় পরস্পরে ঝগড়া বাধায়। আমার দাদার ভদ্রাসন বাটী ছিল, তাহা এখন আর নাই; সেখানে এমন জঙ্গল হয়েছে যে, বাঘ লুকিয়ে থাকৃতে পারে। আমার পৌত্রটী এই বালক বয়সেই বড় গোঁয়ার,—সে বলে, আমাদের চকমিলন দালানের পাশে জঙ্গল রাখা হবে না। জঙ্গলে সাপের ভয়ও হইয়াছে। তার ইচ্ছা যে, জঙ্গল কাটিয়ে ঐখানে সে বাড়ী তৈয়ারি করে। আমি বলিলাম,—"না, সে কাজ এখন হবে না, কালাচাঁদের মামাকে এ-কথা একবার জিজ্ঞাসা না ক'রে আমি তোমাকে জঙ্গল-কাটা বা বাড়ী তৈয়ারির বিষয়ে উত্তর দিতে পারি না।"

মামা। তা, স্বচ্ছন্দে আপনি সে স্থানের জঙ্গল কাটুন, বাড়ী তৈয়ারি করুন,—তাহাতে আমার কিছুই আপত্তি নাই। আপনার উপরই কালাচাঁদের ভার। আপনি যা করবেন, তাই হবে।

ঠাকুরদাদা। (চমকিয়া) আঃ, আপনি বলেন কি? কালাচাঁদের বিষয়টা কি আমি অমনি লইব? তা হ'লেত রাতও মিথ্যা, দিনও মিথ্যা। চন্দ্র-সূর্য্য জানেন, আমি কালাচাঁদকে কত ভালবাসি। মন্দ মতলব থাকলে ত এতদিন সে ভিটা জোরেই দখল করিতাম;—সেখানে আমার ভোগ-দখলে হস্তা হয়, এমন সাধ্য কার?—তা, নয়, ভবিষ্যতে ছেলের-ছেলের ঝগড়া-ঝাঁটি না হয়,—এমন বন্দোবস্তটী ক'রে মরতে পেলেই আমার সুখ।—সে ভিটাটার ত দাম বড়?—দশ টাকা দিয়াও কেহ লইবে না। কিন্তু ঐ সামান্য স্থানটুকুই কোন্দলের বীজ হইতে পারে,—তাই আমার

এখন থেকে ভাবনা। কারণ, আজ-কালের সব ছেলে-পিলে বড়ই গোঁয়ার!

মামা। আপনি থেকে যা ক'রে দেবেন, তা'তে কি আমার কখন অমত হ'তে পারে?

ঠাকুরদাদা। দেখুন, সেই ভিটাটা এবং একটা বাগান ও পুকু'রর অর্দ্ধাংশের জন্য অ[illegible]নর হাতে আমি নগদ সাতশত টাকা দিব। সে টাকাটা আপনি কালাচাঁদের জন্য তুলিয়া রাখিয়া দিবেন, সুদে খাটাইয়া কালাচাঁদের টাকা বৃদ্ধি করিয়া দিবেন।

মামার আনন্দের অবধি রহিল না। মুখে পুনরায় তিনি সেই কথাই উচ্চারণ করিলেন, "আপনি যা করবেন, তাতে কি আমার অমত আছে?"

ঠাকুরদাদা। তা'হ'লে কাল দুটা কাজই শেষ করা যাবে; একবারে ভিটা এবং উইল, দুইটাই রেজেষ্টরি হবে।

মামা। আমি একট কথা ভাবিতেছি, কালাচাঁদ ত নাবালক,—সে, ভিটা বিক্রয় বা রেজষ্টরি করিবে কেমন করিয়া?

ঠাকুরদাদা। হাঃ হাঃ হাঃ—তার উপায় আমি করিয়া দিব। আমি আদালতে দেওয়ানী কাজ করিয়া মাথার চুল পাকাইলাম,—সে উপায় কি আর জানি না?—আপনিও ত মোক্তারী করেন। কালাচাঁদের লেখাপড়ায় ব্যয়,—ভরণ পোষণের ব্যয়, চিকিৎসাদির ব্যয়,—বহন করিবে কে? কায়স্থসন্তানকে ত মূর্খ করিয়া রাখা চলে না। কাজেই ভিটা-আদি বিক্রয় বা বন্ধক দিয়া, কালাচাঁদকে মানুষ করিবার জন্য ইত্যাদি;—বু'ঝলেন কি?

মামা। হ্যাঁ তা এক রকম হ'তে পারে বটে।

ঠাকুরদাদা। এক রকম কেন? বেশ ভাল রকমই হয়?—

ঠাকুরদাদা এবং মামা।



মামা। হাঁ,—তা, হয় বটে। আপনি যা করবেন, তাতে আমার আর আপত্তি কি? কালাচাঁদ ত আপনারই।

ঠাকুরদাদা তখন সাড়ে তিনশত হিসাবে সাতশত টাকার দুইটী তোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই দুইটী আপনি রাখিয়া দিন। কল্য প্রাতে লেখাপড়া হইবে।। টাকাটা রাত্রে আপনার কাছেই থাকা ভাল।"

মামা তোড়া দুইটী সম্মুখে রাখিলেন। ঠাকুরদাদা বলিলেন,—টাকা গণিয়া লউন।

মামা। সে কি কথা?—আপনার নিকট হইতে টাকা লই-তেছি, তাহা আর গণিয়া লইব কি?

ঠাকুরদাদা। সে কথা নয়!—আমারই যদি গণিতে ভুল হইয়া থাকে। তাই বল্‌ছি,—আর একবার গণিয়া দেখা ভাল।

এই বলিয়া, ঠাকুরদাদা স্বয়ং একটা তোড়ার মুখ খুলিয়া টাকা ঢালিয়া ফেলিলেন। খন্‌-খন্‌ ঝন্‌-ঝন্‌ ঠন্‌-ঠন্‌ শব্দে সে স্থান পূর্ণ হইল। অগত্যা মামা আর একটা তোড়ার মুখ খুলিতেছিলেন। ঠাকুরদাদা, তাঁহার হাত হইতে সে তোড়াটা লইয়া, আরও জোরে পূর্ব্ব-নিক্ষিপ্ত টাকার উপর, এ টাকাও ঢালিতে লাগিলেন। এবার পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ অধিক শব্দ হইল।

শব্দ শুনিয়া করুণাময়ী দৌড়িয়া আসিয়া অন্দর হইতেই জানে-লার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিতে লাগিলেন। ঠাকুরদাদার চক্ষু তখন সেই সদর-মুখ অন্দরের জানেলার দিকেই ছিল। করুণাময়ীর সহিত চক্ষে চক্ষে চাওয়া-চায়ি হওয়ায়, ঠাকুরদাদা চক্ষু নামাইয়া লইলেন। মনে মনে বলিলেন,—"আর ভাবনা নাই,—চারে বড়-মাছ আসিয়াছে। গাঁথিতে কতক্ষণ!"

তখন ঠাকুরদাদা, কণ্ঠের স্বর ঈষৎ উচ্চ করিলেন,—যেন করুণাময়ীকেই উদ্দেশ করিয়া বলিলেন,—"কালাচাঁদ অতি সুবোধ-বালক। অমন নধর গড়ন আমি কারো দেখি নাই। মুখের চেহারা ঠিক যেন রাজপুত্রের মত। মিষ্টি মিষ্টি কথাগুলি যেন মধুমাখা। কালাচাঁদ সুমুখ দিয়ে চলে যায় মনে হয় যেন ইন্দির-চন্দর চলে যাচ্ছে! আহা! এখন বেঁচে থাকুক্,—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এক-শ বছরের হয়ে বেঁচে থাকুক্! আপনি যেমন ওকে কষ্ট ক'রে মানুষ করেছেন, ও তেমনি আপনাকে এরপর বড় হ'য়ে ভক্তিমান্ত ক'র্‌বে। তা, ঠিক মা-বাপের মতনই আপনাদিগে দেখবে! কালাচাঁদ তেমন ছেলে নয়,—প্রকৃতি অতি ধীর। আহা! ও আমার সাত-রাজার ধন একটি মাণিক! বেঁচে থাকুক,—বেঁচে থাকুক্। বাঁচাই মূলাধার।"

ঠাকুরদাদা, সুর একটু নরম করিয়া আমাকে বলিলেন, "টাকাগুলি গণিয়া, দশটাকা করিয়া থাক্ দিন্। উঃ—এক রাশ টাকা!! বেনেসোণায় যা বিষয় আছে, তা, অমনি দিলে কেউ নেয় না,—সে স্থান একবারে বন, জঙ্গল, শেয়াল, কুকুর, সাপ, বিছা, মশা, উই, পিঁপুড়াতে পরিপূর্ণ। তবে কি জানেন, কালাচাঁদ আমার বড় স্নেহের সামগ্রী,—ওর জন্ত অন্তরটা সদাই কাঁদে,—তাই বলি, এই সাত-শ-টাক ওর থাকুক্,—আপনি ও' নামে ঐ টাকা চোটা-সুদে খাটা'তে পারেন, অথবা একটা ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে পারেন,—তখন যদি আরও বিশ পঞ্চাশ টাকা নগদ দরকার হয়,—আমার নিকট হইতে চাহিলেই আমি তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিব।"

মামা ক্রমশ টাকা গণিয়া সমস্তটা থাক্ দিলেন—একটী টাকা

বেশী হইল। মামা বলিলেন, "সাত-শ এক টাকা হইয়াছে, আপনি এই এক টাকা ফেরত দউন।"

ঠাকুরদাদা। (জিহ্বা কাটিয়া) বলেন কি,—বলেন কি?—আমি কি, তা ফেরত লইতে পারি! কালাচাঁদ আমার হৃদয়ের ধন,—আমি কি ওকে ঠিক ৭০০৲ টাকা,—শেষে দুইটী "শূন্য" দিতে পারি!! ৭০১৲ টাকাই উহার প্রাপ্য।

এইরূপ কথা-বার্ত্তা সাঙ্গ হইলে, ঠাকুরদাদা রাত্রি নয়টার সময় উত্তমরূপে আহারাদি করিয়া বৈঠকখানায় সুখে নিদ্রা গেলেন। মামাও তোড়া দুইটি লইয়া হৃষ্টচিত্তে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। টাকার তোড়া দেখিয়া করুণাময়ী রুক্ষ-স্বরে জিজ্ঞাসিলেন, "টাকা কিসের?" মামা, যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিলেন। করুণাময়ী বলিলেন,—"তা, কখনই হবে না, সাত-শ কেন সাত হাজার টাকা দিলেও ঘর-ভিটা বেচা হইতে পারে না। তোমাকে এ বুদ্ধি কে দিল? বুড়ো এসে বুঝি মিষ্টি কথা কয়ে ভুলিয়েছে! বাছা কালাচাঁদের টাকার ভাবনা কি?—ঘর-ভিটে কি বেচতে আছে? যারা নিতান্ত কাঙ্গাল-গরীব, ভিক্ষে করে খায়, তারাও ভিটে বেচে না! বাপুরে! আমি ভিটে বেচতে দিব না,—ভিটে বেচলে যে বাছার অকল্যাণ হবে!!"

করুণাময়ী এবং মামা উভয়ে প্রায় সমস্ত রাত্রি এই বিষয় লইয়া বিষম বাদানুবাদ করিলেন। কাহারও নিদ্রা হইল না। করুণা বুক চাপড়াইলেন, কপালে করাঘাত করিলেন, নয়ন-জলে বক্ষ ভাসাইলেন;—শেষে করুণা কাঁদিতে কাঁদিতে রাগ করিয়া বলিলেন, "তুমি যদি ৭০০৲ টাকা নিয়ে বাছার-আমার ভিটাটুকু বিক্রয় কর, তা হ'লে আমি গলায় দড়ী দিয়া মরিব।"

মামা যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। প্রাতে তিনি ঠাকুরদাদাকে সাত-শত টাকার তোড়া দুটী ফেরত দিয়া বলিলেন, "এ বিষয় একবার বাটীতে আমার জ্যেষ্ঠকে সংবাদ দিয়া সমাধা করিব। এখন আপনি টাকা ফেরত লউন। আমার কিছুই অমত নাই। তবে কি জানেন, এসব কাজ দাদার সঙ্গে পরামর্শ করিয়াই করা ভাল। শেষে না দোষ পেতে হয়।"

ঠাকুরদাদা এ-কথা শুনিয়া যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন! তথাচ অচলভাবে থাকিয়া, সহজ কথায়, উত্তর দিলেন, "তা হোক, তাতে আমার আপত্তি নাই। কালাচাঁদ দীর্ঘজীবী হইলেই আমার সুখ। পাঁচজনকে জিজ্ঞাসা ক'রে যাতে ভাল হয়, তাহাই করুন।"

মামা। তবে উইল রেজষ্টরি আজ হবে ত?

ঠাকুরদাদা। তা হবে বৈকি! আহারাদির পর দুজনে একত্র কাছারী যেয়ে এখনি রেজষ্টরী ক'রে আসিব। প্রথম প্রথম খুব সাবধানে কাজকর্ম্ম করিবেন। আপনিই আমার ৺ শ্রীবৃন্দাবন-বাসের ভরসা।

ঠাকুরদাদার সঙ্গে মামার বাসায় একজন মাত্র খানসামা আসিয়াছিল। এইরূপ কথা-বার্ত্তার এক ঘণ্টা পরে একজন দ্বারবান্ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া ঠাকুরদাদাকে এই ভাবে সংবাদ দিল,—"আমি বাটী হইতে এইমাত্র ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছি,—আপনার পৌত্র সুরেশের বড় ব্যারাম,—আপনাকে এখনি যাইতে হইবে।"

তিনি অমনি বিব্রত হইয়া,—"হায়!—হায়—হায়!"—করিতে করিতে পাল্কি-যানে চলিয়া গেলেন। যাত্রাকালে তাঁহার কেবল

এই ভাবনা হইল,—বিষ ও উত্তম ধরিয়াছিল,—ঝাড়াইয়া আরাম করিল কে ?

ইহাই হইল,—কালাচাঁদের সহিত ঠাকুরদাদার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ।

এ ঘটনার কয়েক বৎসর পরে মামার এবং করুণাময়ীর মৃত্যু, ঘটে, কালাচাঁদের কারাবাস হয় ;—তাহা পাঠক অবগত আছেন।

তৃতীয় সাক্ষাৎ। কারামুক্তির পরই কালাচাঁদ বন্ধু পতিত-পাবনের সহিত স্বয়ং গিয়া ঠাকুরদাদার সহিত সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু এবার আদর অভ্যর্থনা দূরে যাউক, বরং উপহসিত হইলেন। মুখে আদর দেখাইলেও, বুড়া ইঙ্গিতে তাঁহাকে দুই একটা যে ব্যঙ্গ করেন, বিচক্ষণবুদ্ধি কালাচাঁদ তাহা বুঝিতে পারিলেন। ব'স কিম্বা থাক, খাও কিম্বা পর—এসব সম্ভাষণ তিনি কিছুই করিলেন না। বিশেষ, ঠাকুরদাদার বাসার লোকে, কালাচাঁদকে "মাষ্টার" "মাষ্টার" বলিয়া যৎপরোনাস্তি বিব্রত করিয়া তুলে। কালাচাঁদ বড়ই বিরক্ত হইয়া, ভগ্নমনে, শূন্য-হৃদয়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

তৃতীয় সাক্ষাতের পাঁচ মাস পরে, অদ্য চতুর্থ সাক্ষাতের দিন। কালাচাঁদ মহাস্ফূর্ত্তির সহিত ভাবে গদগদ হইয়া ঠাকুরদাদা মহাশয়কে আবার ডাকিলেন,—"দাদা মোশাই! অ.—দাদা মোশাই! বাড়ীতে আছেন কি ?—"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠাকুরদাদা প্রাতঃ স্নান করেন। যতই বেলা হউক, প্রাতঃস্নানের নিয়ম লঙ্ঘন হইবার যো ছিল না। সকালে উঠিয়া দুইটা ছোক্‌রা চাকর তাঁহাকে তেল মাখাইতে বসিত। তৈল-মর্দ্দন-কালে তিনি একখানি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কাপড় পরিয়া,—কখন বাঁকা, কখন সোজা, কখন কাত, কখন উবুড় হইয়া,—খণ্ডেক জীর্ণ মস্‌লন্দ-মাদুরোপরি উপবেশন করিয়া, অভ্যাগত লোকমণ্ডলীর সহিত খোষ-গল্প করিতেন। এইরূপে প্রায় একঘণ্টায় অধিক সময় অতিবাহিত হইত।

বৈঠকখানা-ঘরের দাওয়ায় এইরূপ তেলমাখা কাণ্ড চলিত; "হলে" নানা-লোকের মজলিস বসিত।

সেকেলে সেরাস্তাদার বা দাওয়ানজীর অতুল পসার-প্রতিপত্তি ছিল। কাজেই বহুব্যক্তি অনুগ্রহভিখারী হইয়া ঠাকুরদাদার সহিত দেখা করিতে আসিত। তিনি কাহাকেও অনুগ্রহ-সুধা বিতরণ করুন বা, না করুন, লোকে মোদ্দা আসিতে ছাড়িত না। বিষম গুলোপ-দেওয়া মধুর হাঁড়াতেও পিঁপড়া ধরে। আশা মায়াবিনী।

প্রাতঃস্নান করিয়া, গা-মুছিয়া কাপড় পরিতে প্রায় তাঁহার সাড়ে-আটটা বাজিত। তৎপরে সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ, নাকে তিলক প্রভৃতি অঙ্কিত হইত। পূজা-আহ্নিক শেষ না হইতে-হইতে সাড়ে-নয়টা বাজিত। তার পর, তিনি কিছুক্ষণ কাছারীর কাগজপত্র দেখিতে বসিতেন। বেলা ১১টা হইলে আহার।

আহারান্তে নিদ্রা। এমনি সু-বন্দোবস্ত ছিল—বারটা বাজিলেই ঘুম ভাঙ্গিত; তৎক্ষণাৎ অমনি তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া পাল্কী যানে কাছারী যাইতেন।

যাক্ ও-কথা। কালাচাঁদ যখন প্রাতে দ্বারে দাঁড়াইয়া ডাকিতে লাগিলেন, "দাদা মোশাই! অ—দাদা-মোশাই!" তখন ঠাকুরদাদা ওরফে হরিতারণ, রামঠাকুরের সহিত খোষগল্পে একাগ্রচিত্তে নিযুক্ত ছিলেন। রামঠাকুরের নাম রামধন চট্টোপাধ্যায়; পাড়ার পুরোহিত; অর্দ্ধ-প্রবীণ; এবং ঠাকুর দাদার বন্ধু। এ ছাড়া, তাঁহার গুরুগিরি ব্যবসাটাও আছে। পাড়ার সর্ব্ব রকম পূজা-কার্য্যই তাঁহার একচেটিয়া; সে অঞ্চলে অন্য ব্রাহ্মণের লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। হুগলী অঞ্চলে বড় বড় শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত হিসাবে তাঁহার সর্ব্বাগ্রে নিমন্ত্রণপত্র আসিত। হরিতারণের বিশেষ অনুগত বলিয়াই, তিনি এতটা বাড়িয়াছিলেন।

রামঠাকুর, হরিতারণের এত ভালবাসার সামগ্রী কেন? এ-কি অকৃত্রিম প্রণয়, নিঃস্বার্থ প্রেম,—না নিষ্কাম ধর্ম্ম? কি, তাহা কেমন করিয়া বলিব? তবে এইমাত্র জানি, রামঠাকুরের সহিত,—ঠাকুরদাদার সময়ে সময়ে কাণাকাণি কথা হইত,—ইঙ্গিত, ঈসারায় কথা চলিত।

রামঠাকুরের অন্যান্য সদ্‌গুণ যত অধিক মাত্রায় থাকুক্ না কেন, সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া তাঁহার লোকপ্রসিদ্ধি ছিল। সংসারে সম্ভবত এমন কোন বিষয় নাই, যাহার সংবাদ তিনি রাখেন না। ইস্তক রাজনৈতিক-গগনের ঘনঘটা, নাগাইদ্ সমাজ নৈতিক অন্দরের আলোক-ছটা,—এতৎসমস্তই তাঁহার চক্ষুর গোচরীভূত ছিল।

ভিতর-বাহির, সদর-মফস্বল, তেমাথা-চৌমাথা, গলি-ঘুঁজি,—সমস্তই তাঁহার নখদর্পণে। যিনি যে কথা তুলুন না কেন, তিনি নিশ্চয়ই তাহাতে "হাঁ—না" একটা সায় দিবেন। ৺জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কথা পাড়, তিনি বলিবেন, "তর্কপঞ্চানন একজন অবতার-বিশেষ ব্যক্তি; ইংরেজী না প'ড়ে, ইংরেজীতে তিনি বক্তৃতা ক'রেছিলেন। সেই গঙ্গার বাঁধাঘাটে ব'সে, চক্ষু বুজিয়া আহ্নিক করিতে করিতে, আহা!—দুইটা গোরার ইংরেজীগালাগালি কেমন তিনি শুনে মুখস্থ করেছিলেন। তর্কপঞ্চাননের দক্ষিণ উরুতে একটী তিল ছিল।"—রামঠাকুরের কথা অনর্গল এই ভাবেই চলিতে থাকিবে। কেহ যদি জিজ্ঞাসেন,—"রামঠাকুর! কপিলা গাই দেখিয়াছ?" তিনি উত্তর দেন—"আমি আর কপিলা-গাই দেখি নাই? আমার বৃদ্ধপ্রপিতামহের এ জোড়া কপিলা ছিল। রাত্রে পাছে মশা খায় বলিয়া তিনি তাদের জন্ত দুটা রেশমের মশারি তয়েরি ক'রে দিয়েছিলেন। দুধ যেন মিছরির তার! জয়পুরের রাজা সে দুইটা কপিলা-গরুর দাম দশহাজার টাকা দিতে চাহিলেও, তিনি তাহাতে বেচিতে স্বীকার হন নাই। সেই গাই দুটী যেন সাক্ষাৎ ভগবতী; বাড়ীতে এক শত কুটুম্ব আসিয়াছে; বুড়া-ঠাকুরদাদা গলায় কাপড় দিয়া যোড়হাতে কপিলার কাছে গিয়া বলিলেন, 'মাগো, লজ্জা নিবারণ কর, আজ শতলোক অতিথি।' কপিলা দুটী হড়্‌হড়্‌ করে অমনি দু' হাঁড়া দুধ ঢেলে ফেলিল। তখন দুধ, দিয়ে ফুরাতে পারি না।"

ডুমুর-ফুল, দিনে তারা, সাপের পা—রামঠাকুর এ সমস্তই দেখিয়া থাকেন। অধিক কি, তিনি আমগাছে কাঁঠাল, নারিকেল গাছে লিচু, এবং কলাগাছে ওল ফলিতেও দেখেন। অসাধারণ

গুণ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার দৃষ্টি অধিক—রমণীকুলের উপর। কোন্ রমণী কখন্ কি দিয়ে ভাত খায়, কখন, কি রকম কাপড় পরে, কার কত ভরির ক-খানি গহনা আছে,—এ সমস্তই তিনি জানেন। কোন রমণী দাঁতে মিশি মাগে, অপরে আলতা দেয়, হাতে টলকি পরে—এ সমস্ত তাঁহার কণ্ঠাগ্রে। কোন্ রমণীর নাকটী, মুখটী, চোকটী কেমন,—দাঁতটী, হাতটী, ঠোঁটটী কেমন,—নামটী, ধামটী, শ্যামটী কেমন,—চুলটি, ফুলটি, দুলটি কেমন,—এ সমস্তই তাঁহার নখ-দর্পণে। কোন্ রমণীর চলন, দোলন, হেলন কেমন,—হাস, ভাষ, খাস, কেমন,—তান, মান, রসান কেমন,—এ সমস্তই তাঁহার হৃদয়পটে অঙ্কিত।

বাস্তবিকই নারীজাতির প্রতি রামঠাকুরের বিশেষ অনুগ্রহ। তিনি পথে চলে যান, আর ফিরে ফিরে চান, পাছে পশ্চাতের রমণী দেখিতে না পান। পথি-পার্শ্বস্থ প্রত্যেক জানেলার প্রতি তিনি নিদারুণ নয়ন-বাণ নিক্ষেপ করেন। জানেলায় যে কিছু পদার্থ থাকে, তাহার সার-সত্ত্ব বাণবিদ্ধ হইয়া, মহাকর্ষণে তাঁহার হৃদয়কন্দরে আসিয়া পড়ে। তৃণ-গাছাটিরও এড়ান্ নাই।

বিশেষ-বিশেষ রমণীর গুণাগুণ-সমালোচনে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পটু ছিলেন। মহিলা-কাব্যের তাঁহাকে মল্লিনাথ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে সমালোচন, সময়ে সময়ে কিছু তীব্র কটুকষায় হইয়া পড়িত। ইহাতে সমালোচকের দোষ কি? বিষয় বুঝিয়া ব্যাখ্যা হইবে ত! অবোধ দুষ্ট লোকে এই সমালোচনকে —ব্যাখ্যা, টীকা, বা ভাষ্যকে—কখন কখন 'কুৎসা' নামে অভিহিত করিত। বলিত, রামঠাকুর লোকের কলঙ্ককাহিনী কীর্ত্তন করিতে বেশ মজবুত।

মজপুত—মজপুতই ;—কিন্তু কুৎসায় দোষ কি ? সংসারের মধ্যে সারসামগ্রী—কুৎসা। একাজে বক্তা, শ্রোতা—উভয়পক্ষের মন যেমন প্রফুল্লিত, পুলকিত, কণ্টকিত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। প্রথম বৈশাখে বেলা আড়াই প্রহরে, ঝাঁ-ঝাঁ রোদের সময়, নুন-লঙ্কা-বিমিশ্রিত কাঁচা আম-ছেঁচা যেরূপ মিষ্ট, ইহা সেইরূপ বা তদপেক্ষা অধিক মিষ্ট। অথবা একদিকে পাকা ফজ্‌লী আম, অন্যদিকে কুলকামিনীর কুৎসা—তুমি কোনটী চাও ? আকাশে যেমন পূর্ণচন্দ্র, সরোবরে যেমন প্রফুল্ল-পঙ্কজ, উদ্যানে যেমন নব-মল্লিকা—কথার মধ্যে সেইরূপ কুৎসা। গৃহস্থাশ্রমের অদ্বিতীয় অবলম্বন, মনুষ্যজীবনের একমাত্র ইষ্টমন্ত্র, এমন সর্ব্বজনপ্রিয়, এমন, সর্ব্বজনমোহকর কুৎসাকে ছাড়িয়া কে থাকিতে পারে ?

যাই-হউক, রামঠাকুর নারী-চরিত্র-সমালোচনে সদাই নিযুক্ত থাকিতেন।

যাহাতেই নিযুক্ত থাকুন না কেন,—রামঠাকুরের নাম ছিল গেজেট। গেজেটে যে কেবল রাজনীতি, সমাজনীতি, নারীনীতি, যুবক-যুবতী থাকিত, তাহা নহে; স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতাল ত্রিভুবনের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান—এই ত্রিকালের সংবাদ দৃষ্টিগোচর হইত।

রামঠাকুরের দৈনিক কার্য্য—প্রাতে গঙ্গাস্নান করা। গঙ্গা-স্নানে প্রত্যহই যে সমান সময় নষ্ট—এবং তজ্জনিত প্রত্যহই যে সমান কার্য্যক্ষতি হইত, তাহা নহে। যেদিন গঙ্গার ঘাটে কেহ কোথাও থাকিত না, রামঠাকুর সেদিন "হুপ" করিয়া ডুব দিয়া, মাথা মুছিতে মুছিতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশত, কোনও পর্ব্ব উপলক্ষে যেদিন গঙ্গার-ঘাট লোকপূর্ণ হইত, সেদিন রামঠাকুরের প্রায় একঘণ্টা সময় বৃথা কাটিত।

গঙ্গার ঘাটে রামঠাকুরের আহ্নিক



গঙ্গাগর্ভে বসিয়া নানারূপ প্রক্রিয়া সাধিত হইত; তপ জপ পূজা আহ্নিক কত রকম কি যে করিতেন, তাহা কেমন করিয়া বলিব? —তিনি নীরবে নিস্পন্দে, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা ঘাটে বসিয়া থাকিতেন। মাসের মধ্যে দশদিন এইরূপ দৈববিড়ম্বনা ঘটিয়া সময় নষ্ট হইতে থাকিলে, তিনি শেষে—এত ভোরে স্নানের বন্দোবস্ত করিলেন যে, তখন সাধারণত জীবমাত্রই ঘোর-ঘুমে অভিভূত থাকিত,—গাছ-পালায় রাত্রির শেষচিহ্ন দেখা যাইত। কিন্তু ইহাতেও নিস্তার নাই। এক-আধ দিন এক-আধ জন দুষ্ট লোক তাঁহার অনুসরণ করিয়া, গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থ উপনীত হইত। মাসের মধ্যে অন্তত তিন চারি দিন এরূপ দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটিয়া থাকে।

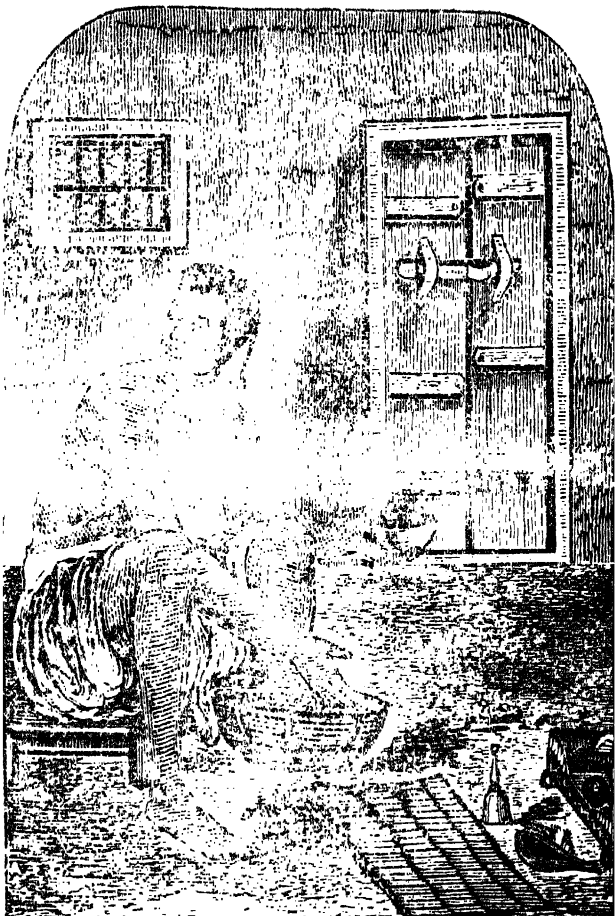
ভদ্রসম্ভ্রান্ত কুলবধূগণও প্রভাতে গঙ্গাস্নান করিয়া থাকেন। ঘাটে যেদিন সুন্দরীকুলের সমাগম কিছু অধিক মাত্রায় হইত, সেদিন রামঠাকুর আর সহজে ঘাট ছাড়িতেন না। তিনি সেদিন অনিমিষলোচনে মহাধ্যানে মহানিযুক্ত হইয়া মহামহিমান্বিত-ভাবে মহাতপ সাধন করিতেন।

স্নানের পর ঘরে গিয়া রামঠাকুর একখানি জীর্ণ পট্টবস্ত্র পরিধান করিতেন। নাকে তিলক কাটিয়া সর্ব্বাঙ্গে নানারূপ ছাপ দিতেন। তৎপরে অর্দ্ধঘণ্টার কিঞ্চিৎ অধিক কাল আপন শয়নঘরে খিল দিয়া, নির্জ্জনে কোন মহৎ কাজ সম্পাদন করিতেন। প্রচার ছিল, তিনি যোগসাধনে নিযুক্ত থাকিতেন। কিন্তু সেই দুষ্টলোকগুলা রটাইত, রামঠাকুর ঘরে খিল দিয়া, লুকাইয়া গুড়মুড়ি খাইতেন। কিন্তু এ কথা কি কখন সম্ভবপর হয়? যাঁহাকে প্রত্যহ দশটার পর যজমান-বাড়ী অন্তত আট-দশটী বিষ্ণুপূজা করিতে হয়, তিনি কি

কখন প্রভাতে স্নানের পরই গুড়মুড়ি উদরে দিতে পারেন? তবে এ কথা!!সত্য যে, যে ঘরে তিনি খিল দিয়া গোপনে ধ্যানস্থ হইতেন, সে ঘরে গুড় এবং মুড়ি উভয় পদার্থ সদা বর্ত্তমান থাকিত, এবং খিল-খোলার পর গুড় এবং মুড়ি অনেক পরিমাণে কমিত। কিন্তু তাই বলিয়াই যে, সেই গুড়মুড়ি নিশ্চয়ই রামঠাকুর খাইতেন, তাহার প্রকৃত প্রমাণ কি! ঘরে ইন্দুর আছে, আরসুলা আছে, ছারপোকা আছে, মশা আছে,—নাই কি? ইহাদের দ্বারাও গুড়মুড়ির কিয়ৎপরিমাণে হ্রাস হওয়া সম্ভব! বিশেষ, গৃহাভ্যন্তরে বায়ু সদা প্রবহমাণ, বায়ুও কতক উড়াইয়া লইতে পারে। সময়ে সময়ে ঘরের মাঝে রোদও গিয়া থাকে। রোদের তাপে শুকাইয়া গুড়মুড়ির ওজন কম হওয়া অসম্ভব কি? সুতরাং ওজনে এবং পরিমাণে কম হইলেও রামঠাকুর তাহাতে নিতান্ত নির্দ্দোষ!

একদিন একটা লোক কপাটের ফাঁক দিয়া দেখিল, রামঠাকুরের মুখ ভরা, গণ্ডস্থল পূর্ণ, সম্মুখস্থ ধামিতে মুড়ি, এবং দক্ষিণ-হস্ত সেই ধামিতে সমর্পিত। এরূপ অবস্থা দেখিলেই যে, রামঠাকুর নিশ্চয় মুড়ি খাইতেছেন বলিতে হইবে, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণই বা কৈ? মুড়ির ধামিতে হাতটী সংলগ্ন বলিয়াই যে, তিনি নিশ্চয় মুড়ি মুখ-দ্বারা খাইতেছেন,—তাহা কেমন করিয়া বলিব? মুখ ভরা, গণ্ড পূর্ণ বটে, কিন্তু রেচক-কুম্ভক-যোগেও যে ঐরূপ অবস্থা হইতে পারে না, তাহারই বা খাঁটি প্রমাণ কি? কিন্তু সেই দুষ্ট ব্যক্তি না বুঝিয়াই, বিশেষ প্রমাণ না পাইয়াই বলিল, "ওকি ঠাকুদ্দা?—ওকি ঠাকুদ্দা?—নেয়ে এসেই মুড়ি খাচ্ছ যে!! ঠাকুরপূজা না করেই মুড়ি খাওয়া কি? এই কি তোমার আহ্নিক?"

রামঠাকুরের কুম্ভকযোগ।



[৮০]

ভয়-চকিত রামঠাকুর বুদ্ধি-বলে প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গুণে, উত্তর দিলেন,—"কেহে—ভায়া নাকি?—তা, ভেবো না,—তা, ভেবো না,—সে সব কিছু নয়। রজ্জুতে বোধ হয় তোমার সর্প-ভ্রম হচ্ছে! বেদান্তের নিয়মই তাই। এ সংসার মায়াময়। বস্তু এক,—আরোপ অন্যের। যথা—

ব্রহ্মাদি তৃণং পর্য্যন্তং মায়া যারা কল্পিতং জগতং। আচ্ছা ভায়া,—দাঁড়াও, দাঁড়াও—যাচ্ছি আমি,—তা, কি জান, তোমার বাপের সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল! সেদিন দেওয়ানজার বাসায় ব্রাহ্মণ-ভোজনে একহাঁড়ি সন্দেশ পেয়েছিলাম,—তা, ভায়া, কিছু খেয়ে যাও! অতি উপাদেয় জিনিষ,—তোমার জন্যই রেখেছি।" এই বলিয়া রামঠাকুর খিল খুলিয়া ভায়ার গায়ে হাত বুলাইয়া আপ্যায়িত করিয়া, সন্দেশ খাওয়াইলেন।

সে যাহা হউক, এইরূপ ধ্যানের পরই রামঠাকুর প্রত্যহ প্রাতে হুগলী-সহর একবার পরিক্রমণ করিতেন। নিকটেই সদরামীনের বাসা; তাঁহার নিকট প্রথমে উপস্থিত হইয়া, এক-ছিলিম তামাক খাইয়া, সদরামীন যে সকল নূতন দৈনিক-সংবাদ অবগত আছেন, তাহা সংগৃহীত করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিতেন। তারপর উকীলবাবুর নিকট উপনীত হইয়া, রাজনীতি, সমাজনীতি, এবং তারের সংবাদ গ্রহণ করিতেন। অবশেষে ডাক্তার বাবুর বাসায় গিয়া রোগ, রোগী, হাসপাতাল এবং গৃহস্থের অবস্থা অবগত হইতেন।

অতঃপর রামঠাকুর উচ্চ-স্তর হইতে নামিয়া মধ্য-স্তরে সমাগত হইতেন। চকের বাজারে মামাদের দোকানে বসিয়া, দুই-ছিলিম তামাক পুড়াইয়া খরিদ-বিক্রয় দর-দস্তরের সমালোচন করিতেন।

দপ্তর সাহাদের দোকানে গিয়া নিশাচর বাবুদের রাত্রির সংবাদ লইতেন। মধ্য-স্তরের কার্য্য-সমাধা হইলে, তিনি নিম্ন-স্তরে নামিতেন। তখন চৌমাথার মোড়ে দাঁড়াইয়া ঝী এবং খান-সামাবৃন্দের সহিত তাঁহার সংলাপ হইত। চোখ-ঠেরাঠেরি, রসিকতা, মুচকিহাসি—কত যে রঙ্গভঙ্গ বহিয়া যাইত, তাহার নির্ণয় কে করিবে?

এইরূপ প্রত্যহ প্রাতে উচ্চ-নীচ-মধ্য-শ্রেণীর নিকট সর্ব্বসংবাদ সংগ্রহ করিয়া, রামঠাকুর বেগে সেই সেরেস্তাদার শ্রীযুক্ত হরি-তারণ দত্তের বাসাভিমুখে ধাবিত হইতেন।

অদ্য উপনীত হইয়াই, বিশ্ব-গেজেট রামঠাকুর সভাস্থলে মহা খোষগল্প যুড়িয়া দিলেন। সেই মহাগল্পের মোহিনী-মায়ায় লোক সকল চিত্রার্পিতের স্থায় হইয়া রহিল। তৈলমর্দ্দক চাকর-ছুটা, তেল মাখাইতে ভুলিয়া গিয়া, দেওয়ানজীর মাথায় ও গালে হাত রাখিয়া, অচলভাবে গড়া-সঙের মত; হা করিয়া গল্প গিলিতে লাগিল। তখন সেই সভাস্থ সর্ব্বচক্ষু যেন নির্নিমেষে রামঠাকুরের বদন-চন্দ্র দর্শন করিতে লাগিল। সর্ব্বকর্ণ রামঠাকুরের কথা-সুধা পান করিতে লাগিল। সর্ব্বনাসিকা সুধা-সৌরভে মোহিত হইয়া উঠিল। সর্ব্বলোক যেন বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া শমীক-ঋষির ন্যায়, ভগবৎচিন্তায় ভোর হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রামঠাকুর। সে অতি অদ্ভুত! এমন কখন শুনি নাই, দেখি নাই! হ'বে না, হ'বার নয়! সে ভারি মজা! নিশ্চয়ই এর ভিতর মেয়ে-মানুষ আছে!—আমি বল্‌চি সে-পক্ষে কোন সন্দেহ নাই!

সকল লোকের মন অমনি পুলকে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

রামঠাকুর। একটা কথা একটু তলিয়ে বুঝে দেখ-না গা? লোকটা চাবি ভেঙ্গেচে, ঘরে ঢুকেচে, তেল মেখেচে, কূয়া থেকে জল তুলে নেয়েচে, এক খুলি রসগোল্লা এবং এক হাঁড়ি ক্ষীর খেয়েচে। শেষে বাক্স ভেঙ্গে নয়টী টাকা নগদ নিয়েচে—আর বুঝিবার বাকি কি?—হাঃ—হাঃ—মজা শুনুন;—ভোলা ময়রা পুলিসে এজেহার দিয়েছে যে, তার বাক্সে নোটে, টাকায় রেজকীতে এবং পয়সায় ৬১৮১০ মজুদ ছিল; কিন্তু ভাঙ্গা বাক্সে, নয়টাকা মাত্র কমিয়াছে। পুলিস হাসিয়া বলিল, 'চোরে বাক্স ভাঙ্গিলে সব টাকাই লইত,—কেবল নয়টাকা লইবে কেন? আর রাত্রে সদর-রাস্তার উপর চুরি হ'লে কি আমাদের পাহারাওয়ালা দেখতে পেতো না? অবশ্যই ইহার ভিতর কোন গুপ্ত রহস্য আছে।'—এই কথা ব'লে দারোগা-সাহেব রাগ ক'রে ভোলা-ময়রাকে থানায় বসিয়ে রেখেচে। রাগইত হ'তে পারে!—এমন ষড়যন্ত্রে কারই না রাগ হয়। চাবি ভাঙ্গিয়া, চুরি করিতে ঢুকিয়া, চোর কি কখন স্নান করে?—আর যদি স্নানই করে, তা হলে কি কখন ব'সে ব'সে ক্ষীর সন্দেশ, রসগোল্লা খায়? আচ্ছা,

এমন চোর কি কখন দেখেচো,—৬১৮১০ মজুদ থাকিতে কেবল ১৲ টাকা মাত্র লয়? আমি ঠিক বল্‌চি, ইহার ভিতর নিশ্চয় স্ত্রীলোক আছে। কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটী কে?

সেরেস্তাদার হরিতারণকে হুগলীর সকলেই কর্ত্তা বলিত। যখন তিনি সকলের কর্ত্তা, তখন তিনি আমাদের কর্ত্তা না হইবেন কেন? এবার হইতে আমরাও তাঁহাকে মাঝে মাঝে কর্ত্তা বলিয়া সম্বোধন করিব।

মৃদু-মন্দ-স্বরে কর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন,—"কাকে সন্দেহ হয়? ভোলা ময়রার দোকান ত চকের বাজারে;—ঘর তার বাবুগঞ্জে নয়? কার সঙ্গে কিরূপ ঘটনা হলো,—তার কিছু সন্ধান পেয়েছ কি?"

রামঠাকুর হাসিয়া বলিলেন,—"সে-সব ঠিক না ক'রে কি আমি এখানে এসেচি? মোদ্দা, আমার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়স হলো, এমন রঙ্গ রসের চুরি কখন দেখি নাই! আরে মোশাই,—টাকা, পয়সা, সিকি, আধুলি—সব পড়ে রইল,—চুরি ক'ল্লে কিনা এক হাড়ী ক্ষীর? তাই বা চুরি ক'রে নিয়ে গেল কৈ?—ক্ষীরটে খেয়ে হাড়ীটে ভেঙ্গে রেখে গেল!! অদ্ভুত রহস্য বটে।"

কর্ত্তা। রকমটা কি বল দেখি?

রামঠাকুর। (কর্ত্তার প্রতি হাসি-হাসি চাহিয়া) ভোলা ময়রার তৃতীয়পক্ষের বিবাহ। স্ত্রীটী উপযুক্ত হ'য়ে, এই সবে আজ তিন মাস ঘর করতে এসেছিলো। তা, আস্‌বার পরদিন থেকেই স্ত্রীপুরুষে দুজনে বিবাদ আরম্ভ হয়। সে ভারি এক রগড় উপস্থিত হলো। মেয়েটা তিনদিন ভাত খেলে না। আরে

মোশাই!—পুরুষটা ক'য়ে কি,—মেয়েটাকে বল্লে, তুমি ভাত না খেলে, হয় আমি গলায় দড়ী দিয়ে মরবো, না হয় বিবাগী হয়ে চ'লে যাবো। পাড়ার লোক এ-কথা শুনে ত আর হেসে বাঁচ না—

এইরূপ হুগলী-নৈমিষারণ্যে, রামঠাকুর-সূতের মুখে, ঠাকুর দাদা-প্রমুখ-মুনিগণ একান্ত-মনে যখন ভোলা-ময়রাণীর মহা-রাসলীলার মধুর কথা শ্রবণ করিতেছিলেন,—তখনই আমাদের সেই কালাচাঁদ দ্বারে দাঁড়াইয়া মাছ হাতে করিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "দাদামোশাই! অ দাদামোশাই!—বাড়ীতে আছেন কি?"

পুর্ব্বেই বলিয়াছি, কালাচাঁদের আজ সরস ভাব, প্রফুল্ল মুখ। তাঁহার পশ্চাতে একটা নগদা-মুটে। মুটের মাথায় বাজরা। বাজরায় আলু, পটল, বেগুন, কাঁচকলা, এক হাড়ি দই, এবং পাঁচ সের সন্দেস আছে

কালাচাঁদ, "দাদামোশাই! অ দাদামোশাই!"—ডাক ডাকিতে ডাকিতে, মাছ হাতে করিয়া মুটের সহিত গৃহে প্রবেশ করিলেন।

ঠাকুরদাদা, নাতী-কালাচাঁদকে তদ্ভাবে হঠাৎ দেখিয়া, অন্তরে চমকিয়া উঠিলেন। অন্তর চমকাইলেই বাহিরে চমকে। ঠাকুরদাদার দেহও দুলিয়া উঠিল। কিন্তু সেই দোলন-কম্পনভাব মুহূর্ত্তমধ্যে প্রশমিত হইল। কর্ত্তার হৃদয়-মাঝারে কি একটা যে, ভয়ঙ্কর বৈদ্যুতিক তরঙ্গপ্রবাহ বহিয়া গেল,—সভাস্থ কোন লোকই তাহা বুঝিতে পারিল না।

কম্পন দূর হইলে, ঠাকুরদাদা খানিক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। নি কালাচাঁদের মুখের দিকে তাকাইয়াই থাকিলেন, সহজে

বাও নিষ্পত্তি করিতে পারিলেন না। কর্ত্তা—ওস্তাদ;—পাকা হাড়। শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইলেন। ইত্যবসরে কালাচাঁদ দোয়ারে উঠিয়া, মাছটী ধড়াস্ করিয়া ঠাকুরদাদার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন।

কর্ত্তা তখন স্বকীয় মুখকে হাস্যময় করিলেন। প্রীতির সহিত মধুরকণ্ঠে পৌত্রকে সংবর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন, "এস, এস, ভায়া এস। ভাল আছ?"—

এই কথা বলিতে না-বলিতে, কালাচাঁদ ঠাকুরদাদার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। দাদার চরণ-ধূলা লইয়া মাথায় দিলেন।

দাদা, দক্ষিণহস্ত পৌত্রের মাথায় দিয়া বলিলেন, "চিরজীবী হও, সুখে থাক, আমোদ আহ্লাদ কর।—ওরে, কে আছিস, মুটের মাথা থেকে মোটটা নাবা।"

মোট নামানো হইল; কালাচাঁদ তাহাকে চারি পয়সা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

ঠাকুরদাদা। ভায়া! আজ ভাল হয়ে ব'স—ব'সে বিশ্রাম কর। সেদিন এলে,—দেখা দিয়ে অমনি চ'লে গেলে। তোমার ঠাকুরমা তোমার জন্ম ভাতবেড়ে ডাকাডাকি করিতে লাগিল। কিন্তু সেদিন তুমি হঠাৎ যে কোথায় উঠে চ'লে গেলে, আর খুঁজে পাওয়া গেল না। আজ এখানে থাক,—খাও, পর, শোও, থাক—এ'ত তোমার ঘর।—

কালাচাঁদ। তা, আমার ভার ত আপনার উপরেই। আপনি ছাড়া আমার আর কে আছে?

ঠাকুরদাদা। তা'ত বটেই ভায়া! তুমি আমার সুরেশ

এইরূপ আপ্যায়িত হইয়া কালাচাঁদ বৈঠকখানায় সেই সভা-মণ্ডপে বসিলেন।

কর্ত্তা উচ্চধ্বনিতে বলিলেন, "অরে কে আছিস্ রে! মাছ, সন্দেশ, দই—তরকারী বাড়ীর ভিতর দিয়ে আয়!—গিন্নিকে বল্, কেলেসোণা তাঁকে দই-সন্দেশ দিয়েছে,—আর কেলেসোণা এই খানে থাক্‌বে, আর আমার সঙ্গে একত্র আহার কর্‌বে।"

আদেশ মত ভৃত্যবৃন্দ সর্ব্বকর্ম্ম সমাধা করিল।

কর্ত্তা সেই তৈলমর্দ্দক অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের মধ্যে একজনের কাণে কাণে কি কথা বলিলেন। সে অমনি উঠিয়া, এক ছিলিম খা সু [illegible] তামাক সাজিয়া, হুঁকায় বকুল পাতার নল লাগাইয়া, কক্ষান্তরে নির্জ্জনে তাহা রাখিয়া দিল। তৎপরে কালাচাঁদের নিকট গিয়া, অতি বিনীতভাবে ধীরে ধীরে, অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বলিল, "হুজুর! একবার ওঘরে পায়ের ধূলা দিন্—তামাক তৈয়ারি।"

কালাচাঁদ হাসিয়া মনে মনে বলিলেন, "আজ যে অতিরিক্ত আদর দেখ্‌চি! যা'হোক,—তামাকটা ছাড়া হবে না।"

বৈঠকখানার পার্শ্বস্থ সেই নিভৃত ক্ষুদ্র কক্ষে, কালাচাঁদ সপের উপর বসিয়া, প্রাণ ভরিয়া সেই খাস্ তামাক খাইতে লাগিলেন। মুখের সজোর টানে সেই দোষশূন্য সুবৃহৎ হুঁকা গভীর গর্জ্জন করিতে লাগিল। সুগোল ধূমরাশির ঘনসন্নিবেশে গৃহ পূর্ণ হইল,—শেষে উড়িয়া সভামণ্ডপে ছুটিল। কালাচাঁদ এক একবার সুখটান মারেন, হাসেন, আর মনে মনে বলেন, "আচ্ছা এ কি রকম সামাজিক নিয়ম? বাহিরে গুরুজন আছেন বলিয়া, আমি লুকাইয়া ঘরের ভিতর তামাক খাইতেছি;—আমার ধূমপান গুরু-জন জানিতে না পারেন, ইহাইত উদ্দেশ্য। কিন্তু হুঁকার এই ঘোর

ঘর্‌ঘর্‌-ধ্বনি তাঁহারা কি শুনিতে পান নাই? এই ধূমরাশি এতক্ষণ কি তাঁহাদের নাকে, চোকে, মুখে লাগে নাই? তাঁহাদের নিকট হইতে আমি উঠিয়া আসিলাম, এই ঘরে বসিলাম, আর হুঁকার পড়্ পড়্ শব্দ হইল,—ধূমে পৃথিবী যেন পরিব্যাপ্ত হইতে চলিল,—আমা ব্যতীত এ-কাজ কে করিবে? তবে আর না জানিতে পারিলেন কৈ? যখন তাঁহারা নিশ্চয় জানিতেই পারিলেন,—তখন লুকাইয়া তামাক খাইবার দরকার কি? বিশেষ, স্বয়ং ঠাকুরদাদাই ত, আমার জন্ম তামাক সাজিতে বলিয়াছেন,—তখন জানাজানি সম্বন্ধে আর অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কি? এক কথা, গুরুজন ত স্বচক্ষে তামাক খাওয়া দেখিতে পাইলেন না,—ইহাই তাঁহাদের উপর যথেষ্ট সম্মান-প্রদর্শন। কিন্তু এরূপ "জানা" যে, "দেখার" বাবা। তাই বলি, এ কি রকম সামাজিক নিয়ম?"

কালাচাঁদ এইরূপ ভাবেন, আর হাসেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

অরণ্যচর নিষাদ, কামমোহিত বিহঙ্গকে বধ করিয়া শাপগ্রস্ত হয়। হরিণ-বধ পাপে পাণ্ডু রাজার মৃত্যু ঘটে। অম্বুবতী নর্ত্তকী ইন্দ্রের সভায় সামান্য তালভঙ্গ-অপরাধে, মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। স্বর্গবেশ্যা-উর্ব্বশীর অপমান করায়, অর্জ্জুন নপুংসক হন। অন্যেত কোন্ ছার—কীটানুকীট? এইমাত্র যে, অতি কুকাজ সাধিত হইল, তাহার জন্য দায়ী কে? দোষ কার?—তাহার দণ্ডই বা কি? এ মহাপাপ হইতে কি উদ্ধারের উপায় নাই?

কোথায় মনোমহিনী ময়ূরাণীর তত্ত্বকথা আরম্ভ হইয়াছিল, রাসলীলায় রঙ্গরসে রসিক-সুজনের রসনা লহ-লহ করিতেছিল,—এমন সময় কিনা একটা মিস্‌কালো মিন্‌সে এসে, সব মাটী করে দিল। সুধাবৃক্ষ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইল। ময়ূরাণী-মহাভারতের আদিপর্ব্বেই অস্তিত্ব লোপ হইল। এ শোক-শক্তিশেলে কাহার না বক্ষ বিষম বিদীর্ণ হয়? এবং যে দুষ্ট, এ দুর্ঘটনা ঘটাইবার মূল-কারণ, তাহাকে দ্বিগুণ দণ্ড দিলে দোষ কি?

দাও কিন্তু গ্রন্থকার নির্দ্দোষ। আমি যে ইচ্ছা করিয়া, এ মহা-রসের মাঝে কালাচাঁদকে আনিয়াছি, তাহা যেন কেহ মনে না করেন। কেহ বলে নাই, কেহ ডাকে নাই, কেহ নিমন্ত্রণ করে নাই, কালাচাঁদ আপনা-আপনিই আসিয়াছেন। তা, আমি কি করিব? যাহা ঘটিয়াছিল, তাহাই বিবৃত করিয়াছি। আমার বশে ত ঘটনা নহে, ঘটনার বশে আমি। তবে এমনটা বলিলেও বলিতে পার, দোষ যাহা কিছু, তাহা ত কালাচাঁদেরই—সে আসিল কেন? কিন্তু কালাচাঁদ কহিতেছেন, "আমার দরকার, তাই আসিয়াছি; তোমাদের যদি এত গরজ ছিল, ঘরে খিল দিয়া গল্প কর নাই কেন? আর, খিল খুলিয়া রাখাই যদি অভিপ্রেতই ছিল, তবে দ্বারে দ্বারবান্ বসাও নাই কেন,—সে আমাকে দেখিলেই দূর করিয়া দিত?" রামঠাকুর উত্তর দিতেছে,—"তুমি কালাচাঁদ-কালাপাহাড়, তুমি যে এ মুখ্যকালে—জমাট-গানের মধ্যস্থলে আসিয়া পড়িবে, তাহাই বা আমি কেমন করিয়া জানিব? আর, তুমি আসিলেই যে, কর্ত্তা আদরে গলিয়া গিয়া তোমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া, এই গল্প ভুলিবেন—তাহাই বা কেমন করিয়া বুঝিব? আমি

জ্যোতিষীও নই, জন-ও নই, গণৎকারও নই,—যে, ভবিষ্যৎ ঘটনা ভাবিয়া রাখিব!"

তবে দোষ কার? ভগবানের কি? কেন তিনি এমন ঘটনা ঘটাইলেন? ভগবান্ বলেন, "আমি কিছু জানি না; কর্ম্মফলে মানুষের ভোগাভোগ নিয়মিত। যে যেমন কর্ম্ম করে, সে তেমন ভোগ পায়,—আমি কর্ম্মফলদাতা মাত্র।

এতক্ষণে বুঝা গেল, দোষ কাহারো নহে, দোষ কপালের। রামঠাকুরের যশোভাগ্য যদি পুষ্পিত হইত, শ্রোতৃবৃন্দের সুকৃতি যদি ষোলকলা থাকিত,—তবে কি এই ময়রাণী-মাহাত্ম্য,—এই মধু-মাসের মিঠা গান, মাঠে মারা পড়িত!—না, সেই শোকে আজ দুনয়নে দশধারা ঝর্ঝর্ বহিত?

রামঠাকুর প্রথমে ভাবিয়াছিলেন, মাছ-দই-তরকারী বাড়ীর ভিতর গেলেই, তিনি আবার গল্প আরম্ভ করিয়া দিবেন। তৎ-কার্য্যাবসানে, তথাচ কর্ত্তা কালাচাঁদের সহিত এক আধ্টী কথা কহিতে থাকিলেন;—কাজেই রামঠাকুর গল্প যুড়িবার ফাঁক পাই-লেন না। কালাচাঁদ বিছানায় উপবিষ্ট হইলে, কর্ত্তা ঈষৎ অন্য-মনস্ক হইলেন; রামঠাকুর গল্প অল্প আরম্ভ করিয়া আবার বন্ধ করিলেন। তার পর, কালাচাঁদ তামাক খাইতে অন্যকক্ষে গমন করিলে, রামঠাকুর ভাবিলেন, পাপ বিদায় হইল। তখন আর কোন বাধা-বিঘ্ন না মানিয়া, কাহারো অপেক্ষা না করিয়া, পঞ্চমে সুর চড়াইয়া রামঠাকুর একেবারে কথা আরম্ভ করিলেন;—"চ'কে এমন চমৎকার চুরি আমি কখন দেখি নাই! অতি অদ্ভুত! অতি অদ্ভুত! ভোলাময়রার কপাল একেবারেই ভেঙ্গেছে। মেয়েটা তার একরাত্রে সর্ব্বনাশ ক'রে গেল গা? স্ত্রী রূপবতী হইলে, ততো'

অনেক দোষ ঘটে। সে যাহোক, তারপর পূর্ব্বকথা শুনুন,—ভোলাময়রা তার স্ত্রীকে অনেক বুঝালে। কিন্তু মেয়েটা মোটেই কথা কয় না—বুঝবে কি? একে কাঁচা বয়স, তা'তে দারুণ অভিমানিনী, তাহার উপর গায়ের রঙটী যেন কাঁচা-সোণা;—তা, আমি ময়রার ঘরে অমন সুন্দরী মেয়েমানুষ কখন দেখি নাই,—বল্‌বো কি মোশাই,—ভোলাময়রা মেয়েটাকে কথা কওয়াবার জন্য ছট্‌ফট্‌ কর্‌তে লাগলো!"—

রামঠাকুরের গল্প-গানে এত গরমমসলা পড়িলেও, কর্ত্তার সে রস পানে সাধ রহিল না। তিনি পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্কই রহিলেন। ধীরে ধীরে একজন ভৃত্যকে বলিলেন, "কালাচাঁদ যদি আর একবার তামাক চায়, দাওগে।"

এদিকে কালাচাঁদ তামাক খাইতে খাইতে সামাজিক চিন্তায় নিমগ্ন। গুরুজন-অসাক্ষাতে তামাক খাইবার রীতিমত অসারত্ব ভাবিয়া কতই হাসিতেছেন, কতই মুখভঙ্গী করিতেছেন, কখন বা স্থিরচক্ষে চাহিতেছেন! বিধাতার নির্ব্বন্ধ কেমন করিয়া বুঝিব? —কিন্তু গত কল্য হইতে কালাচাঁদ প্রকৃতই প্রগাঢ় চিন্তাশীল এবং সূক্ষ্ম-সমালোচক হইয়াছেন। বন্ধু-পতিতপাবন কর্ত্তৃক বিতাড়িত, আশ্রয়-রহিত, অভুক্ত, অর্থশূন্য, ক্লিষ্ট কালাচাঁদ গঙ্গার উপকূলে শ্মশান-সম্মুখে একাকী উপবেশন করিয়া, গতকল্য নিশীথে, ঘোর দুর্দ্দিনে, ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাতের মধ্যে, অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা ভাবিয়াছিলেন। ভাবিতে ভাবিতে তখন তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মে, সংসারের সকল বেটাই চোর, সকল বেটাই বঞ্চক, সকল বেটাই বদমাইস! সংসারে ভাললোক একটাও নাই,—তবে কেহ উনিশ, কেহ বিশ,—এইমাত্র তফাৎ। তখন হইতে তিনি সামাজিক

সর্ব্বপ্রকার রীতিপদ্ধতির পদে পদে ভুল দেখিতে লাগিলেন। আজ কালাচাঁদের চক্ষে এমন কোন বিষয় নাই, বস্তু নাই,—যাহা প্রমাদে পরিপূর্ণ নহে। যাহাই পর্য্যালোচনা করেন, তাহাই নিতান্ত অসার, ক্ষুদ্র হেয় বলিয়া তাঁহার ধারণা জন্মে। সংসারকে যতই অসার দেখেন, ততই তাঁহার স্ফূর্ত্তি হয়, আনন্দ হয়, গাম্ভীর্য্যের সহিত বিকট হাসি বৃদ্ধি পায়।

এইরূপ হাসিতে হাসিতে কালাচাঁদের কাণ রামঠাকুরের গল্পের দিকে গেল। গল্পের মর্ম্ম অবগত হইয়া কালাচাঁদ মর্ম্মান্তিক হাসিয়া উঠিলেন। হাসির তেজে তামাক খাওয়া বন্ধ হইল; মুখ আর হুকাছিদ্রে সংলগ্ন করিতে সক্ষম হইলেন না। তিনি মনে মনে বলিলেন,—"হোঃ হোঃ—ভোলাময়রার দোকানের চুরি কি স্ত্রীলোক দ্বারা সংঘটিত হইল? সেই স্ত্রীলোকটী আবার ভোলারই স্ত্রী? বেশ বেশ! মজা বেশ! সংসারটা হলো কি?—বাঃ—বাঃ—

কালাচাঁদ এবার কুল-কুল করিয়া একমুখ হাসিয়া ফেলিলেন। অতি-দুঃখে একরকম হাসি আসে, এ হাসি কি তাই?

কর্ত্তার আদেশমত এমন সময় ভৃত্য গিয়া বলিল, "হুজুর! আর একবার তামাক সেজে নিয়ে আসি!" হাস্যময় কালাচাঁদ উত্তর দিলেন, "বহুত আচ্ছা!"

ও দিকে অনর্গল-গল্পকারী রামঠাকুরকে কর্ত্তা বলিলেন, "আজ ঠিক সন্ধ্যার সময় তুমি একবার এসো! কোন বিশেষ কথা আছে।" কর্ত্তার কথার সুর, মুখের ভঙ্গী, চোখের চাহনি,—দেখিয়া শুনিয়া রামঠাকুর ঠিক করিলেন, অদ্যকার গতিক বড় মন্দ,—কর্ত্তা গল্প শুনিতে রাজী নহেন।—ভাবিলেন,—"ময়রাণীর কথায় কর্ত্তা এত বিরক্ত কেন? ময়রাণীর সঙ্গে কর্ত্তার কোন গোলযোগ আছে

নাকি? কিন্তু আমার কাছে ত তাঁহার কোন কথাই গোপন নাই;— আমাকে না ব'লে তবে কি ডুবেডুবে জল খেয়েছেন নাকি?— আচ্ছা, তা হোক, সন্ধ্যার পর সব জানা যাবে,—আমার কাছে কতক্ষণ কথা চাপা রাখিবেন?"

রামঠাকুর প্রকাশ্যে বলিলেন, "যে-আজ্ঞে! আপনি যা আদেশ করচেন, তাই হবে—"

কর্ত্তা। ঠিক সন্ধ্যার সময় এসো—

রামঠাকুর। আজ্ঞে, আমি না-হয় বৈকালে এসে খানিক ব'সে থাকবো। এখন আজ্ঞে করেন ত, এখন আসি—

কর্ত্তা। আচ্ছা—এসো।

গল্পের গেজেট রামঠাকুর দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

কর্ত্তার বৈঠকী-সভায় প্রায় ষোল জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন। সকলেই স্ব স্ব-গৃহে গমনের নিমিত্ত চাদর গুটাইতে লাগিলেন। অকালে,—সভার কার্য্য অসমাপ্ত থাকিতে, সভা-ভঙ্গহেতু, সভ্য-মণ্ডলী নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইলেন। তাঁহাদের সাধ ছিল,—রাম-ঠাকুরের প্রমুখাৎ শ্রবণ করিবেন যে, ময়রা-মহিলার বয়স সপ্তদশ বৎসরের অধিক হইবে না,—তদুপরি নব-যৌবনের নব-লাবণ্য ঢলঢল্ করিতেছে; মুখশশী সদা সুধা বিলাইতে উদ্যত; উচ্চকুচ-গিরি আকাশ ভেদ করিয়া এখনি চলিয়া যাইবে; বঙ্কিম-নয়নে পুরুষের পাগল-প্রাণ কাড়িয়া লইবে; ক্ষীণকটী বায়ুভরে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবে; এবং নামটী অন্তত ভুবন-মনো-মোহিনী হইবে। "সর্ব্বাবয়বানবদ্যা, সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না, সর্ব্বভূতপ্রিয়ম্বদা সেই ময়রাণী-রমণী, বৃদ্ধ-পতির আনুগত্য ঈষৎ—অতি অল্পমাত্রায়, উপেক্ষা করিয়া, রাজপুত্রবৎ এক নবযুবকের হাত ধরিয়া—(অভাবপক্ষে)

রাজপথে হাসিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন;—" এরূপ ঘটনা তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে চ'কের দোকা চাবি-ভেঙ্গে ক্ষীর খাওয়া মিলে কৈ? গল্পের সমাঞ্জস্য থা কৈ?—আচ্ছা, মিলাইয়া লও,—"যুবক-যুবতী রাজপথে অনু রাগভরে বিচরণ করিতেছিলেন। এমন সময় ক্রমে সন্ধ্যা সম গতা হইলেন। সন্ধ্যার পর নিশা আগমন করিলেন। তখ তাঁহারা ধারাবাহিক বিচরণজন্য ক্ষুৎপিপাসা-শ্রমাতুর হইয়া, শে দোকানঘরের চাবি খুলিয়া, জলযোগ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।" মিলিল'ত! সামঞ্জস্য হইল'ত। তৃপ্তি হইল ত!

কিন্তু এ আশার এক কণাও পূর্ণ হয় নাই। সভ্যগণ, ভগ্নম চাদর ঝাড়িয়া, কাঁধে ফেলিয়া, বিদায়ী-তামাকের অপেক্ষা করি লাগিলেন। অহো কি মন্দভাগ্য! তামাকও কেহ দিল না, কে দিতেও বলিল না। ভগ্ন-হৃদয় আরও ভাঙ্গিল। তাঁহারা বহ কষ্টে বুক ধরিয়া উঠিয়া নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দুই ছিলিম তামাক পোড়াইয়া কালাচাঁদ বাহির হইলেন কর্ত্তা স্নানার্থ অন্দরে গেলেন। ভৃত্যগণ বাহিরের বারান্দায় কাল চাঁদকে তেল মাখাইতে বসিল।

খানসামা কর্ত্তৃক তৈল-মর্দ্দিত হওয়া,—কালাচাঁদের প নিতান্ত নূতন জিনিস। তাঁহার ইহজীবনে এরূপ ঘটনা কখন ঘ নাই। এই অভিনব ব্যাপারে আজ কালাচাঁদ কিঞ্চিৎ বিব্রত

যখন ভৃত্য বলিল, "হুজুর! আপনাকে তেল মাখাইব,"—তখন কালাচাঁদ ভাবিলেন, "ডুবেছি, কি ডুবতে আছি, দেখে আসি পাতাল কত দূর। তেল-মাখানো কি রকম লাগে, একবার দেখা যা'ক না কেন?"—প্রকাশ্যে বলিলেন, "আচ্ছা মাখাও।"

ভৃত্য প্রথমেই কালাচাঁদের পা লইয়া পড়িল। সে'ত পা নয়, ঠিক যেন শ্রীচরণ,—যেন দুঃখীর দ্বারের সজীব আগড়,'—উনিশ-ইঞ্চি থান্-ইট কোথায় লাগে? যদি শ্রীচরণ-আশীর্ব্বাদে কোনও জনের কখন 'সমস্ত-মঙ্গল-হয়-বিশেষ' হইয়া থাকে, তবে সে এই-রূপ শ্রীচরণ দ্বারা। বলিরাজ, বামনরূপী শ্রীহরির ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা দিতে বরং সক্ষম, কিন্তু কালাচাঁদের এই একপাদেই আক্কেল-গুড়ুম্। এ পদ-প্রতিষ্ঠা করিয়া সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিলে, গয়া-ক্ষেত্রে গদাধরের পাদপদ্ম-মহিমা কতক যে কমিবে, তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি?

ভৃত্য, দক্ষিণ-শ্রীচরণ-খানি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিল,—পায়ের তলায় "ইন্দুর-জালি";—গোড়ালীটী ফাটা-ফাটা। ইতিপূর্ব্বে কারা-বাসে কালাচাঁদ তিন বৎসরকাল জুতা পায়ে দেন নাই; মুক্তি-লাভের পর, জুতা তাঁহার তাদৃশ মনোযোগাকর্ষণ করে নাই; ছিন্ন চটীতেই চিত্ত বিমোহিত ছিল। বিশেষ, খালি-পায়ে বিচরণই আজ কাল তাঁহার অধিকতর প্রিয়! কাজেই পদতল নানা দোষে । পায়ের কাণ্ড দেখিয়া ভৃত্যের অধর-প্রান্তে হাসি আসিল। চিত্ত সংযত করিয়া ভৃত্য নিজের গামছা-দ্বারা পা-খানিকে ভাল করিয়া মুছিল। নখ বড় বড় দেখিয়া নরুন আনিয়া নখ কাটিয়া দিল। কালাচাঁদের সাড়া-শব্দ নাই, চক্ষু বুজিয়া আড় হইয়া শুইয়া আছেন। এ-সময় কালাচাঁদের কাণ মলিয়া দিলেও, তিনি

এখন কথা কহেন না; কারণ তিনি ভাবেন,—ইহা বুঝি তেল-মাখানোর একটা অঙ্গ।

দুইজন ভৃত্য, কালাচাঁদের দুখানি পা কোলে রাখিয়া, পায়ের চাটুতে ফুলেল-তেল মাখাইতে আরম্ভ করিল। কালাচাঁদের পায়ে বিষম সুড়্‌সুড়ি বাজিতে লাগিল; যন্ত্রণায় প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল। তবু কালাচাঁদ কথাটি কহিলেন না। মুখ ফোটে ফোটে ফুটিল না। একবার ভাবিলেন, পা-দুটা কাড়িয়া লই। আবার ভাবিলেন, তা হ'বে না, তা'হ'লে চাকর দুটা আমাকে নিতান্ত চাষা ভাব্‌বে। তা, ভাব্‌লেইবা,—তা'তে ক্ষতি কি?—না, পা-তুলিয়া লওয়া হবে না,—মজাই দেখা যাক্‌ না কেন?—উঃ, আর যে থাকিতে পারি না!—উহুহুহুঃ,—উঃ, গেলাম!—এই বলিয়া কালাচাঁদ, অনিচ্ছাসত্ত্বে, হঠাৎ, ইতিকর্ত্তব্যতা-বিবেচনার পূর্ব্বেই, সজোরে পা কাড়িয়া লইতে বাধ্য হইলেন। সেই পদাকর্ষণরূপ বিষম সংঘর্ষণে চাকর-দুটা চিৎপাত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহারা আর হাসি রাখিতে পারিল না; হো হো হাসিয়া উঠিল। কালাচাঁদেরও অধরোষ্ঠ-রূপ হাসির বাঁধ ভাঙ্গিয়া মুখবিবর খালি হইয়া গেল। তখন এই লোক-ত্রয়ের হাসি একত্র হইয়া লোকত্রয়ই যেন পূর্ণ করিয়া ফেলিল। হাসির তুমুল কোলাহল শুনিয়া, বধূ-কুল অট্টালিকার গবাক্ষের দিকে দৌড়িয়া আসিয়া, এ বিরাট ব্যাপার আয়তলোচনে অবলোকন করিতে লাগিল। স্ত্রীগণ হাসির প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই বুঝিল না,—কেবল কালাচাঁদের হৃষ্টপুষ্ট-কৃষ্ণাকৃতি দেখিয়া পরস্পর বলাবলি করিল, "ওমা, এ মিনসে কে গো! কা'দের গো! দেখো, দেখো, চেহারা দেখো।" একজন নবীনা মুচকি-হাসি হাসিয়া মিহি-সুরে তাহার বয়োজ্যেষ্ঠাকে উত্তর

কালাচাঁদের তৈলমর্দ্দন।



দিল,—"অ দিদি! তুমি আর ভেব না; উনি যে তোমার ঠাকুর-পো! পুন্নিমের রাত্রে আকাশে গোল-পানা "যা" উঠে, তা'তে দুয়াতের "তা" মাখালে য' হয়,—তাই ওঁর নাম।

বয়োজ্যেষ্ঠা। ঠাকুরপো কেন হতে গেল না? উনি যে আমার ভাসুর।

নবীনা। দিদি! তা নয়,—তা নয়,—উনিই তোমার ঠাকুরপো,—আজ ও'র সাক্ষাতে বেরিয়ে তোমাকে পরিবেশন কত্তে হবে!

বয়োজ্যেষ্ঠা। (হাসিয়া) ওরে বাবা! তা পারবো না,—ঠাকুরপো-ই হউন, আর ভাসুরই হউন, উনি আমার মাথার থাকুন! কিন্তু সাত রাজার ধন একটী মাণিক হাতে দিয়ে, কেউ যদি বলে, ওর সুমুখে এক থালা ভাত ধরে দিতে হবে,—তাতে আমি রাজী হই না,—

মহিলাগণ এইরূপ বলিয়া, হাসিয়া হাসিয়া, পরস্পরের গায়ে ঢলিয়া ঢলিয়া, পড়িয়া পড়িয়া, চলিয়া গেল।

এদিকে আবার তৈল-মর্দ্দন পর্ব্ব আরম্ভ হইল। ভৃত্যদ্বয়, কালাচাঁদের পদদ্বয়ে আর করপদ্ম অর্পণ করিতে সাহস করিল না;—পৃষ্ঠদেশ ধারণ করিল। তখন তালে তালে তৈল-মর্দ্দনের মহাধ্বনি উত্থিত হইল। দুপ্-দাপ্, ধুপ্-ধাপ্, টুপ্-টাপ্;—থপাস্-থপাস্, ধপাস্-ধপাস্, ঝপাস্-ঝপাস্;—চড়্-চড়্-চড়্, ছড়্-ছড়্-ছড়্, ঝড়্-ঝড়্-ঝড়্;—গুড়ু-গুড়ু-গুড়ু-গুড়ু গুম্, দুড়ু-দুড়ু-দুড়ু-দুড়ু দুম্; ধুড়ু-ধুড়ু-ধুড়ু-ধুড়ু ধুম্;—এইরূপে ঘোররবে তৈলমর্দ্দন-কার্য্য চলিতে লাগিল। তৈলমর্দ্দন-প্রপীড়িত কালাচাঁদ চুপিসে ভাবিতে লাগিলেন,—"এ আবার একটা নূতন বিপদ উপস্থিত হলো দেখচি! এ চড়, চাপড়, কীল, ঘুষি কতক্ষণ খাইব?—এই যে

মধ্যে মধ্যে রঙ্গ-টীপুনিও আছে। সুড়সুড়িটে যে নিতান্তই নাই, তাও নহে। পাপ ছুঁড়ী যে ছাড়ে না!”

কালাচাঁদ আরও চিন্তা করিতে লাগিলেন,—“এরূপ অবৈধ-ভাবে প্রহারিত, জর্জ্জরিত দেহ হইবার জন্য বড়লোকে মাহিয়ানা দিয়া চাকর রাখে কেন? ঘরের টাকা দিয়ে মার খাওয়া!! এ নিয়ম ভাল ভাল!! লোকের এতে বেশ সুখশান্তি হয়। আচ্ছা, এ কাজে সুখটা কি? এতদিন তেল মাখাইবার লোক ছিল না বলিয়া, তন্নিবন্ধন কখন'ত আমার অসুখ হয় নাই। সুখের মাত্রা'ত কখন কমে নাই! বলিতে পার—আমি অসভ্য, মূর্খ,—সুখের মাত্রা কমিল, কি বাড়িল, কি সমান রহিল,—তাহা আমি কেমন করিয়া বুঝিব? যখন আমি কস্মিনকালে তেল-মাখানোর আস্বাদন পাই নাই, তখন ইহাতে সুখ-বৃদ্ধি পায় কি না, তাহা কেমন করিয়া জানিব? জানি না বটে, কিন্তু সুখের আরম্ভে যাহা দেখিলাম, তাহা'ত বড় আশাজনক নহে! কি বড়লোক, কি ছোটলোক—সকলকেই এইরূপ আরম্ভে উত্তীর্ণ হইয়া, ক্রমে বর্দ্ধিত-হারে সুখ পাইতে হইবে ত!—দণ্ডবৎ!—এমন সুখবৃদ্ধিতে আমার কাজ নাই! এখানে আরম্ভেই যে মৃত্যু!—শেষ দেখিবে কে?”

কালাচাঁদের হৃদয়পটে সুখদুঃখের নানা কথা এইরূপ গোল-মাল-ভাবে অঙ্কিত হইতে লাগিল। অন্য সময় হইলে, তিনি চাকর-দুটাকে গলা টিপিয়া সরাইয়া, স্বয়ং পা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িতেন; কিন্তু অদ্যকার অভিপ্রায় স্বতন্ত্র,—তাই আদব-কায়দার উপর কতকটা দৃষ্টি। তিনি ধীরভাবে ভৃত্যদ্বয়কে বলিলেন,—‘থাক্ আর তেল মাখাইতে হইবে না,—”

ভৃত্য। হুজুর এখনো মাথাটা বাকি আছে।

কালাচাঁদ। (ঈষৎ হাসিয়া স্বগত) বাকি, মাথাটাই বটে ;—কিন্তু তোমাদের হাতে আর কাঁচা মাথাটা দিয়া বিশ্বাস করিতে পারি না। (প্রকাশ্যে) "মাথায় তেল আমি নিজেই দিচ্ছি,—তোমরা এখন ছাড়ো,—আমি শীঘ্র গঙ্গাস্নান করিয়া আসি—"

ভৃত্য। সে কি হুজুর! আপনার স্নানের জন্য দুই ভার গঙ্গাজল ঐ এনেছি—এইখানেই স্নান করুন,—গঙ্গায় যেতে গেলেন কেন? —তত দূর যেতে যে রোদে আপনার কষ্ট হবে!!

কালাচাঁদের মুখে হাসির রেখা ঈষৎ অঙ্কিত হইল। এ হাসির বোধ হয় অর্থ এইরূপ ;—আমি কালাচাঁদ,—ঘণ্টায় চারি ক্রোশ পথ চলিতে পারি,—পাঁচদিনে শ্রীক্ষেত্র যাইতে সক্ষম,—আমাকে বলে কি না, "আপনার গঙ্গা নাইতে যেতে রোদে কষ্ট হবে!"—ঠাকুরদাদার বাসা হইতে গঙ্গা এক পোয়া পথের অধিক নহে! কালাচাঁদ ভৃত্যকে ধীরস্বরে বলিলেন,—"আচ্ছা, তবে এইখানেই স্নান কর্‌চি,—মোদ্দা, তোমরা কেউ আমার কাছে এসো না।"

অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঘষমাজা নাই,—কালাচাঁদ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ক্রমশ চারি কলসী জল মাথায় ঢালিলেন। ভৃত্যগণ গামছা-তোয়ালে লইয়া তাঁহার গা মুছাইয়া দিতে আরম্ভ করিল। কালাচাঁদ বলিলেন —"মুছাইয়া দিতে হইবে না। কেবল গামছা-খানা আমাকে দাও।"

অঙ্গ পরিষ্কার হইলে, ভৃত্য, কালাচাঁদের সম্মুখে এক চমৎকার পট্টবস্ত্র ধরিল। তিনি হাসিয়া তাহাই পরিলেন। পরিয়া, একবার আপন চেহারা আপনি দেখিয়া লইলেন। দেখিয়া, যেন

মনে মনে সন্তুষ্ট হইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া ভাবিলেন,—এইবার উত্তম-মধ্যম আহারটা হইলেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

এমন সময় ঠাকুরদাদা স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া খড়মের ঠক্ঠক্ ধ্বনিতে চারিদিক্ যেন বিরক্তিভাবে পূর্ণ করিয়া, অন্দর হইতে সদরে আসিলেন। তাঁহার নাকে তিলক; সর্ব্বাঙ্গে হরি-নামের ছাপ; স্কন্ধে রেশমের নামাবলী। তিনি আসিয়াই বলিলেন, "ভায়ার স্নান হয়েছে,—তা' বেশ!" চাকরগণের উদ্দেশে বলিলেন,—"হাতীর দাঁতের বগুলা-দেওয়া সেই আবলুস্-কাঠের বড় খড়ম-জোড়াটা নিয়ে আয়,—আর, তোরা একজন ভাল ক'রে কালাচাঁদের পা-ধুইয়ে-পুঁছিয়ে দে—"

কর্ত্তার কথায় কালাচাঁদ কোন দ্বিরুক্তি করিলেন না; নচেৎ ভৃত্য স্ব-ইচ্ছায় পা ধুয়াইতে আসিলে তিনি এতক্ষণ তাহাকে ধমকাইয়াই দূর করিতেন! কিন্তু খড়ম নিকটে আসিলে কালাচাঁদ পৃথিবী অন্ধকার দেখিলেন। বিষম বিব্রত এবং কাতর হইলেন।—এ কাষ্ঠ-যন্ত্রে পদন্যস্ত করিলেই ত পড়িয়া যাইব। কখনো অভ্যাস নাই, কেবল পায়ের দুইটী অঙ্গুলের সাহায্যে কাঠের উপর ভর দিয়া চলিলেই ত চিৎপাত হইব! কিন্তু কর্ত্তার

আজ্ঞা অবহেলা করিই বা কেমন করিয়া? পড়িলে মরিব না বটে,—মরিলে ক্ষতিও নাই বটে,—কিন্তু এ দেহ হঠাৎ ধরাশায়ী হইলে, পাড়ার লোক ভাবিবে, বড়কর্তার বাড়ী হঠাৎ ভূমিকম্প হইল কেন? নিশ্চয়ই দিক্‌দিগন্ত হইতে—বহুলোক দৌড়িয়া এ ব্যাপার দেখিতে আসিবে। তখন কেহ বলিবে, আহা। মুখে চোখে জল দেও, পাখার ব্যজন করো। কেহ বলিবে, চুণে-হলুদ বাটো! কেহ বলিবে, ডাক্তার ডাকিয়া আনো। কেহ গায় হাত বুলাইয়া বলিবে,—বাছমাণিক! কোথায় লেগেচে বলত? পড়ায় আমার যত না কষ্ট, এইরূপ সেবা-শুশ্রূষায় তদপেক্ষা সহস্র-গুণ অধিক কষ্ট হইবে। ইহাকেই বলে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা!—আমি আপনি পড়িব, আপনিই উঠিব,—যদি অন্ত কেহ তখন আমার প্রতি অনুগ্রহ দেখাইয়া নিকটে না আসেন, আহা-আহা না করেন, তাহা হইলে আমি খড়ম পায়ে দিতে রাজী আছি; কিন্তু সে করারু করে কে? সে একরারনামা লেয় কে? —আমি এইবার বুঝি মজিলাম!

দেখিতে দেখিতে পদধৌত-ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। ভৃত্য খড়মটী পায়ের নিকট ধরিল। সঙ্কটকাল আসিল! বিলম্ব নাই!—এখনি মহাগ্নিতে ঝাঁপ দিতে হইবে। ত্রাহি মধুসূদন কালাচাঁদ দেব-দেবী মানেন না; কিন্তু এইবার তাঁহাকে আকাশ-পানে তাকাইতে হইল! [উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া মনে মনে কাহার শরণ লইলেন, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

কালাচাঁদ অগত্যা ধীরে ধীরে দক্ষিণ-পদ খড়মে স্থাপিত করিলেন। কিন্তু পা খড়মে কুলাইল না, গোড়ালীটা বাহিরে হইয়া রহিল! কষ্ট আরও বাড়িল। কিন্তু উপায় নাই। তিনি

উভয়পদে খড়মযন্ত্র আঁটিয়া, 'উচু-নীচু, সচল-পিছল পথ দেখিয়া, আড়ষ্ট হইয়া, উরুদেশে ব্যাধিবিশিষ্ট রোগীর ন্যায়, ধীরমন্থর-গতিতে যেন খুঁড়াইয়া চলিতে লাগিলেন।

এ দারুণ দৈব-বিপত্তি-কালে বোধ হয় কালাচাঁদ ভাবিয়া ছিলেন,—"ঠাকুরদাদার কাছে আমার উদ্দেশ্য-সিদ্ধিতে কাজ নাই, খড়ম ফেলিয়া এখনি সটান দৌড়িয়া পলাই।"

এরূপ ভাবুন, আর নাই ভাবুন,—কালাচাঁদ কিন্তু পলাইলেন না। এই-পড়িলাম, এই-পড়িলাম এই-মজিলাম, এই-মজিলাম-ভাবে তিনি তদবস্থায় চলিয়া আসিয়া, বহুকষ্টে বৈঠকখানার খুঁটি ধরিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণেক বিশ্রাম লইলেন। সিঁড়ি দিয়া বৈঠকখানায় না উঠিয়া, সেই খুঁটি ধরিয়া উঠিলেন। কারণ সিঁড়ি দূরে এবং তাহার ধাপগুলা পিছল।

যে ঘরে তিনি তামাক খাইয়াছিলেন, তদবস্থায় তিনি সেই ঘরেই উপনীত হইলেন। খড়ম খুলিয়া সম্মুখে যাহা দেখিলেন, তাহা মনোমত বটে। পশমের এক বিচিত্র আসন, সম্মুখে—বেল, তরমুজ এবং মিছরি—এই তিন রকমের সরবৎ; তদুপরি ডাব; রৌপ্যথালে কিছু বেদানা ছাড়ানো; কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস্‌ ধোয়া; অল্প মুগের ডাল ভিজানো এবং তদুপযুক্ত চিনি। স্বর্ণথালে দুইটী কাঁচাগোল্লা। জলযোগের বস্তুবস্তু দেখিয়া কালাচাঁদের মন নরম হইল। খড়ম-পায়ে দিবার সন্তাপ কতক দূরে গেল। সন্তুষ্ট মনে কালাচাঁদ আসনে উপবেশন করিলেন। কেবল এক খুঁত রহিল। কাঁচাগোল্লার সংখ্যা যদি দুইটী না হইয়া, দ্বাদশটী বা দ্বাত্রিংশৎটী হইত, তবে সোনায় সোহাগা পড়িত। কালাচাঁদও একটু সৎ ঘাপন্ন হইলেন,—"জলখাবারের এত মহোৎসবে

উদর-পূর্ণের আসল সামগ্রী সন্দেশ এত কম কেন? চাকর বেটা ত চুরি করিয়া খায় নাই?"

সম্যক্ অনুশীলন না থাকিলেও, কালাচাঁদের দেহে ক্ষুধা-বৃত্তির স্ফুরণ, কিছু অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়াছিল। বিষম ভাবনা-নিবন্ধন পতিতপাবনের বাসায় তাঁহার দুই একমাস অন্নে অরুচি হইয়াছিল বটে, কিন্তু অরুচির অবস্থায় তিনি যে পরিমাণ অন্ন উদরস্থ করিতেন, অন্যলোক সুরুচির কালে তাহার অর্দ্ধেকগুলি খাইতে সক্ষম কি না সন্দেহ। মহামায়া চামুণ্ডা, ক্ষুধারূপে কালা-চাঁদের অন্তরে বোধ হয় চব্বিশ ঘণ্টাই অবস্থিতি করেন। নহিলে দিনে-রেতে অষ্টপ্রহরই তাঁহার সমভাবে ক্ষুধা থাকিবে কেন? এই দ্বিপ্রহরে আকণ্ঠপূর্ণ-অন্নাহার করিয়া উঠিলেন; এমন সময় কেহ যদি কালাচাঁদকে বলেন, "আপনি এখন দুসের রসগোল্লা খেতে পারেন কি?" তিনি হাসিয়া বলেন, "খাইতে পারিলে কি দাও?" উত্তর—"আচ্ছা, কাল প্রাতে আর দুসের অধিক রসগোল্লা দিব।" তখন কালাচাঁদ বলিলেন, "তবে, রসগোল্লা আনো।" আনিবামাত্র অমনি টপাটপ গালে পুরিয়া ১৫ মিনিটের মধ্যে, যেন যাদুমন্ত্রবলে সমস্ত উড়াইয়া দিলেন।

কালাচাঁদের মধ্যাহ্নে সহজ আহার—৮২॥৵০ ওজনের খর-খর পাঁচপোয়া চাউলের অন্ন। যেদিন আহারের উপকরণ অধিক থাকে, সেদিন দুসেরে ঘা দেন। আম দুই চারিটা বা কাঁঠাল দু-চার কোয়া—তিনি কখন খান না। তিনি বলেন,—"কাঁঠাল খাইতে হয়, দু আড়াইটা বড় কাঁঠাল একলা গোটা খাবো। যদি আম খাইতে হয়, তবে আসনের সম্মুখ-ভাগটা আঁটি এবং খোলায় মানুষ সমান উঁচু হইয়া উঠিবে; ও-সব সামগ্রী অমন অল্পস্বল্প

খেয়ে আমি মুখ নষ্ট করিতে চাহি না।”—এরূপ তাঁহার বুলি ছিল! তিনি পিষ্ঠক-পিঠা খান ক'হন হিসাবে। কলা খান, কান্দি কান্দি। পায়স খান, ডাবা-ডাবা।

কাজেই কালাচাঁদ দুইটীমাত্র সন্দেশ দেখিয়া একটু খুঁৎ খুঁৎ-ভাবাপন্ন হন।

যাহা হউক, শুভকার্য্যে আর অধিক বিলম্ব হইল না। অত্যল্প সময়ের মধ্যে সমস্তই উদরগহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইল, মুগের ডালের একটী কণাও পাত্রে পড়িয়া রহিল না।

বেলা দশটা বাজিল। কালাচাঁদ সেই ঘরে চৌকির উপর বসিলেন; খড়ম পায়ে দিবার দায়ে বাহিরে আসিতে সাহসী হইলেন না। ইত্যবসরে কর্ত্তা কয়েকজন মহুরি-পরিবেষ্টিত হইয়া আদালতের কাগজপত্র, অভিনিবিষ্ট চিত্তে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। শীঘ্রহস্তে দস্তখত করিতেছেন,—লেখায় যেন ঝড় চলিয়া যাইতেছে।

১১টা বাজিল। অল্পক্ষণ পরে বাটির ঝী ইঙ্গিতে সরু-সুরে সংবাদ দিল,—স্নান হইয়াছে! অল্পক্ষণ পরে কর্ত্তা কাগজপত্রের কাজ সারিয়া উঠিলেন। কালাচাঁদের কক্ষের নিকটবর্ত্তী হইয়া, স্নেহের ভাব দেখাইয়া কর্ত্তা বলিলেন,—“এস ভায়া! ভাত খাওসে—”

কালাচাঁদের ধারণা ছিল, যখন জলখাবার বাহিরে দিয়াছে, তখন ভাতও বাহিরে দেওয়া সম্ভব।

এই ভাবিয়া এতক্ষণ কিছু নিশ্চিন্ত মনে তিনি নানাকথা চিন্তা করিতেছিলেন। যদি ঠিক বুঝিতেন যে, তাঁহাকে অন্দরেই অন্নাহার করিতে হইবে, তাহা হইলে খড়ম-পদে গমনরূপ চিন্তাই

তাঁহার হৃদয়ে একাধিপত্য লাভ করিত,—এতক্ষণ হয় অধীর হইয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেন। সে কি কম লজ্জার কথা! বাহিরে পুরুষগণের নিকট পড়িলে বরং পরে আছি, অন্দরে মেয়ে-দল-মাঝে চিৎপাত হইলেই একেবারেই গেছি!! পতনে পুরুষের হাসি বরং সহ্য হয়, কিন্তু মেয়ে-মুখের সেই অর্দ্ধস্ফুট, অর্দ্ধলুক্কায়িত, অর্দ্ধ-অবগুণ্ঠনাবৃত,—সেই ফিক্‌-ফিক্‌ অনন্ত হাসি কখন সহ্য হইবার নহে। সেই বিষম ব্রহ্মাস্ত্রে একেবারেই বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইবে।

তাই ঠাকুরদাদার "ভায়া, বাড়ীতে এস"—ডাক শুনিয়া কালাচাঁদের চক্ষু স্থির হইল। সর্ষপ-পুষ্পদ্রষ্টা, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, 'নযযৌ নতস্থৌ'—কালাচাঁদের কণ্ঠ হইতে কিছুক্ষণের নিমিত্ত কথা নিঃসরণ হইল না। হায়! বিধি আমার ললাট-লিপিতে কি এই লিখিয়াছিলেন যে, অদ্য আমি মহিলাকুল মাঝে ভূপতিত, ভূলুণ্ঠিত হইয়া, ভবধামে ভূতাধম প্রতীয়মান হইব? আমার দেহ এখনি ভস্মীভূত হউক না কেন?

তেজস্বী কালাচাঁদের অঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। কলেবর ঘর্ম্মাক্ত হইল। জিহ্বা শুকাইল!—চক্ষুও স্থির হইল।

প্রথম-ধাক্কা সামলাইয়া কালাচাঁদ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ভাবিলেন, "কপালে যা থাকে,—হবে,—ঠাকুরদাদা যা বলেন, বলিবেন,—আমি মোদ্দা খালিপায়েই যাইতে যাইব,—কিছুতেই খড়ম পায়ে দিব না,"—এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, কালাচাঁদ শূন্যপদে গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

ঠাকুরদাদা। ভায়া, তোমার খড়ম কি হলো,—কৈ পায়ে দাও নাই?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে আজ্ঞে—খড়মটা একটু পায়ে ছোট হয়, তাই পায়ে দি-নাই,—

পশ্চাৎ পশ্চাৎ একজন ভৃত্য আসিতেছিল। ঠাকুরদাদা তাহার দিকে তাকাইয়া বলিলেন,—"অরে ভূতো! আজই একজন খড়মওয়ালা ডেকে নিয়ে এসে কালাচাঁদের পায়ের মাপ দিয়ে একজোড়া খড়ম ফরমাস্ দে'ত—"

ভৃত্য আদেশ-পালন করিব বলিয়া অঙ্গীকার করিল। কালাচাঁদ দেখিলেন, ঘোর বিপদ উপস্থিত। পায়ে হয় নাই বলিয়া কাজ ভাল করি নাই। এবার ফরমাসে-খড়মের চিরস্থায়ী দশসালা বন্দোবস্ত হইল! তখন আর কোন ওজর-আপত্তি থাকিবে না। তখন অষ্টপ্রহরই ত্রিশূন্যে খড়মের উপর বেড়াইতে হইবে।

যাইতে যাইতে এই দুর্ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে একটা মহাহ্লাদের কথা কালাচাঁদের মনোমধ্যে উদিত হইতেছিল। সেটা—আহার। আহার বিষয়ে তাঁহার অরুচি স্বভাবত কম ছিল। জলখাবারের নমুনা দেখিয়া তিনি মধ্যাহ্নের অন্নাহারটা কিরূপ উচ্চ দরের হইবে, তাহা কতকটা আঁচিয়া লইয়াছিলেন। বিশেষ, গত কল্য হইতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার অন্নাহার হয় নাই।

কলিতে জীবের—প্রধানত বাঙ্গলীর, অন্নগত প্রাণ। কেবল সন্দেশ, মিঠাই, জিলিপি খাইয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। খাসা দই বা ক্ষীরোদ-সমুদ্রে ডুবিয়া থাক, তথাচ ভাতের জন্য তোমার প্রাণ পড়িয়া থাকিবে। ভাতটা এমনি জিনিস। সে ভাত, প্রায় ৪৮ ঘণ্টা গত হইল, কালাচাঁদের উদরে যায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গত পরশ্ব দিন, পতিতপাবনের গৃহে

তাঁহার একবেলা অর্দ্ধাশনের অপেক্ষাও কম আহার হইয়া ছিল; গতকল্য ত দিবাভাগে আদৌ অন্নাহার হয় নাই গভীর নিশীথে গঙ্গাগর্ভ হইতে লাঠি দ্বারা বাঁধাঘাটের লণ্ঠন ভাঙ্গিয়া, লাফাইয়া গমনের পর তিনি যে কোথাও ভাত পাইয়াছিলেন এমন ত বোধ হয় না; তবে মিষ্টান্নে যদি কোথাও মুখ শুদ্ধি করিয়া থাকেন, তাহা স্বতন্ত্র কথা। যাহাই হউক, কালাচাঁদের এখন ক্ষুধা প্রবলা;—এক এক গ্রাসে এক এক পোওয়া অন্ন উঠাইবেন,—ইহাই যেন সঙ্কল্প!

সেই কমনীয় কৃষ্ণ-কান্তি কলেবর, সেই হৃষ্ট-পুষ্ট বলিষ্ঠ-সহিষ্ণু দেহ সেই মদমত্ত ভগদত্তবৎ কারাকক্ষের কালাচাঁদ-কুঞ্জর,—আশায় —অন্নের আশায় উৎসাহিত হইয়া, উৎফুল্লচিত্তে পিতামহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন। সর্ব্ব ভাবনা ভুলিয়া গিয়া, তিনি যেন দিব্যচক্ষে এখন দেখিতে লাগিলেন,—এক সুবৃহৎ অখণ্ড আণ্ট-পাতে প্রফুল্ল-মল্লিকার ন্যায় সাদা ধব্ধবে পর্ব্বত-প্রমাণ অন্নের রাশি সজ্জীকৃত; এক বকুনা কড়ায়ের ডাল পাতের দক্ষিণ-পার্শ্বে টলটল্ করিতেছে; একতাল আলু-ভাতে, মন্দিরের ন্যায় উচ্চ-ভাবে অবস্থিত; ঘুষোচিঙড়ি-মাছ দিয়া এক মালসা কাঁচা আমড়ার টক, একটা গোটা ইলিশমাছ ভাজা, এক হাঁড়ি দই, আড়াই সের গোল্লা এবং এক তিজেল পায়স যথানিয়মে পত্রের শোভাবর্দ্ধন করিতেছে। তাঁহার যেন আরও মনে হইতে লাগিল,—এক তিজেল পায়স ফুরাইতে না-ফুরাইতে পরিবেষ্টা আর এক মালসা পায়স আনিয়া তাঁহাকে জেদ ধরিল,—আর একটু খাইতে হইবে। তিনিও উপ-রোধ এড়াইতে না পারিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে সে মালসাটীও উদরসাৎ করিলেন! আবার উপরোধ, আবার উদর-গহ্বরে পায়স-নিক্ষেপ।

মহাক্ষুধায় প্রপীড়িত কালাচাঁদ, জাগ্রত অবস্থায়, দুই চক্ষু চাহিয়া, দাঁড়াইয়া, পথ চলিয়া যাইতে যাইতে ঐরূপ সুখ স্বপ্ন সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত।

কালাচাঁদ।

তৃতীয় পর্ব্ব—ভূরি-ভোজন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ব্যাপার বৃহৎ। বিষয় গুরুতর। উদ্দেশ্য মহান্। ঘটনা অঘটনীয়।

অদ্য মহাসমারোহে মহোৎসব। যেন মরুৎ-রাজার মহাযজ্ঞ। একশত আট-রকম ভোগের বন্দোবস্ত। ক্ষুধার্ত্ত কালাচাঁদের কামনা ষোলকলায় সম্পূর্ণ হইবে! বড়লোকের বাড়ী দরিদ্র অন্নার্থীর এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

কর্ত্তা এখন বড়লোক;—পণ্ডিত, বিজ্ঞ এবং বলবান্। তিনি যাহা করেন, তাহাই ভাল; যাহা বলেন, তাহাই ভাল; যাহা লেখেন, তাহাই ভাল;—কেননা কর্ত্তা আজ অর্থবান্। কর্ত্তা পণ্ডিত, কেননা অর্থযুক্ত; কর্ত্তা বিজ্ঞ, কেননা অর্থযুক্ত; কর্ত্তা বলবান্, কেননা অর্থযুক্ত। যিনি পণ্ডিত, বিজ্ঞ, বলবান্—তিনিই বড়লোক।

অধুনা এ সংসারে মূলমন্ত্র—অর্থ। তপ, জপ, যাগ, যজ্ঞ—অর্থ। তাল-মান, যন্ত্র-তন্ত্র—অর্থ। ভাব-ভক্তি, প্রেম-প্রণয়—অর্থ। সুখ-শান্তি, সম্পদসৌভাগ্য—অর্থ।—ঈশ্বর—অর্থ।

শ্রীকবিকঙ্কণ চণ্ডীগ্রন্থে লিখিয়াছেন,—

অহঙ্কার তাহার তাবৎ শোভা করে।
কৃপাময়ী লক্ষ্মী যাবৎ থাকে ঘরে॥
তুমি গো কমলা কৃপা নাহি কর যারে।
আছুক অন্যের কাজ দারা মন্দ বলে তারে॥
লক্ষ্মী থাকিলে মান সকল সংসারে।
লক্ষ্মী বাম হলে ভাই কেহ না আদরে।
সেইজন পণ্ডিত মাতা সেইজন ধীর।
যাহার মন্দিরে মাতা তুমি হও স্থির॥

মহাকবি ঘনরাম শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে ঠিক ঐ কথাই লিখিয়াছেন;—

ঈষৎ কৃপায় যাঁর ভূপতি ভিক্ষুক।
পঙ্গু লঙ্ঘে গিরি বাচাল হয় মূক॥
সদা সুখ সম্পদ সভায় সুসম্মান।
রথাদি গো গজ বাজী নর নৌকা যান॥
ভাগ্যবান্ ভারতভুবনে সেই ধন্য।
লক্ষ্মীর চরণে যার ভকতি অনন্য॥
সেই ধনা ধার্ম্মিক ধরণী মধ্যে ধীর।
যবে যার মন্দিরে কমলা হন স্থির॥
সমর-সুধীর বীর স্থির মতিমন্ত।
গণনীয় গায়ক গভীর গুণবন্ত॥
সে হয় সুকৃতী সৎ সজ্জন সংসারে।
কৃপাবতী শ্রীমতী লক্ষ্মীর কৃপা যারে॥
লক্ষ্মীর কৃপার পাত্র জগতে যদি হান।
দরিদ্র সজ্জন কত তাহার অধীন॥

সভায় সম্মান তার সর্ব্বলোকে করে।
বিফল জনম, যার লক্ষ্মী নাই ঘরে॥

কালিদাস লিখিয়াছেন ;—

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ॥

এ কথার অন্য একজন কবি উত্তর দিয়াছেন ;—

একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে।
নূনং ন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী॥

অর্থই সংসারের সারভূত সামগ্রী। ম্লেচ্ছসমাজ, যবনসমাজ, বর্ব্বরসমাজ,—সর্ব্বসমাজেই অর্থ একমাত্র অদ্বিতীয় অধিপতি। কিন্তু হিন্দুর উপদেশ অন্যরূপ। অর্থ অকিঞ্চিৎকর। ক্ষুদ্র-অর্থ নিকৃষ্ট-বণিক্‌জাতিরই গ্রাহ্য, উৎকৃষ্ট-জ্ঞানীর গ্রাহ্য হইতে পারে না। হিন্দুসমাজ-শরীরের জ্ঞানই প্রাণ-স্বরূপ। তাই নগ্নপদ অর্থ-দরিদ্র ব্রাহ্মণের পদধূলি,—মহারাজচক্রবর্ত্তীর মুকুটে সসম্মানে স্থান প্রাপ্ত হয়। তাই মণিকাঞ্চনে, মুক্তাপ্রবালে জ্ঞানী ব্রাহ্মণের স্পৃহা হয় না। তাই বিজ্ঞানময় ব্রহ্মচারী বিলাস-বাস ছাড়িয়া কৌপীনে পরিতৃপ্ত, অগুরুচন্দন ছাড়িয়া চিতাভস্মে প্রফুল্লচিত্ত,—মহামূল্য সুকোমল শয্যা ছাড়িয়া শ্মশানভূমে বৃক্ষতলে সুনিদ্রায় অভিভূত।

কিন্তু কালবশে, যুগধর্ম্মে হিন্দুর সমাজ-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। আজ জ্ঞান-বিজ্ঞান গিরি-গহ্বরে লুক্কায়িত, পাপ-অর্থ পূর্ণ প্রতাপে প্রস্ফুটিত। অর্থ-শশধর শরদাকাশে ষোলকলা বিস্তার করিয়া সদা হাসিতেছেন, জ্ঞান-রাঘব পাতালে মহীরাবণের

গৃহে অবরুদ্ধ হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন! আগুন নিবিয়াছে, ছাই-ভস্মের আধিপত্যকাল উপস্থিত হইয়াছে। সুধা নাই, ভগ্ন-ভাণ্ড পড়িয়া আছে, ; মুক্তা নাই, শুক্তা সাদরে গৃহীত হইতেছে; সার শস্য নাই, কেবল খোষাভূষির কারবার চলিতেছে।

চলুক। তথাচ,—এ ঘোর দুর্দ্দিনেও, হিন্দুসমাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-সমাজ,—আদর্শসমাজ। শ্রীকবিকঙ্কণ যাহাই বলুন, ঘনরাম চক্রবর্ত্তী যাহাই লিখুন,—হিন্দুসমাজের এখনও যা-কিছু অবশিষ্ট আছে, তাহা অন্য সমাজের অনুকরণীয়। হিন্দুসমাজরূপ মহা-অট্টালিকার বালিচূণ খসিয়াছে বটে, খিলান ফাটিয়াছে বটে, কার্ণিস চটিয়াছে বটে, ভিত দমিয়াছে বটে, কবাটে ঘুণ ধরিয়াছে বটে, কিন্তু বনিয়াদ পাকা,—অনন্ত-কালের সাক্ষি-স্বরূপ সমভাবেই অবস্থিত। কাল নিশ্বাসে সে বনিয়াদের অন্তর-বাহির কালো হয় নাই,—বর্ষায় তাহা সিক্ত হয় নাই, শীতে সঙ্কুচিত হয় নাই, গ্রীষ্মে সম্প্রসারিতও হয় নাই,—অনন্ত, কাল অচল অটল,—সদা সমান সমুজ্জ্বল! বৌদ্ধদলপতিগণের বীর্য্যবান্ বিষম মন্ত্রৌষধ গুণে সে বনিয়াদ উড়িয়া যায় নাই, মুসলমানের সাত-শত-বর্ষ-ব্যাপী তীক্ষ্ণ-ধার তরবারিপ্রহারেও তাহার ঈষৎ চূণ খসে নাই,—আর, ইংরেজ অবিরত অগণিত তোপ দাগিয়াও, সে মহাভিত্তিকে, একচুল পরিমাণও টলাইতে সক্ষম হন নাই।

ভিত্তি এরূপ দৃঢ়, এত পাকা বলিয়াই বড়কর্ত্তা আজও ব্রাহ্মণ দেখিলেই প্রণাম করেন, ব্রাহ্মণ-গোমস্তাকে 'সেবকশ্রী' পাঠ লেখেন, স্নানান্তে গায়ে নামাবলী দেন, সন্ধ্যার পর মালা জপেন;—তাই আজও বড়কর্ত্তার গৃহে ভিখারী মুষ্টিভিক্ষা পায়, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়, বিষ্ণু-সেবা হয়;—তাই আজও বড়কর্ত্তার নাকে তিলক, গলায়

মালা, বুকে ছাপ্। তাই বড়কর্ত্তা আজও আহারের পূর্ব্বে পদ-যুগল ধৌত করেন, চর্ম্মপাদুকার পরিবর্ত্তে খড়ম পায়ে দেন, ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া অন্ন-ব্যঞ্জনাদি মুখে তুলেন মহীরুহ শুকাইয়াছে,—কিন্তু মূল এখনও মরে নাই!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পৌত্র কালাচাঁদের জন্য, আজ একশত আট রকম ভোগের বন্দোবস্তই হউক, আর পাঁচটা খানসামাতেই কালাচাঁদকে ধরিয়া তেল মাখাইয়া দিউক, কর্ত্তা কিন্তু একপুরুষে বড়লোক! এগার বৎসর বয়সে হুগলীতে আসিয়া সদরামিনের বাসায় তিনি পেট-ভাতায় তামাক সাজিতেন; ছেলেপিলে কোলে করিতেন; এবং মেয়েদের ফরমাস খাটিতেন। ছেলেটিকে চালাক-চোস্ত দেখিয়া সদরামিন-মহাশয় তাঁহাকে ভালবাসিতেন, মক্স করিতে বলিতেন, জমাখরচ রাখিতে শিখাইতেন। ক্রমে মনিবের অনুগ্রহ বাড়িল। আপন ছেলেদের সঙ্গে তাঁহার কাপড় কিনিয়া দিতেন; পাতে একখানি মাছ পড়িয়া থাকিলে বলিতেন—'হরিকে দিও'; পূজা পার্ব্বণে, দোলে-চড়কে বা রথে-রাসে হরিকে উৎসব দেখিবার পয়সা পুরস্কার করিতেন।

বাল্যকাল হইতেই হরিতারণ হিসাবী,—একটী পয়সা মা-বাপ্। দুই-চারিটী যা পয়সা পাইতেন, তাহাই জমাইতেন;—জমাইয়া-জমাইয়া একটী টাকা পূর্ণ হইলে, তাহাই আবার অপরকে ধার দিতেন। নূতন কাপড় পাইলে, তিনি তাহা সহসা পরিতেন

না,—পুতু-পুতু করিয়া তুলিয়া রাখিয়া, শেষে তাহা লুকাইয়া বিক্রয় করিয়া ফেলিতেন। ক্রমশ বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত হরিতারণ সদরামিনের বাসায় হাটবাজার করিবার ভারও প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে বিলক্ষণ দু-পয়সা রোজগার চলিতে লাগিল। কিন্তু সদরামিন তাঁহার বাজার-করা-কার্য্যে সন্তুষ্ট ছিলেন। কারণ, হরিতারণ ঘুরিয়া-ফিরিয়া, দেখিয়া-শুনিয়া, কষিয়া-মাজিয়া, এত সস্তাদরে জিনিসপত্র কিনিতেন যে, তাহাতে টাকা-প্রতি দু-গণ্ডা পয়সা রাখিলেও, সদরামিনের কোন লোকসান বোধ হইত না। এই-রূপে তিন বৎসর অতীত হইল। হরিতারণের তখন বয়ঃক্রম চৌদ্দ বৎসর। এ পর্য্যন্ত তাঁহার মাহিনা ছিল না,—কেবল খোরাক-পোষাক! মাহিয়ানা না থাকুক,—সুদে আসলে তিন বৎসরে তাঁহার রোজগার তখন প্রায় ৫০০৲ টাকা হইয়াছে!

একদিন বালক হরিতারণ অম্বুরী-তামাক সাজিয়া কলিকায় ফুঁ দিতে-দিতে ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া সদরামিনের সম্মুখে উপস্থিত হইল;—তাঁহার হাতে হুঁকা দিয়া বিনীতভাবে হেঁট-মুখে ছল্‌ছল্‌ চোখে কাছে দাঁড়াইয়া রহিল, নড়িল না। বাজারের সর্ব্ব-প্রধান দোকানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তামাক;—হরিতারণ কর্ত্তৃক সযত্নে সাজা; তার উপর আবার হুঁকায় নূতন জল-ফেরা। দু-চারিবার টানিতেই সদরামিনের শরীরগৃহ 'দেল্‌খোষ-বাগ' হইয়া উঠিল। তিনি হরিতারণের মুখের দিকে ধুঁয়া ছাড়িয়া, খোষ মেজাজে জিজ্ঞাসিলেন,—"কি হে হরি!—খবর কি? আজ তোমার মুখ এত শুক্‌নো কেন?"

হরি ইতিপূর্ব্বে তিন দিন স্নান করে নাই, তেল মাখে নাই; আধপেটা খাইয়াছে এবং তিন দিনে অন্তত ছয়বার গোপনে শুধু

শুধু ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া গা ঝাড়িয়াছে। প্রভুকর্তৃক এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া হরিতারণ কাঁদ-কাঁদ সুরে উত্তর দিল;—"বাড়ী থেকে পত্তর এসেচে, এবার জমীতে ধান হয় নাই। মা খেতে পাচ্ছেন না—তা কাকে আর এ দুঃখ জানাই? আপনিই মা-বাপ।"

সদরামিন। তবে এখন তোমাদের চল্‌চে কিসে?

হরি। তা, এই ধার্-টার্ ক'রে মা চালিয়েছেন,—কিন্তু আর চলে না। কোন দিন আহার হয়, কোন দিন হয় না, তা, আপনি একটা কিনারা না ক'রে দিলে,—আমি আর দাঁড়াই কোথা?—মাসে যদি দুটী টাকা ঘরে পাঠাতে পারি, তবু মায়ের কতক দুঃখ ঘুচে!

সেইদিন হইতে সদরামিন, হরিতারণের মাসিক ২৲ টাকা মাহিনা বরাদ্দ করিয়া দিলেন; এবং তিনি হরিতারণের ভবিষ্যৎ ভালোর জন্য স্বীয় সেরেস্তাদারকে ডাকাইয়া বলিলেন, "হরি আমার বাসায় খাইবে, থাকিবে; আর তোমার বাসায় প্রত্যহ গিয়া লেখাপড়া শিখিবে; ছোকরাটি ভালো;—গরীবের ছেলে,—ইহাকে একটু যত্ন করিয়া আদালতের কাজ কর্ম্ম শিক্ষা দিও।"

সদরামিন প্রভু; সেরেস্তাদার ভৃত্য,—প্রভুর আজ্ঞা ভৃত্য 'অবশ্য পালন করিব' বলিয়া স্বীকৃত হইল।

হরিতারণের বড়ই মজা হইল। সদরামিনের বাসায় খায়, থাকে, উপরি রোজগার করে; এবং সেরেস্তাদারের বাসায় আদালতের কাজ-কর্ম্ম শিখে, পাঁচটা পাঁচরকম দেখে-শুনে, এবং কিছু কিছু উপার্জ্জনও চলে। হরিতারণের হাতের লেখা বেশ পরিষ্কার,—সেরেস্তাদার সে লেখা বড় পছন্দ করিতেন। ক্রমশঃ অনেক কাজ কর্ম্ম তাহার দ্বারা তিনি করাইয়া লইতে লাগিলেন।

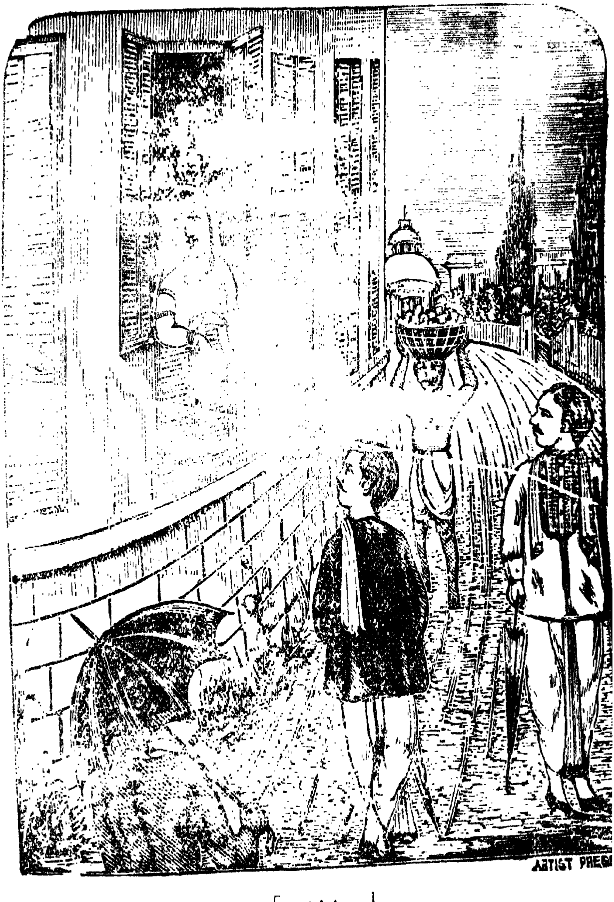
শেষে তাহার মাসিক ২১ টাকা বেতন তিনি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন।

এইরূপে হরিতারণের উনিশ বৎসর বয়স হইল।

সেরেস্তাদার বৃদ্ধ দাঁত ফোক্‌লা। চুলগুলি শণের নুড়ি। গাল দুটি চড়িয়ে-ভাঙ্গা। জাতিতে সুবর্ণ-বণিক্। তাঁহার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী সু-কিঞ্চিৎ প্রখরা। গলার আওয়াজ গুরুগম্ভীর,—সে চিঁহিঁহিঁ চীৎকার-শব্দে পথের পথিক চমকিয়া উঠে। রঙ্গিণী আবার সদাই রাগে ভরা,—সংসারের কিছুই যেন পছন্দ হয় না। বৃদ্ধ-সেরেস্তাদার তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে যথাসর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াও, একটী দিনও তাঁহার মন পান নাই বিশ ভরির ডায়মন-কাটা নিরেট বালা সযত্নে তৈয়ার করাইয়া সেরেস্তাদার প্রিয়ম্বদা প্রেয়সীর কর-কমলে স্থাপন করিলেন। প্রাণপ্রিয়া অমনি সে বালাকে হাতে করিয়াই বলিলেন,—"এ যে হালকা বালা,—এ নিশ্চয় নিরেট নয়—আমার সঙ্গে তোমার প্রবঞ্চনা!—ভাল আমার পোড়া অদেষ্ট রে!—" বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ অমনি তিনি সেই বালা টান মারিয়া দূরে ফেলিয়া দিলেন। এইরূপ ব্যাপার সদাই ঘটিত সেরেস্তাদার পত্নীভয়ে সদা থরহরি কম্পমান—সদা ত্রাহি মধুসূদন!

প্রিয়ম্বদা পত্নীর আর একটী সদ্‌গুণ ছিল। তিনি কিছু অধিক মাত্রায় বিবেকবতী হইয়াছিলেন,—সুতরাং লৌকিক লজ্জারূপ পক্ষীটী তাঁহার দেহপিঞ্জর কাটিয়া উড়িয়া, নিরুদ্দেশ হইয়া পলাইয়াছিল। অতএব কটির কসন, অঙ্গের বসন স্বভাবতই শিথিলভাব ধারণ করিয়াছিল। অনেক সময়, কি স্ত্রী, কি পুরুষ—সকলেরই নিকট তাঁহার সমভাব। উত্তমাঙ্গের অবগুণ্ঠন মেঘ উন্মোচনপূর্ব্বক পূর্ণমুখচন্দ্রখানিকে গবাক্ষরূপ আকাশে তিনি সদাই উদিত করিয়া রাখিতেন। তখন তাম্বূলরাগে তাঁহার অধর রঞ্জিত হইত, হাসি-

প্রিয়ম্বদা-পত্নীর বিবেক-ভাব।



জোৎস্নায় রাজপথ আলোকিত হইত, আঁধিঠারে পর-পুরুষের পাগল-প্রাণ আকৃষ্ট হইত! তখন কেবল,—

অনিমিষে বিনোদিনী হেরিছে বিনোদ।
বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ॥
বিপরীত বিপরীত উপমা কি দিব।
ঊর্দ্ধে কুমুদিনী নিম্নে কুমুদবান্ধক॥

হরিতারণ কথঞ্চিৎ খর্ব্বাকৃতি উনিশ বৎসর বয়স হইলেও, তখন দেখিতে ১৪ বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হইত না। এ-দিকে আবার হরিতারণ, সদরামিন মহাশয়ের বড় প্রিয়-পাত্র; সুতরাং সেরেস্তাদারের অতি-বড় প্রিয়-পাত্র। কাজেকাজেই সেরেস্তাদারের সদর-অন্দর, ভিতর-বাহির—সকল অংশেই হরিতারণের স্বাধীন-ভাবে গতিবিধি ছিল। কালক্রমে এই স্বাধীনতা ভাব হইতে প্রিয়ম্বদাপত্নীর সহিত হরিতারণের সাম্যভাব সংস্থাপিত হইল। সাম্যের পর মৈত্রীভাব। তৎপরেই উদ্ধার। উপসংহারে মুক্তি। সুতরাং অচিরে বৃদ্ধ সেরেস্তাদারের অপঘাত মৃত্যু ঘটিল। কেহ বলিল সর্পদংশন তাঁহার মৃত্যুর কারণ;—কেহ বলিল দুগ্ধের সহিত অজ্ঞাতসারে বিষ-পানই তাঁহার মৃত্যুর কারণ;—কেহ বলিল, গলায় রজ্জুবন্ধনই তাঁহার মৃত্যুর কারণ। ফল-কথা, যিনি যাহাই বলুন,—সেরেস্তাদারের মৃত্যু নিশ্চয়ই হইল।

এই মৃত্যুতে হরিতারণ কতই কাঁদিল, কতই বিলাপ করিল, কতই ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল।

সদরামিন, হরিতারণকে বলিলেন,—"দেখ, হরি!—আমার ইচ্ছা তুমি সেরেস্তাদারী চাকুরীটা লও,—একটা দরখাস্ত কর।

তুমি যদিও এখন ছেলে-মানুষ,—আপাততঃ একজন ভাল-লোক তোমার কাছে আমি রেখে দিব—"

হরিতারণ ক্রন্দনের সুরে কাঁপিতে কাঁপিতে উত্তর দিল,—"হুজুর মা বাপ,—যা বল্ছেন, তাই কত্তে হবে! কিন্তু আমি অন্ততঃ তিনমাস কাল সেরেস্তাদারের চাকুরিটি নিতে পারবো না—অন্ততঃ তিন দিন অতীত হয় নাই,—তাঁর কথা মনে পড়লে আমার দুই চক্ষু জলে ভেসে যায়,—তাঁর আসনে ব'সে আমি কেমন ক'রে চাকুরী করবো—আহা! তেমন লোকটী আর দেখ্তে পাবো না;—তিনি অতি মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন—"

সদরামিন। বালকের কথা শুনিয়া বড়ই প্রীত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—ছেলেটীরত বড়ই চমৎকার স্বভাব! প্রকাশ্যে বলিলেন, "দেখ, হরি!—তুমি যা বল্ছো তা সত্য বটে, কিন্তু এ সরকারী চাকুরী ত খালি থাকিবার নহে;—তুমি এখনি ইহা গ্রহণ কর।"

হরিতারণ। আপনি যা বল্ছেন তাই করবো—কিন্তু এক আমার আবেদন আছে। আমি যতদিন এ চাকুরী করিব, ততদিন মাহিনার অর্দ্ধেক আমি সেই সেরেস্তাদারের পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণার্থে প্রদান করিব।

সদরামিন মনে মনে বলিলেন, "সাধু সাধু!"

হরিতারণ সেরেস্তাদার হইলেন; স্বতন্ত্র বাসা করিলেন; মাহিনার অর্দ্ধেক (সদরামিনকে দেখাইয়া) প্রতি মাসে প্রিয়ম্বদা-পত্নীকে দিতে লাগিলেন; এবং নাথ-হীন গৃহস্থের বাটীতে প্রত্যহ একবার দিবসে প্রকাশ্য তত্ত্বাবধানের জন্য,—স-নাথ-করনের জন্য যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন! চারিমাস পরে হঠাৎ একদিন

শুনা গেল, প্রিয়ম্বদাপত্নীর গৃহে হাপ-ডাকাতি হইয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইয়াছে।

হরিতারণ পরদিন প্রাতে আহা! আহা!—হায়! হায়!—মরি মরি!—করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপায় নাই,—চোর পলাইয়াছে। ডাকাতির কিছু দিন পরে, প্রিয়ম্বদার ঘরে রাত্রে ইট, পাটখেল পড়িতে আরম্ভ হইল;—কোন দিন বা আস্ত কাঁচা মড়ার মাথা উঠানে দৃষ্ট হইতে লাগিল। তখন অগত্যা প্রিয়ম্বদা, 'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' ভাবিয়া, কলিকাতায় আসিয়া অবাধ-বাণিজ্যে প্রাণ-মন-দেহ অর্পণ করিলেন। হরিতারণ, নিষ্কণ্টক হইলেন।

দেখিতে দেখিতে হরিতারণ, সদরামিনের বিশ্বস্ত, প্রিয়তম সেরেস্তাদার হইয়া উঠিলেন। সদরামিন বৃদ্ধ হইয়াছিলেন,—লিখিতে হাত কাঁপিত। সুতরাং হরিতারণ মোকদ্দমার রায় পর্য্যন্ত লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় হইতেই তাঁহার নাকে তিলক, মাথায় টীকি প্রভৃতির কিছু কিছু সূত্রপাত হইল। সময়ে সময়ে তাহার গলদেশে রুদ্রাক্ষ-মালাও শোভা পাইত। অনুগত লোকে বলিতে লাগিল, হরিতারণ স্বয়ং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

সেরেস্তাদার হওয়ার পর, হরিতারণ স্বতন্ত্র বাসা করেন। তিনি অলৌকিক মিতব্যয়ী ছিলেন। তখন সস্তা-গণ্ডা ছিল; সর্ব্বরকমে তাঁহার মাসিক বাসাখরচ মায় কাপড় ১॥৴৹ এক টাকা নয় আনার অধিক হইত না। পৌনে দুই মাস অন্তর ধোবাবাড়া কাপড় কাচিতে দিতেন। একজন প্রতিবেশী দোকানদারের সহিত সবিশেষ প্রণয় জন্মিয়াছিল। বাদি-প্রতিবাদিগণের নিকট হইতে পুরস্কার-স্বরূপ যে সকল সওগাদ পাইতেন, তাহার সমস্তই মুদীকে দিতেন,—ঘরে কিছুই রাখিতেন না। আম, কাঁঠাল, মাছ, দই, সন্দেস, ঘি, চাল,

ডাল—এ সমস্ত উপহার প্রত্যহই মুদীর দ্বারা বিক্রীত হইত। খরিদদারের অসুবিধাহেতু যেদিন মুদী মাছ লইত না, সেদিন তিনি পাড়ার ইতর-শ্রেণীর লোককে বাধ্য রাখিবার জন্য, তাহাদের মধ্যে মাছ বণ্টনপূর্ব্বক বিলাইয়া দিতেন। তৈল-খরচ ভয়ে নিজে কিছুতেই ঘরে মাছ রাখিতেন না। হরিতারণের আহার ছিল,—কেবল খেঁসারির ডাল-ভাতে এবং ভাত। যেদিন খুব সমারোহ হইত,—সেদিন লবণ সংযোগে সু-অম্ল তেঁতুলগোলা পাতের উপর শোভা সম্পাদন করিত। হরিতারণ দণ্ডে দণ্ডে তামাক খাইতেন বটে, কিন্তু একদিনও এক পয়সার তামাক কিনিতেন না। সন্ধ্যার পর নিকটবর্ত্তী একজন উকীলের বাসায় পাশা খেলিতে যাইতেন;—সেখানে তাঁহার হরদম্ তামাক চলিত; খেলা-ভঙ্গে গৃহপ্রত্যাগমনকালে তথা হইতে প্রায়ই দু-ছিলিম তামাক হাতে করিয়া আনিতেন। তাহাতেই তাঁহার প্রাতঃকালটা চলিয়া যাইত।

সেরেস্তাদারী, মান্যের চাকুরী; তথাচ হরিতারণের বাসায় রন্ধনে ব্রাহ্মণ নাই; লোকে টেপাটিপি করিত। হরিতারণ কথায় কথায় প্রতিবেশীমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিতেন,—"আমি স্বপাক ভিন্ন কখন আহার করি না।"

হরিতারণ যে, মোকদ্দমার রায় লিখিতেছেন; তাহা ক্রমশ গোপনভাবে সর্ব্বত্রই প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমশ বাদি-প্রতিবাদিগণ তাঁহার যেন কেনা-গোলাম হইয়া দাঁড়াইল। তিনি মহা-মজায় উভয়-কূল হইতে মধু লুটিতে লাগিলেন। বহু মধু সঞ্চয় করিয়াও তিনি প্রথম পাঁচ বৎসর পরিবারী-চাল ছাড়েন নাই। সেই স্বপাক অন্ন—সেই ১।৴০ এক টাকা ছয় আনায় বাসাখরচ বর্ত্তমান রহিল।

কারণ ছিল, চক্ষু-লজ্জা বল, ভক্তি বল, সম্মান বল,—তাঁহার যাহা কিছু সেই সদরামিনের প্রতি ছিল। পাছে মনিব কোনরূপ সন্দেহ করেন, এই নিমিত্ত তিনি চা'ল-চলন কিছুই বদল করেন নাই। বিশেষ তিনি স্বভাব-কৃপণ। ব্যয়সংক্ষেপই তাঁহার সুখ। এইরূপে ছয় বৎসর অতীত হইলে সদরামিনের মৃত্যু ঘটে। স্বর্ণ-ডিম্ব-প্রসবিনী রাজহংসীর মৃত্যুতে গৃহস্থের কিঞ্চিৎ অর্থ-কষ্ট হয় বটে,—কিন্তু হরিতারণের যেন মহান্ হর্ষোদয় হইল। তাঁহার বুক হইতে যেন শক্তিশেল খসিয়া পড়িল। তিনি সংসার সুখময় দেখিতে লাগিলেন।

নূতন সদরামিন আসিয়া রাজকার্য্য গ্রহণ করিলেন। হরিতারণ, ইন্দ্রের শচীর ন্যায়, তাঁহারই অনুগমন করিতে লাগিলেন। নব-ভূপতির বাসায় প্রাতঃ-সন্ধ্যা দুই বেলা আনাগোনা করিয়া, সম্ভাদরে হাটবাজার করিয়া—দিয়া,—হরিতারণ অল্পকাল মধ্যেই নবপ্রভুর পরম প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন! হাকিমবশের পর তিনি স্বকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন প্রথম—চোটায় টাকা ধার দেওয়া; দ্বিতীয়—বিষয় বা গহনা ইত্যাদি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দেওয়া; তৃতীয়,—কখন স্বনামে কখন বেনামীতে মহাল ডাকা।

অদৃষ্ট যখন যাঁহার ফলে তখন তাঁহার পক্ষে সবই সম্ভব হয়। পাঁচ হাজার টাকার সম্পত্তি, হরিতারণ পাঁচ শত টাকায় কিনিয়া লইতে লাগিলেন। তিনি যে তালুক তিনশত টাকা মুনফা দেখিয়া লইলেন, ক্রমশ তাহার মুনফা তিন হাজার টাকায় দাঁড়াইল। হরিতারণের গৃহে যেন ভূতে টাকা বহিতে লাগিল। কথিত আছে, বার্ষিক বার হাজার টাকা জমীদারীর মুনফা করিয়া, হরি-তারণ সন্দেস জলখাবার খাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, প্রথম

প্রথম জল-খাবার আদৌ তিনি মুখে দিতেন না;—একবেলা রাঁধিয়া দুইবেলা চালাইতেন। ক্রমশ, জল-খাবার হিসাবে তিনি মুড়ি ধরিলেন;—তার পর মুড়কি;—অন্তিমে, দ্বাদশ-সহস্র টাকার বার্ষিক আয়ের পর—প্রত্যহ একজোড়া হিসাবে সন্দেস সুরু করিয়াছিলেন। যখন মুড়কি চলিয়াছিল, তখন হইতেই একজন রাঁধুনে-ব্রাহ্মণ তিনি রাখিয়াছিলেন। সে লোকটী পেটভাতায় রাঁধিত,—এবং আদালতের কাজকর্ম্ম শিখিত। যখন সন্দেস চলিল, তখন তাঁহার অনেক বন্ধুবান্ধব তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া বলিল,—"এ সামান্য মাটীর ঘরে থাকা আপনার আর ভাল দেখায় না!—অন্তত নীচে-উপর চারকুঠারি একটী দালান করুন।"

হরিতারণ। বাপুরে! আমি কত দৌড়ের মানুষ!—আমার বেসাৎ কি? সঙ্গতি কি?—যে, বিদেশে আমি ইঁট পাড়িব? এ ইঁটেল-চণ্ডী ঘরে ঢুকলে কি আর রক্ষা থাকবে!

এইরূপে ক্রমশ নিজগুণে হরিতারণ কালেক্টরীর সেরেস্তাদার হইলেন। তখন আর তাঁহাকে পায় কে? আকাশে শশধর ষোল কলায় হাসিল, নিম্নে কুমুদিনী কামকলায় ফুটিল;—মলয়বায়ু মৃদু-মন্দ বহিল, বসন্তের প্রেমপাখী কুহু-কুহু ডাকিল; হরিতারণ কোটিপতি হইলেন।

প্রচুর অর্থ উপার্জ্জিত হইল, কিন্তু তাঁহার মন প্রফুল্লিত হইল না। তিনি রাজ-সম্মান, সামাজিক সম্মান,—অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

সেই সময় হুগলীতে প্রভূত অর্থব্যয়ে তাঁহার অপূর্ব্ব অট্টালিকা বিনির্ম্মিত হইল। স্বগ্রাম হইতে পরিবারবর্গ আসিল। দাসদাসী নিযুক্ত হইল। সোণা-রূপার হুঁকা, করসী, গুড়গুড়ি তৈয়ার হইল।

সোণা-রূপার থাল, রেকাবী, বাসন, বাটী হইল। পাল্‌কী করিয়া কাছারি যাতায়াত আরম্ভ হইল। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রতি ভক্তি বাড়িল,—দুই চারি টাকা দান-খাতে খরচ পড়িতে লাগিল। ছেলেরা মাহিনা দিয়া স্কুলে পড়িতে আরম্ভ করিল। বার্ষিক পিতৃ-মাতৃ-শ্রাদ্ধে হুগলীর বহুলোক তাঁহার বাসায় পাত পাড়িতে থাকিল।

এইরূপে হরিতারণ সমাজে সম্মানিত হইতে লাগিলেন,—সমাজের একজন হইয়া উঠিলেন।

তখন তাঁহার ধার্ম্মিক হইতে সাধ হইল। তিনি স্বদেশে—স্বগ্রামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিলেন; অতিথিশালা বসাইলেন; আশ্বিনে দুর্গোৎসব, ফাল্গুনে দোল, আষাঢ়ে রথ—এ সমস্তই চলিতে লাগিল। কোন কোন বৎসর পৌষমাসে ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বনাত এবং কাঙ্গালীগণকে কম্বল-দান করিতে লাগিলেন।

একটা কথা বলিয়া রাখি, হরিতারণ এইরূপ ধর্ম্মকর্ম্মের প্রথমাবস্থায় শিবভক্ত বা শৈব ছিলেন; ক্রমশ বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব হইলেন। পূর্ব্ব-নির্ম্মিত শিবমন্দির ভাঙ্গিলেন না বটে, কিন্তু শিবপূজার জাঁকজমক কমাইয়া দিলেন। পুরাতন শিবমন্দিরের সম্মুখেই লক্ষ্মী-নারায়ণজীউর এক বৃহৎ নাট-মন্দির উত্থিত হইল। ধূমধামে সেবার বন্দোবস্ত হইল। সে যাহাই হউক, এখন হরিতারণ স্বয়ং প্রায় প্রত্যহ সন্ধ্যায় বস্ত্র-বেষ্টিত হইয়, খোষগল্প করিতে করিতে হরিনামের মালা জপ করিয়া থাকেন; এবং মধ্যে মধ্যে "রাধা রাধা বল," 'হরি হরি বল"—ধ্বনি করিয়া উঠেন।

তার পর, তাঁহার রাজসম্মান পাইবার বাসনা বলবতী হইল। সময়ে-অসময়ে, পর্ব্বে-অপর্ব্বে, বড়দিনে-ছোটদিনে,—জজ, মাজিষ্টর,

এবং কমিশনরের বাড়ী ভেট যাইতে লাগিল। কাঁচামিঠে আম, লিচু কুল, নেবু, কলা,—পাকা ফজ্‌লি আম, বোম্বাই আম, জাম, কাঁঠাল,—পাঁঠা, খাসী, ভেড়া, শাম্পেন,—ফুল মালা তোড়া—ভেট স্বরূপ বাজারের সমস্ত উৎকৃষ্ট সামগ্রীই ঐ ত্রিমূর্ত্তির নামে যথাক্রমে উৎসর্গীকৃত হইতে লাগিল। ভোগে পরিতৃপ্ত হইয়া ত্রিমূর্ত্তি—ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশ্বর,—হরিতারণের উপর করুণা প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহার দ্বারা, সার্ব্বভৌম হিতের জন্য, চাঁদার খাতায় সহি করাইয়া লইতে লাগিলেন। পরমপুরুষ প্রভুত্রয়ের প্রেমে পুলকিত হইয়া হরিতারণ অকাতরে দুই শত, পাঁচ শত, দুই হাজার, দশ হাজার, টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা দিতে আরম্ভ করিলেন। তখনকার শ্রেষ্ঠ সম্মান ছিল,—"রায়বাহাদুর" অচিরে, উপাস্য দেবতাগণের প্রসাদস্বরূপ তিনি 'রায়বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার নামটী দাঁড়াইল,—'রায় শ্রীহরিতারণ দাসদত্ত বাহাদুর'।

অতঃপর হরিতারণ, প্রকৃত বড়মানুষ হইবার জন্য নানারূপ ঢঙ, রঙ, সঙ,—শিখিতে, ফলাইতে, এবং সাজিতে লাগিলেন। তখন একটু মোটা হইবার তাঁহার বাসনা হইল; নেয়াপাতি-রকমের ভুঁড়ি নামাইবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সেই পাকা, পাকসিটে, ঝুনো খর্ব্ব-শরীরে ভুঁড়ি কিছুতেই নামিতে চাহিল না। তবে টাকার গরমে এবং রাজ-ভোগে, যেরূপ একটু নাদুস-নুদুস, চিকণ-চাকণ হইতে হয়, তাহা তিনি পূর্ব্ব হইতেই কতকটা হইয়াছিলেন। কিন্তু স্থূলতা আরও অধিক বৃদ্ধির জন্য, দুধের বরাদ্দ বাড়াইতে,—একজন বিশ্বস্ত বন্ধু উপদেশ দিল। প্রত্যহ পাকি আড়াইসের খাঁটি দুধ খাইয়া বড়-কর্ত্তার পেটের অসুখ হইল। তখন হরিতারণ দুধ হজমের জন্য আফিঙ ধরিলেন। ফল কথা,

শরীর যেরূপ ছিল, সেইরূপই রহিল;—তবে ক্রমে গো-দুগ্ধের মাত্রা কমাইতে হইল,—কেবল, আফিঙ-সেবনটা রহিয়া গেল।

“খাইতে পারি না,”—“এক ছটাক চালের অন্ন রোচে না,”—“একটী সন্দেশ ভাঙ্গিয়া আধখানির একটু কেবল খাইলেই অম্বল হয়।”—এই সব কথা বলাই আহার-বিষয়ক বড়মানুষীর প্রধান লক্ষণ। বড়কর্ত্তাও কালক্রমে বলিতে আরম্ভ করিলেন, “পাঁচ সের পুরাণ মিহি বাদসাভোগ ভিন্ন অন্য চাল খাইলে আমার অসুখ করে। তাই বা কত-কটি? প্রত্যহ নিক্তিধারা ওজন করিয়া আমার জন্য দুই ভরি চাল রন্ধই হয়। বলিব কি,—যেদিন গিন্নি গোপনে দু-ভরি দু-আনা চাল রাঁধিতে দেন, সেদিন আমার পেট কাঁপে।” বস্তুত, বড়কর্ত্তার অগ্নিমান্দ্য হইয়াছিল। বৃদ্ধ-কাল উপস্থিত,—ক্ষুধার হ্রাস অবশ্যম্ভাবী। দেহের বাঁধন ছাড়িতে আরম্ভ হইলে কি আর যৌবনকালের সেই বিষম ক্ষুধা থাকে। বিশেষ, নানা সুচিন্তা-কুচিন্তায় বড়কর্ত্তার মনঃপ্রাণ সদাই জর্জ্জরিত। কাজেই ক্ষুধা নাই। চিন্তাই মনুষ্যের জর। জরে পূর্ণমাত্রায় আহার করিতে কে পারে? তবে বড়কর্ত্তা লোকের কাছে তাঁহার আহারের পরিমাণ যতটা কম বলিয়া পসার বাড়াইতেন, ততটা কম অবশ্যই নহে। বৃদ্ধ ব্যক্তি সাধারণত যেরূপ আহার করিয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ আহার করিতেন। তবে তিনি এটা-ওটা-সেটা পাঁচ প্রকার ব্যঞ্জনাদি খাইতেন বলিয়া, অন্নের মাত্রা কিছু কম হইয়াছিল। একটা কথা বলিয়া রাখি,—কালে-ভদ্রে কাচিৎ কোথাও নিমন্ত্রণে, অথবা স্বগৃহে, কোন বিশেষ বন্ধুবান্ধবের সহিত খাইতে বসিলে, তিনি গোড়া হইতেই,—“আর না,—আমাকে আর দিও না, আমি কিছুই খাইতে পারি না।”—

ইত্যাদিরূপ ধ্বনি করিতেন,—এবং বসিয়া-বসিয়া-বসিয়া যেন বহুকষ্টে যৎসামান্য যৎকিঞ্চিৎ সামগ্রী উদরস্থ করিতেন। বড় লোক হইলে কম খাইতে হয়,—ইতর লোকেই অধিক খায়—ইহাই বড়কর্ত্তার ধারণা।

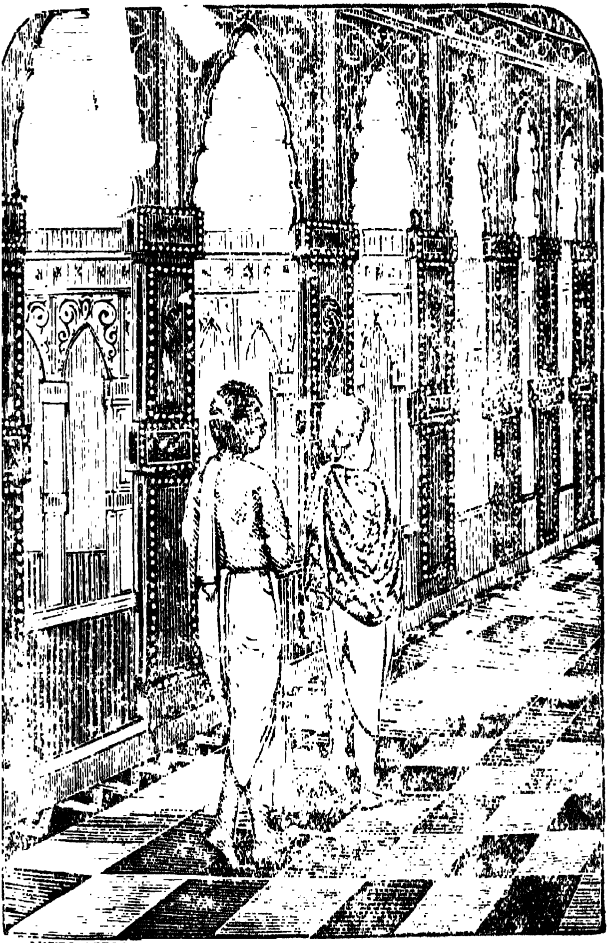
বড়লোক হইলে একটা ব্যারাম থাকা চাই। প্রত্যহ ডাক্তার আসিয়া বক্ষ পরীক্ষা করিয়া প্রেসক্রপ্সন লিখিবে, কবিরাজ আসিয়া নাড়ী টিপিয়া বটিকা দিবে, হেকিম আসিয়া রোগের অস্থ দেখিয়া-শুনিয়া যাইবে—তবেত বড়লোক! সুতরাং বহুদিন হইতে বড়কর্ত্তা একটী রোগের অন্বেষণ করিতেছিলেন,—খুঁজিয়া পান নাই। ক্রমশ, কদাচিৎ কখনো তাঁহার "অম্বল" হইতে লাগিল। তিনি এই সুযোগ পাইয়া রাষ্ট্র করিয়া দিলেন, "আমার অম্বল-শূল ব্যাধির উপক্রম হইয়াছে।"

এইরূপে কালক্রমে রায় শ্রীহরিতারণ দাস দত্ত বাহাদুরের বড়-মানুষত্বের কোন উপকরণই অসম্পূর্ণ রহিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এককালের পেটভাতায়-তামাক-সাজা হরিতারণ আজ প্রকৃত-প্রস্তাবে খাঁটি বড়লোক হইয়া উঠিয়াছেন। জাঁক-জমকে বাহ্যাড়ম্বরে তাঁহার গৃহ পূর্ণ। ক্ষুধানলে দেহ দগ্ধ হইতে থাকিলেও, কালাচাঁদ সে ঐশ্বর্য্য না দেখিয়া থাকিতে পারিলেন না। ঠাকুর-দাদার সঙ্গে যাইতে যাইতে কালাচাঁদ দেখিলেন,—অন্দর-বাটী চকমিলান,—সাদা চুণকাম সূর্য্যের আভায় ঝকঝক করিতেছে।

ঠাকুরদাদার অন্দরমহল



প্রত্যেক খিলানের উপর কোথাও গণেশমূর্ত্তি, কোথাও হরগৌরী-মূর্ত্তি, কোথাও রাম রাজা, কোথাও সীতাহরণ। সারি সারি চারিদিকের পাথরের থামে সবিস্তারে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে;—বেদব্যাস শ্রীমদ্ভাগবত রচনা করিয়াছিলেন। এইক্ষণে—চিত্রকর এবং ভাস্কর উভয়ে মিলিয়া সেই রচনাকে চিত্রাকারে সজীব করিয়া রাখিয়াছে।

সর্ব্বদিক্ সুপ্রসন্ন। সমীরণ সুখস্পর্শ হইয়া মন্দ মন্দ বহিতেছে। সরোবর কমলদলে শোভমান! অলিকুল মধুপানে আকুল হইয়া গুনগুনরবে গান করিতেছে। দেব ও ঋষিগণ আনন্দে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন। এমন সময় কংসের কারাগারে দেবকীর গর্ভে, ভগবান্ হরি ঐশ্বর্য্য-রূপে আবির্ভূত হইলেন। সেই বালক অতি অদ্ভুত। তাঁহার লোচন প্রফুল্ল কমলতুল্য, চতুর্ভুজ, শঙ্খ-চক্রগদাপদ্মধারী; বক্ষে শ্রীবৎস চিহ্ন; গলে কৌস্তুভমণি; পরিধান পীত বসন; বর্ণ নিবিড় জলদের তুল্য শ্যাম। ভগবানের এই মূর্ত্তি দেখিবামাত্র বসুদেব এবং দেবকী বিস্ময়-উৎফুল্ল নয়নে, কৃতাঞ্জলি-পুটে তাঁহার স্তব আরম্ভ করিয়াছেন। প্রথম স্তম্ভে এই চিত্র।

দ্বিতীয় স্তম্ভে কালাচাঁদ দেখিলেন, ভগবান্ যোগ-মায়াবলে দুই-হস্ত-পদ-বিশিষ্ট প্রকৃত বালক হইয়াছেন, বসুদেব তাঁহাকে কোলে লইয়া কংসভয়ে কারাগার হইতে পলাইতেছেন; সূতিকা-গৃহের বৃহৎ কপাট, লৌহ-কীলক, যেন আপনাআপনি খুলিয়া যাইতেছে। দ্বারপাল এবং পুরবাসিগণ—সকলেই যেন ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়াছে। সেই স্তম্ভে আরও একটী চিত্র আছে। বসুদেব, শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া তরঙ্গভঙ্গময় ফেনিল

যমুনা পার হইতেছেন; নব-নীল-নীরদ ঘন-ঘোর বর্ষণ করিতেছে;—স্বয়ং অনন্ত মহা-ফণা বিস্তার করিয়া,—ছত্ররূপে জল নিবারণ করিতেছে পারিতঃ বসুদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। এই ছবি দেখিয়া কালাচাঁদ ভাবিলেন,— কি রকম গাঁজাখুরি? সাপে চক্র ধরিয়া ছাতার স্বরূপ হইয়াছে! বড় মজা'ত!

তৃতীয় স্তম্ভে চতুর্থ চিত্র। মায়াবিনী পূতনা পরমা সুন্দরী রমণী হইয়াছে। তাহার কেশকলাপ প্রফুল্ল মল্লিকামালায় বিভূষিত; নবীন নধর নিতম্বে মেদিনী লজ্জা পাইতেছে; পীনোন্নত পয়োধরভারে সেই কামিনী যেন থর থর কাঁপিতেছে; কটাক্ষে যেন মুনির মন হরণ করিতেছে; সে শিশু শ্রীকৃষ্ণকে কোলে লইয়া দুর্জ্জয় গরল-বিলেপিত স্তন পান করিতে দিয়াছে। ভগবান যেন মহাক্রুদ্ধ হইয়া গাঢ়-নিষ্পীড়নপূর্ব্বক নিশাচরীর স্তন তাহার প্রাণের সহিত পান করিতেছেন! এ ভাবটী বড়ই চমৎকার। বলিহারি কারিকরের চিত্রকার্য্য !!

চতুর্থ স্তম্ভে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা চিত্র। নন্দপত্নী যশোদা শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করিয়া আদর করিতেছেন। হঠাৎ শিশুকে গিরিশিখর তুল্য গুরু বোধ করিয়া তিনি যেন ভারবহনে অসহিষ্ণু হইলেন। একস্থানে দানব তৃণাবর্ত্ত চক্রবায়ু রূপ ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকে হরণ করিয়া লইয়া উড়িয়া পলাইতেছে। অন্যস্থানে, সেই আকাশ-পথেই শিশু-শ্রীকৃষ্ণ দৈত্যের গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন,—মায়াবী দানব পতনোন্মুখ হইয়াছে।

পঞ্চম স্তম্ভে, কৃষ্ণ-বলরাম হামাগুড়ি দিতেছেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ গোবৎসের পুচ্ছ ধরিয়া আছেন,—বৎস দৌড়িতেছে। কোথাও তিনি একটী বাছুর কোলে করিয়া বসিয়া আছেন। কোথাও

শ্রীকৃষ্ণ দুগ্ধ চুরি করিয়া খাইতেছেন। কোথাও বানরগণকে নবনী বিলাইতেছেন। কোথাও শীকস্থ ভাণ্ড শ্রীকৃষ্ণ নাগাল পান নাই—একটা নল লইয়া আসিয়া সেই ভাণ্ড ছেঁদা করিতেছেন। কোথাও তিনি চুপি চুপি অদোহন-কালে বৎস সকলকে খুলিয়া দিয়া গাই পিয়াইয়া দিতেছেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ মাটী খাইয়াছেন,—যশোদা তাঁহাকে হাঁ করিতে বলিয়াছেন। যশোদা বিস্ময়ে পুত্রের মুখাভ্যন্তর নিরীক্ষণ করিতেছেন। কোথাও শ্রীকৃষ্ণ নোড়া লইয়া দধি ভাণ্ড ভাঙ্গিতেছেন। কোথাও যশোদা তাঁহাকে বন্ধন করিতেছেন;—কিন্তু দড়ীতে কুলাইতেছে না বলিয়া, মাতা বড়ই অপ্রতিভ হইতেছেন।

ষষ্ঠস্তম্ভে, শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যমলার্জ্জুন পাত।

সপ্তম স্তম্ভে, বালকবৃন্দসহ বনে শ্রীকৃষ্ণের গো চারণ।

অষ্টম স্তম্ভে, অঘাসুর সর্প-শরীর ধরিয়া বৎসপাল গিলিতেছে।

নবমে, কালিয়দমন। এখানে চিত্রকর চিত্রকার্য্যের চরমোৎকর্ষ সাধন করিয়াছে! মহাসর্প রোষভরে চক্ষুদ্বারা যেন গরল উদ্গিরণ করিতেছে; বিষযুক্ত জিহ্বাদ্বারা অবিরত চোয়াল চাটিতেছে; আর, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার মস্তকোপরি নৃত্য করিতেছেন!

দশমে, বস্ত্রহরণ। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের বস্ত্র লইয়া বৃক্ষোপরি বসিয়া আছেন। গোপাঙ্গনাগণ আপন আপন করতল দ্বারা যোনিদেশ আচ্ছাদন করত ভগবানের নিকট বস্ত্র ভিক্ষা করিতেছেন।

একাদশে, শ্রীকৃষ্ণের গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ।

দ্বাদশে, শ্রীকৃষ্ণের মহারাস। অবলা গোপীগণ মণ্ডলরূপে অবস্থিতা; শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের দুই-দুই-জনের মধ্যস্থলে একরূপভাবে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, এবং উভয় পার্শ্বস্থ দুই-দুই-জন গোপীর গলদেশ

এরূপভাবে আলিঙ্গন করিয়াছেন যে, গোপাঙ্গনাগণ প্রত্যেকেই তাঁহাকে স্ব স্ব নিকটস্থ দেখিতেছে এবং প্রত্যেকেই যেন মনে করিতেছে,—ইনি কেবল আমাকেই আলিঙ্গন করিয়াছেন, যেন ইনি কেবল আমাকেই অন্য গোপী অপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। ধন্য নির্মাণকৌশল! ধন্য কারিকরের অপূর্ব্ব শিক্ষা!

ত্রয়োদশে, কৃষ্ণ-বলরাম মল্লবেশে মহারোষে কংস-সভায় অবতীর্ণ।

চতুর্দ্দশে, কংস-বধ।

পঞ্চদশ স্তম্ভে, রুক্মিণী-হরণ।

এইরূপ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক নানাবিধ চিত্রে সেই পঞ্চদশটী স্তম্ভ অলঙ্কৃত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ক্ষুধার্ত্ত কালাচাঁদ সেই বিরাট ব্যাপার অবলোকন করিয়া প্রকৃতই অবাক্!—এমন যে মহাক্ষুধা তাহাও যেন কিছুক্ষণের জন্য তিনি ভুলিয়া গেলেন। সুন্দর মন্দিরের সেই অভূতপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া মনে করিতে লাগিলেন,—"ঠাকুরদাদা লক্ষপতি, না ক্রোড়পতি? এরূপ শ্বেতপাথরের মেজে, এরূপ শ্বেতপাথরের থাম, তাহার উপর এরূপ কারিকুরি—ইহা'ত সামান্য অর্থব্যয়ে হইবার নহে,—না জানি, ইহা কতলক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছে!—কিন্তু কোথা হ'তে ঠাকুরদাদার হাতে এত টাকা আসিল?"

ধনঞ্জয়-হস্তে খাণ্ডব-বনদাহ হইতে রক্ষা পাইয়া, ময়-দানব ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবের সেই বিশ্ববিমোহন সভা বিচরন করেন। হরি তারণ দ্বারা যাবজ্জীবন-কারাবাস হইতে রক্ষিত হইয়া, একজন উত্তর-পশ্চিম দেশবাসী হিন্দুস্থানী, হুগলীতে ঠাকুরদাদার এই অপূর্ব্ব অন্দর-মহল তৈয়ার করিয়া দেন। ঐ হিন্দুস্থানী, নৌকা করিয়া, কলিকাতা অঞ্চলে আফিম্ চালান দিত। বহুদিন হইতে তাহার এ ব্যবসা চলিতেছিল। এ ব্যাপার গবর্ণমেন্টের কতক কর্ণগোচর হইলেও, গবর্ণমেণ্ট সহজে শীঘ্র চোর ধরিতে পারেন নাই। উক্ত আফিম্-ওয়ালার পুলিশ'ত বশে ছিলই,—এমনও শুনা যায় যে খুব বড় না হউক, মাঝারি-মাঝারি রাজকর্ম্মচারীগণ পর্য্যন্ত তাহাকে সম্মান করিয়া চলিতেন। এ দেশে ক্রমশ এত চোরাই-আফিমের প্রাদুর্ভাব হইল যে, তাহাতে গবর্ণমেণ্টের আফিমের আয় কতক পরিমাণে প্রকাশ্যত কম পড়িল। গবর্ণমেণ্ট তখন সজীব হইলেন। চারিদিকে ধর্-ধর্-ধর্ ধ্বনি পড়িয়া গেল। পাকা পাকা, বড় বড় গোয়েন্দা নিযুক্ত হইল। পুরস্কার পাঁচ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঘোষিত হইল। এমন সময়, একদিন হুগলীর পার্শ্বস্থ গঙ্গা দিয়া বিষম বোঝাই একখানি গমের নৌকা যাইতেছিল। হুগলীর পুলিশ তাহা আক্রমণ করিল। গমের নৌকার দাঁড়-মাঝির সহিত পুলিশের ভয়ঙ্কর দাঙ্গা হইল,—চারিজন কনষ্টেবল হত হইল। শেষে গমের নৌকা ডুবিল। নৌকার আরোহিগণ অন্য একখানি পান্‌সীতে গিয়া প্রাণ রক্ষা করিল। পুলিশ সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইয়া গেল। আবার তীর হইতে পুলিশ-সৈন্য প্রেরিত হইল; পানসীস্থ ব্যক্তিবৃন্দ ধৃত হইল। বিপরীত মোকদ্দমা বাধিল। পুলিস অভিযোগ আনিল,—ঐ গমের নৌকায় হিন্দুস্থানীর বাইশ

মন আফিম্ ছিল। ঐ নৌকার দাঁড়ি-মাঝিগণ সমস্তই লেঠেল; ইহা ব্যতীত চারিজন অস্ত্রধারী দ্বারবান্ ছিল; স্বয়ং আফিমওয়ালাও ঐ নৌকায় ছিল। আমরা গমের বস্তা সরাইবার চেষ্টা করিবা মাত্র মাঝিরা মাথা ফাটাইয়া চারিজন কনষ্টবলের প্রাণবধ করিল। অন্যান্য কনষ্টবলগণ কাজেই পলাইয়া আসিল। আফিমওয়ালা,—মাল নিশ্চয় ধরা পড়িবে বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ নৌকা ডুবাইয়া, আফিম ভাসাইয়া দিল। শেষে আমরা ডুবারি দ্বারা এই চামড়ার থলেটী গঙ্গার ভিতর হইতে পাইয়াছি,—ইহাতে আধমণ আন্দাজ আফিম্ আছে। এইরূপ ৪৫টা চামড়ার থলে ছিল,—আমরা পূর্ব্বেই এসংবাদ পাইয়াছিলাম।

আফিমওয়ালা হিন্দুস্থানী; সে এজেহার দিল, আমি এ বিষয়ের ভাল-মন্দ কিছুই জানি না। আমার নিবাস আগরা। কলিকাতায় আমার কাপড়ের এবং শ্বেত পাথরের কারবার আছে। আমি চলিয়া যাইতে অক্ষম বলিয়া বাঁকিপুর হইতে এই বোঝাই নৌকায় চড়িয়াছি। (বলা বাহুল্য তখন ভারতের কোথাও রেলপথ ছিল না) হঠাৎ এই হুগলীর সম্মুখে গঙ্গায় আমাদের নৌকায় ডাকাত পড়িল। মাঝিরা আত্মরক্ষার্থ প্রথমত চেষ্টা করে। উভয় পক্ষে খানিক খুব লড়াই হয়। শেষে ডাকাত দল বেগতিক দেখিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিল। কতকগুলা মাঝি তীক্ষ্ণ তরবারির প্রহারে প্রাণে মরিল, কতক ডুবিয়া গেল আর কতক বোধ হয় সাঁতার দিয়া পলাইল। নৌকাডুবির পর, আমি গঙ্গায় পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছিলাম, একজন পানসীওয়ালা আসিয়া আমাকে তুলিল। তারপর পুলিস গিয়া আমাকে ধরিয়া লইয়া আসে। ইহাইত ব্যাপার। ইহা ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না।

এইরূপে উভয়পক্ষে বিষম মোকদ্দমা বাধিল। মাজিষ্টার আফিমওয়ালাকে দায়রা সোপরদ্দ করিলেন। সকলে বলিল, এই-বার নিশ্চয় তাহার যাবজ্জীবন কারাবাস হইবে। আফিমওয়ালা হাজতে পচিতে লাগিল। বড়ই কাতর হইল; প্রাণের আশা ছাড়িয়া দিল। আগরা হইতে তাহার ছোট-ভাই মোকদ্দমার তদ্বির জন্য বহু অর্থ লইয়া হুগলীতে আসিল।

ঠাকুরদাদা আফিমওয়ালার তদ্বিরকার হইলেন। তাহাকে অভয় দিলেন। হাজতে তিনি তাহার সহিত দেখা করিলেন। সে, তাহার পা দুটা জড়াইয়া ধরিল। বলিল আমি "আপনাকে লক্ষ টাকা দিব,—আপনি আমাকে খালাস করিয়া দিন।" ঠাকুরদাদা হাসিয়া বলিলেন, "আমি অর্থের অভিলাষী নহি,—আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তিকে মুক্ত করাই আমার উদ্দেশ্য। কেবল মোকদ্দমার তদ্বির জন্য,—উকীল-মোক্তারগণকে দিবার জন্য, সাক্ষিগণের জন্য, জুরিগণের জন্য—যে টাকা আবশ্যক হইবে, তাহা দিলেই হইবে।—আমি স্বয়ং কিছুই চাই না।"

মোকদ্দমার তদ্বির জন্যই প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইল। আফিমওয়ালা খালাস পাইল। তখন সে পুরস্কারেরস্বরূপ ঠাকুরদাদাকে নগদ ৫০ হাজার টাকা গণিয়া দিল এবং দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে মার্বাল-পাথরের চিত্রময় অন্দর মহল তৈয়ারি করিয়া দিল। প্রায় তিন বৎসরে এই বাটী প্রস্তুত হয়। জয়পুর এবং আগরা অঞ্চল হইতে অনেক ভাল ভাল কারিকর এই নিমিত্ত আসিয়াছিল। আফিমওয়ালা অনেক সময় স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়া একার্য্য সমাধা করে।

আফিমওয়ালার ইচ্ছা ছিল,—বহির্ব্বাটীও খুব জমকাল ভাবে

বিনির্ম্মিত হয়। কিন্তু ঠাকুরদাদা তাহাতে রাজী হইলেন না। সদরের শোভা সদাই লোকে দেখিবে,—লোকে হয়ত ভাবিবে, ঠাকুরদাদা বুঝি ঘুষখোর,—ঘুষে বড়মানুষি করিতেছে,—বোধ হয় এই ভাবিয়াই তিনি বহির্ব্বাটীকে অন্দরের ন্যায় অপূর্ব্বভাবে নির্ম্মাণ করিতে স্বীকৃত হন নাই। তবে সদরও নিতান্ত মন্দ নহে,—দালান ফটক, প্রকোষ্ঠ, এ সমস্তই ইষ্টক-নির্ম্মিত এবং যথাসম্ভব শোভা-সমন্বিত। বিশেষ ফটকের বাহার অপেক্ষাকৃত উত্তম। বড় মানুষ হইলে সোজাসুজি যেরূপ গৃহাদি নির্ম্মিত হইতে হয়, সদরবাটী ঠিক সেই ধরণের। কিন্তু অন্দরের কথা স্বতন্ত্র। বড় বড় রাজার ঘরেও সেরূপ অন্দর সচরাচর সহজে দৃষ্ট হয় না।

আবাস-গৃহ এরূপ পাথর এবং ইষ্টকদ্বারা আশ্চর্য্যভাবে নির্ম্মিত হইলেও, সাবেক,পুরাণ সেই ভাঁড়ার ঘরটী এখনও মাটির দেওয়াল-বিশিষ্ট ছিল। ঐ ভাঁড়ার-ঘর পয়মন্ত লক্ষ্মীমন্ত বলিয়া ঠাকুরদাদা উহা ভাঙ্গেন নাই।

ক্ষুধার্ত্ত কালাচাঁদ অন্দর দেখিয়াই মুগ্ধ। কোন কথাটী কহিলেন না। পশ্চাতে নিবদ্ধ-নৌকাবৎ কালাচাঁদ, ঠাকুরদাদা-ষ্টীমারের সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অন্দরের উঠান পার হইয়া, কালাচাঁদ দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়িতে পা দিলেন। পায়ে নরম ঠেকিল,—পিছল বোধ হইল, বেশ আরাম আরামও লাগিতে লাগিল। নীচে চক্ষু নামাইয়া ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিলেন,—এ সিঁড়ি বালিচুণের নহে,—মার্ব্বল পাথরের রচিত। ভাবিলেন, "কাণ্ডখানা কি? বায়কুণ্ঠ ঠাকুরদাদা এত-টাকা উপার্জ্জনের পর কেবল এক সিঁড়িতেই এত টাকা ব্যয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন! এ রহস্য কেহ কি ভেদ করিতে পারেন?"

দ্বিতলে উঠিয়া দেখিলেন, এক দরদালান; মেজে পাথরের।—কালাচাঁদের বোধ হইল, এ পাথরগুলা অপেক্ষাকৃত কিছু কম মূল্যের,—কেন না, ইহা তাঁহার পায়ে পূর্ব্ববৎ মোলায়েম ঠেকিল না।

সম্মুখে এক বৃদ্ধা স্ত্রী আসিয়া দাঁড়াইলেন। লক্ষ্মীরূপিণী সতী—যেন প্রকৃতই পবিত্রতার আধার। পরিধান রাঙ্গাপেড়ে ঘন-বুনান কাপড়। গলায় মালা। নাকে তিলক। সিঁথা, সিন্দূরে সবিশেষ বিলেপিত। হাতে সুবর্ণকঙ্কণ,—লৌহ। ঘোমটা ঈষৎ টানা। বয়স ষাট-পঁয়ষট্টি বৎসরের কম হইবে না।

সেই সতীসাধ্বী,—কালাচাঁদকে দেখিয়া ছল-ছল নেত্রে, ধীরে ধীরে বলিলেন,—"বাছা, এতদিন কি আমাদিগে ভুলে থাকতে হয়?—"

এই কথা বলিতে না-বলিতে বৃদ্ধার চক্ষু দিয়া টস-টস জল পড়িতে লাগিল।

ঠাকুরদাদা, কালাচাঁদকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"ইনি তোমার পিতামহী, প্রণাম কর।"

কালাচাঁদ ঠাকুরদাদার সহধর্ম্মিণীকে,—অর্থাৎ তাঁহার বর্ত্তমান ঠাকুরমাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ হইলেন।

ঠাকুরমা মাথায় হাত দিয়া সুগম্ভীর স্বরে আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"বাছা, একশত বৎসরের হইয়া বাঁচিয়া থাক।"

ঠাকুরদাদা, তীব্রকটাক্ষে সহধর্ম্মিণীর পানে চাহিলেন। সরল-মতি ঠাকুরমা, সে কটাক্ষ দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু কালাচাঁদ তাহা দেখিলেন।

ঠাকুরমা কালাচাঁদের প্রতি চাহিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "বাছা, তুই আমার কেলেসোণা,—তোকে আমি খাওয়াতে মাখাতে পেলেম না—একি আমার কম দুঃখ? ওঁকে সেদিনও বলিলাম, আমার কেলেসোণার খবরটা আনাও। উনি কোথাও তোর সন্ধান পেলেন না। বাছা, তোর আপন ঠাকুরমা এবং আমি—আমরা দুই জনে দুই "যা" ছিলাম। তিনি সতীলক্ষ্মী ছিলেন,—আগেই গেলেন,—কিন্তু বড় কষ্টপেয়ে গেছেন,—তোর বাপ তখন সাত মাসের-টী,—তোর বাপ দুধের জন্য কাঁদ্‌তো,—বেশী দুধ দিতে তখন আমরা কোথা পাব? একদিন ছেলেটী কাঁদ্‌চে—সতীলক্ষ্মীও, ছেলেটীকে কোলে ক'রে কাঁদ্‌চেন। আমি জিজ্ঞাসিলাম,—দিদি তুমি কাঁদ্‌চো কেন? দিদি বল্‌লেন, 'ছেলের দুধে কুলায় নাই,—তাই ক্ষুধায় কাঁদ্‌চে। এই রকম রোজ কাঁদে।' তখন ত আমাদের পয়সা-কড়ি ছিল না যে,—বেশী দুধ রোজ-ক'রে খাওয়াব! আমি বলিলাম, 'দিদি! সেজন্য তুমি কেঁদো না। আমার মাইয়ে খুব দুধ আছে,—

আমি খাওয়াচ্ছি,—ছেলে আর কাঁদবে না।' আমি ছেলেকে মাই দিলাম, ছেলের পেট ভরিল,—কান্না থামিল। সেই দিন থেকে দিদির জ্বর হলো,—তিন দিনের দিন দিদি গঙ্গা পেলেন। বাছা!—কেলেসোণা! সেই দিন থেকে আমার মাই খাইয়ে তোর বাপুকে মানুষ করে ছিলাম। তোর বাপু রাত্রে একদণ্ড মাই ছাড়্‌তো না,—এই আমার বুকের উপর সমস্ত রাত শুয়ে মাই খেতো,—এই রকম পাঁচ বছর ধরে মানুষ করে ছিলাম। সুরেশের বাপকে, তোর বাপ মাই খেতে দেয় নাই,—চারি বছরের ছেলে হয়েও তোর বাপ মাই ছাড়ে নাই। সুরেশের বাপ তখন আড়াই বছরের টী। যদি লুকিয়ে কখন তাকে মাই দিতাম, তোর বাপ যান্‌তে পেরে, অমনি দৌড়ে এসে আমার চুল ধরে টেনে বল্‌তো 'মা, পোড়ারমুখী—বুঝি ভাইকে মাই দিচ্ছিলি'—এই বলিয়া আমার পিঠে, সে গুম্ গুম্ কীল মারিত। তোর বাপের সে মিষ্টি কথাগুলি আজও সব মনে আছে। বাছা! কেলেসোণা তুই তার ছেলে,—তুই আজ যেটের কোলে ২৫ বছরের হয়েছিস্—ঠাকুরমা বলে কি একদিনও তোকে আমার কাছে আস্‌তে নেই? ওঁকে (হরিতারণকে) যত বলি, কেলেসোণাকে একবার নিয়ে এস; উনি তত রেগে বলেন, 'ওর মামারা আস্‌তে দেয় না ত, আমি কি কর্‌বো?' ধন্যি! বাছা তোর পাষাণ শরীর—একবারও কি এ দিকে উঁকি মার্‌তে নেই?—"

এই বলিয়া বৃদ্ধা হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কালাচাঁদ বিনয়নম্রস্বরে উত্তর দিলেন, "ঠাকুরমা, তুমি কেঁদো না, আমি এবার থেকে আস্‌বো।"

ঠাকুরমা। বাছা! তুমি আসা-আসির কথা বল

তুমি এই-খানে বারমাস থাক না কেন? তোমার ত এই ঘর। আমি আর ক-দিনে বাঁচবো? যে-ক-দিন বাঁচি, তোমায় খাওয়াই, মাখাই, দেখি। তোমার একটী বিয়ে দি—নাতবৌ ঘরে আসুক। সুরেশ তোমার চেয়ে প্রায় পাঁচবছরের ছোট। আমার ইচ্ছা ছিল, আগে তোমার বিয়ে পরে, সুরেশের বিয়ে দিব। আজ তিন বছর হোলো, সুরেশের বিয়ে হয়েচে। তখন 'উনি' তোমাকে কত খুঁজ্‌লেন। আমি বলিলাম, কেলেসোণা বড়,—বড় থাকৃতে ছোটোর বিয়ে হতে পারে না। তা, 'উনি ত' তোমাকে কোথাও খুঁজে পেলেন না,—কাজেই সুরেশের আগে বিয়ে দিতে হলো। বাছা এ তোমার ঘর, আমি তোমার ঠাকুরমা,—পর মনে করিও না,—তুমি ঘরের ছেলে ঘরেই থাক। আমি তোমায় বিয়ে দিয়ে তোমাকে ঘরবাসী কর্‌বো—এইটিই আমার সাধ।

ঠাকুর দাদার মুখ রক্তিম-বর্ণে রঞ্জিত হইল। এবারও কালাচাঁদ তাহা লক্ষ্য করিলেন।

ঠাকুরদাদার বক্ষ কাঁপিল, মাথা ঘুরিল, মুখ শুকাইল;—বিচক্ষণ বুদ্ধি কালাচাঁদ তাহাও বুঝিতে পারিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতলে যেটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট গৃহ বলিয়া আখ্যাত, সেই গৃহেই আহারের বন্দোবস্ত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট অর্থে,—ঘরটী খুব লম্বা-চৌড়া, উত্তর-দক্ষিণ খোলা,—ভাল মার্ব্বল পাথরের মেজে; ঝাড়-লণ্ঠন খাটানো; দেওয়ালে চিত্র-করা। এ ঘরটী যেন অন্দরের বৈঠকখানা।

ঠাকুরমা, সুরেশের মা এবং দুইজন পাচিকা ব্রাহ্মণী—এই ঘরে আহারীয় দ্রব্য সাজাইতেছিলেন। তিন জনের স্থান হইয়াছিল; ঠাকুরদাদা, কালাচাঁদ এবং সুরেশ।

সুরেশ, ঠাকুরদাদার পৌত্র,—বংশধর,—সোহাগের সাগর। সুরেশের বয়ঃক্রম উনবিংশতি। ষোল বৎসরে তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহকালে সুরেশ হুগলী-কলেজের ছাত্র ছিলেন।

সুরেশ এখন লেখাপড়া-ত্যাগী, সঙ্গীতে অনুরাগী। সেতার-বাজনা শিখিতেছেন! একজন ওস্তাদকে মাহিনা করিয়া রাখিয়াছেন। সেতারের সহিত সঙ্গত করিবার জন্য একজন বাদকও নিযুক্ত আছে।

সুরেশচন্দ্র, পোষাক-পরিচ্ছদেও বিশেষ মনোযোগী। সাড়ে তিনশত টাকা দিয়া একখানি বালাপোষ তৈয়ারি হইতেছে! মুর্শিদাবাদ হইতে খলিফা আসিয়াছে। সুরেশ ক্রমশ যে এত উন্নতি করিতেছেন, ঠাকুরদাদা সে বিষয় সম্যক্ অবগত ছিলেন না। তবে একথা তিনি শুনিয়াছিলেন, সুরেশ কালে ভদ্রে কচিৎ একটী আধটী গান গাহিয়া থাকেন, কখন বা পূজা-পর্ব্বোপলক্ষে ইংরেজী-ফ্যাশনে টেড়ি কাটেন, মাসান্তে বা কখন একটু আতর-গোলাপ মাখেন। তা,

বয়স-দোষে এমন এক-আধটুকু ঘটিয়াই থাকে। নচেৎ ঠাকুরদাদা যদি জানিতেন যে, সুরেশ পয়সা খরচ করিয়া ওস্তাদ রাখিয়াছে, সাড়ে-তিনশত টাকা মূল্যের বালাপোষ তৈয়ার করিতেছে, তাহা হইলে'ত এতক্ষণ মাথামুড় খুঁড়িয়া, বুক চাপড়াইয়া, বাড়ী ফাটাইয়া দিতেন। সুরেশ যে, ভাল ছেলে, সে সম্বন্ধে তিনি বিশেষ পরীক্ষাও পাইয়াছিলেন।

একবার একজন গোয়েন্দা আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দেয়, "সুরেশ বাবু একটী সেতার ৭৫৲ টাকায় কলিকাতা হইতে খরিদ করিয়া আনিয়াছেন; গোয়ালিয়র-বাসী একজন ওস্তাদ সেই সেতার বাজাইতেছে। আজ তিন দিন হইল, সে ওস্তাদ আসিয়াছে।" এই কথা শুনিয়া কর্ত্তা ক্রোধে ক্ষোভে কেমন যেন বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য হইলেন। গোয়েন্দাকে বলিলেন, "বলিস্ কি?—বলিস্ কি?—তবে কি সুরেশ আমার সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে? উঃ! সর্ব্বনাশ হলো, সর্ব্বনাশ হলো!—সুরেশ এখন কোথা বল্‌তে পারিস্?"

গোয়েন্দা। আর—মোশাই! তিনি নিজের বৈঠকখানায় ব'সেই একাণ্ড করছেন।

কর্ত্তা। এখন গেলে দেখ্‌তে পাওয়া যায় কি?

গোয়েন্দা। হাঁ, পাবেন বৈকি?

গোয়েন্দা—পতিতপাবন পরামাণিক। একদা কোন বিশেষ কারণবশত, সুরেশ, পতিতকে জুতা মারিয়াছিলেন। পতিত প্রতিশোধ লইবার চেষ্টায় ছিল। অদ্য সুযোগ পাইয়া পতিত বাদ সাধিল।

যাত্রাকালে কর্ত্তা বলিলেন, "পতিত, তুমিও আমার সঙ্গে এস।"

যোড়হাতে পণ্ডিত উত্তর দিল, "হুজুর! মাপ কর্বেন,—বাবু আমাকে দেখ্‌লেই, আজ না হয়, এর পর মেরেই ফেল্‌বেন। আমাকে তিনি আপনার সঙ্গে দেখ্‌লেই ঠিক কর্বে ল'বেন,—এই বেটাই ঠাকুর্দ্দাকে ডেকে এনেচে।"

তখন কর্ত্তা একাই, সুরেশের বৈঠকখানাভিমুখে অর্দ্ধ-দৌড়ন-গোছ-ভাবে যাইতে লাগিলেন।

সুরেশচন্দ্রের বৈঠকখানা গোহাল বাড়ী। এখানে গোহাল বাড়ী অর্থে গোরু থাকিবার বাড়ী নহে। ঐ স্থানে—কে-জানে,—পূর্ব্বে কবে বুঝি গরু থাকিত, তাই উহার নাম আজও গোহাল-বাড়ী। গোহালের জমীটী—এখন বাগানবাড়ী,—একটী পুকুর আছে; এবং উপর-নীচে দুই-কুঠারী এক দ্বিতল দালানও আছে। এই বাগান—চতুর্দ্দিকে প্রাচীর-বেষ্টিত। বাগানের ফটকে অবশ্যই দ্বারবান্ নাই। তবে যেদিন সুরেশচন্দ্র, বৈঠকে বসিয়া গীত-বাদ্যাদি ক্রিয়ায় বিশেষ নিমগ্ন হন, সেদিন ফটকে একজন প্রহরী-স্বরূপ লোক বসিয়া থাকে।

অন্দরের খিড়্‌কি দিয়া গেলে, বাগানে শীঘ্র সহজেই যাওয়া যায়। কিন্তু সদরের বহিঃরাস্তা দিয়া বাগানে একটু ঘুরিয়া যাইতে হয়। কর্ত্তা সদর-রাস্তা দিয়াই যাত্রা করিলেন।

সুরেশ, চালাক ছেলে। আটঘাট বাঁধিয়া তবে গীতবাদ্য-কেলিকৌতুকে রত হইতেন। বাগানের ফটকে ত প্রহরী বসিতই; ইহা ব্যতীত বাটীর অন্যান্য দাসদাসীবৃন্দ সুরেশের গোয়েন্দা স্বরূপ ছিল।

ওদিকে, নাপিতকে ধরিতে সদররাস্তা দিয়া ঠাকুরদাদা দ্রুত-পদে

চলিলেন,—এদিকে সর্ব্বাগ্রে সুরেশকে সংবাদ দিতে, অন্দর দিয়া একজন ভৃত্য লম্বালম্ফে দৌড়িল।

ভৃত্য অবশ্যই আগে পৌঁছিল। সুরেশচন্দ্র, প্রকৃতই তখন সেতার-বাদ্যের মহোৎসবে মাতিয়াছেন। বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া একাগ্রমনে ওস্তাদজীর নিকট হইতে গৎ শিখিতেছেন। এমন সময় তিনি ঠাকুরদাদা আগমনের বার্ত্তা পাইয়া বড়ই বিব্রত হইলেন। হঠাৎ কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। সেতার এবং তবলা বাজনা'ত তখনি বন্ধ হইয়া গেল,—কিন্তু সেগুলাকে লুকাইবার কি? ওস্তাদজী, সঙ্গতকার বয়স্য—ইহাদিগকেও বা রাখি কোথা? এদিকে,—ঐ বুড়াকর্ত্তা আসিল, ঐ বুড়াকর্ত্তা আসিল,—এইরূপ শব্দ পড়িয়া গেল। কর্ত্তা তখন ফটক পার হইয়া সুরেশকে "সুরো," "সুরো," বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ডাকিতেছেন। সুরেশ ভয়ে সাড়া দিতে পারিতেছেন না।

হয় কি, করি কি?—গেল, গেল,—বুঝি আর বাঁচিল না! কর্ত্তা ক্রমশই অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিলেন।

সেতার বাদক ওস্তাদজী তৈয়ারি লোক। তিনসংসারে তাঁহার কেহ নাই,—পুত্র-কন্যা নাই, সহধর্ম্মিণী নাই, ভাই-বন্ধু নাই;—তিনি কেবল দেশে দেশে ওস্তাদি করিয়াই বেড়ান। নানা দেশ ভ্রমণনিবন্ধন তিনি নানা বিষয়-ব্যাপার দর্শন করিয়াছেন,—সুতরাং অভিজ্ঞতা বিলক্ষণ আছে। বিশেষ, অন্যান্য স্থানে এমন্-সব মজলিসে তিনি অনেকবার অনায়াসে সু-সুখে সু-উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

এরূপ সঙ্কটে উপস্থিত-বুদ্ধি ওস্তাদজী বলিলেন, "ভয় কি?—ঐ যে আমকাঠের বড় সিন্দুকটা রহিয়াছে, ঐটাতে সেতার এবং

সুরেশের সেতার-শিক্ষা।



ঢোলক তবলা রাখা হউক এবং আমিও ঐটাতে লুকাইতেছি,—তুমি সিন্দুকে চাবি দাও—”

সুরেশ। আপনি হাঁপিয়ে যাবেন যে—

ওস্তাদজী। না—না—সিন্দুকের মুখে একটু ফাঁক আছে—আমকাঠের ডালায় তেওড় আছে

এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ ওস্তাদজী সেতার ঢোলক তবলা লইয়া স্বয়ং সিন্দুকে ঢুকিয়া পড়িল। পড়িয়া বলিল,—“শীঘ্র চাবি দাও,—আর, রতন! (বাদক) তুমি ও-ঘরে গিয়া ব’স। কর্ত্তা যাই এ-ঘরে আসিবেন,—তুমি অমনি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া ঐ কাঁঠাল-গাছের আড়ালে বসিয়া থাকিবে।—আর গণেশ! (সুরেশের জমা খরচ শিক্ষক)!—তুমি জমা-খরচের খাতা পাতিয়া বাবুকে সুদ-কসা শিখাও।”

উপদেশমত শীঘ্র সকল কার্য্য সমাধা হইল। গণেশ সম্মুখে দুইখানা জমা-খরচের খাতা রাখিল;—এবং কাগজ কলম দোয়াত লইয়া, সুরেশচন্দ্রকে সুদ-কসা শিখাইতে লাগিল।

গণেশ বলিতেছে,—“তিনবৎসর মেয়াদে একজন ৭২৯।৹ টাকা ধার লইল। মাসিক সুদ টাকা প্রতি ৴২॥৹ আড়াই পয়সা। তিন মাস অন্তর সুদ আসলে চড়িবে। দুই বৎসর পাঁচ মাস এগার দিন পরে কর্জ্জদার ব্যক্তি, বিষয় হস্তান্তরের চেষ্টায় আছে। সুতরাং মেয়াদ তিন বৎসর থাকিলেও, এক্ষণে নালিসের কারণ হইল। বল দেখি, তুমি তাহার নামে সুদে-আসলে কত টাকার দাবীতে নালিস করিবে?

সুরেশচন্দ্র নিবিষ্টচিত্তে সুদ কসিতে লাগিলেন। গণেশ বলিতেছে, “সুদ, আসলে চড়িবে”—যেন মনে থাকে,—

এমন সময় ঠাকুরদাদা দ্বিতলের গৃহে আসিয়া পৌঁছিলেন। তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে স্বভাবতই তাঁহার রাগ কমিল। জিজ্ঞাসিলেন,—"সুরেশ! তুমি কি করিতেছ?"—

সুরেশ। আজ্ঞে, একটা সুদকসার ভয়ানক শক্ত অঙ্ক কসিতেছি।

ঠাকুরদাদা কি অঙ্ক?

সুরেশ। এই এই—তিন মাস অন্তর সুদ,—আসলে চড়িবে।

ঠাকুরদাদা। তিন মাস অন্তর কেন?—এইরূপ হিসাব কর।—কর্জ্জিদার, তিন মাস অন্তর সমস্ত সুদ চুকাইয়া দিবে। যদি না দেয়,—সুদের যদি পাই-পয়সা বাকি রাখে, তবে মাসে মাসে সমস্ত সুদ আসলে চড়িবে,—

সুরেশ। আজ্ঞে, তবে তাই কর্‌চি—

ইংরেজী লেখাপড়া ভাল হইল না দেখিয়া, ঠাকুরদাদা জমিদারীর কাজকর্ম্ম এবং সুদ কসিবার হিসাবাদি শিখাইবার জন্য গণেশ পণ্ডিতকে নিযুক্ত করেন। গণেশ প্রথম-প্রথম মাষ্টার নিযুক্ত হইয়া,—সুরেশকে সুদকসাদি শিখাইবার কিছু চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু শিখাইতে গেলে, চাকুরি থাকে না। কাজেই মাষ্টারও, ছাত্রের দলে মিশিল।

সে যাহা হউক, সুরেশের একান্তভাব দেখিয়া ঠাকুরদাদা সন্তুষ্ট হইলেন। ভাবিলেন, "সুরেশচন্দ্র যেরূপ মনোযোগের সহিত সুদের হিসাব শিখিতেছে, তাহাতে উহাদ্বারা ভবিষ্যতে বিষয় রক্ষা হইতে পারে।"

ঠাকুরদাদা নাতিকে উপদেশ দিলেন, "এঘরের জিনিসপত্র যত্ন

ক'রে রাখ্‌বে,—সতরঞ্চ, চাদর, বালিস—প্রত্যহ রোদে দিবে। আমকাঠের এই বড় সিন্দুকটায় ঝুই ধরে নাই'ত ?"

সিন্দুকের নামে সুরেশের মুখ শুকাইল।

ঠাকুরদাদা কিন্তু সিন্দুকের কথা ছাড়িলেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন,—"ঐ সিন্দুকটী আমার লছমী। ঐ সিন্দুকে এক-শ-টাকা রাখ্‌লে দু-শ-টাকা হতো—"

এই বলিয়া ঠাকুরদাদা সিন্দুকের নিকট গিয়া স্বহস্তে সিন্দুকের ধুলা ঝাড়িতে লাগিলেন।

সুরেশের চক্ষুস্থির। ঠাকুরদাদা যদি বলেন,—"সিন্দুক খুলিব,—সিন্দুকটা কেমন আছে দেখিব,—" তাহা হইলে'ত মরিলাম। লোক রোগে মরে, দংশনে মরে, জলে ডুবিয়া মরে, আগুনে পুড়িয়া মরে, অস্ত্রাঘাতে মরে,—কিন্তু সিন্দুক খুলিলেই যে সুরেশ মরে,—এ কি রকম কথা?—কেমন শাস্ত্র? এদিকে সিন্দুকের ডালাটী তোলা হইবে, ওদিকে সুরেশের প্রাণটী উড়িয়া যাইবে,—এই বা কেমন হিসাব? হিসাবপত্র বুঝি না,—কিন্তু সুরেশ বস্তুত মৃত্যুই ভাবিতেছিলেন।

ওস্তাদজী অনেক-দেশ-দর্শী কিনা,—তাই অনেকদিন হইতেই তাঁহার একটু কাসির ব্যারাম সঞ্চিত হইয়াছে। তিনি মাঝে মাঝে খুক্‌ খুক্‌ কাসেন।

সিন্দুকের ভিতর উপবিষ্ট ওস্তাদজীর অতি সামান্য মাত্রায় গলায় কাসীর আমেজ আসিতে লাগিল। কেহ চিন্তিত হইবেন না,—এ তেমন বেশী কাসী নয়,—বোধ হয় একবার খুব আস্তে আস্তে গলা-খেঁকারি দিলেই, এ কাসী সারিয়া যাইতে পারে।

ওস্তাদজী ভাবিতে লাগিলেন, "আমি যদি এখন এ কাসীটা

চাপিয়া রাখিতে না পারি,—তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ! প্রাণ যায়, তাও স্বীকার, তবু কাশিব না।”

ওস্তাদজীর পেট ফুলিতে লাগিল, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে আরম্ভ হইল।

সিন্দুকের ভিতর সহস্র মশায় ওস্তাদজীকে দংশন করিল,—তবু তিনি নড়িলেন না। নড়িলে যদি শব্দ হয়!!

একটা কাঁকড়া-বিছায় ওস্তাদজীর পায়ে বিষম কামড়াইয়া দিল। ভয়ঙ্কর জ্বালা। ওস্তাদজী ভাবিলেন, সাপ নাকি? তিনি অন্তরে “উ-হু-হুঃ গেলাম,—” করিতে লাগিলেন। একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক স্থির করিলেন, কথা কিছুতেই কওয়া হবে না। যদি সাপ হয়, তবেত নিশ্চয় মরিব,—এখন কথা কহিয়া লাভ কি? যদি বিছায় কামড় হয়, তবে জ্বালা দুই-চারি দণ্ডের পর নিশ্চয় নিবৃত্তি পাইবে। সুতরাং এখন কথা কহিয়া সব ফাঁক করি কেন?

কতকগুলা আরসুলা উড়িয়া ওস্তাদজীর গায়ে, মুখে, নাকে বসিতে লাগিল। দুর্গন্ধে নাড়ী উঠিবার উপক্রম হইল। ওস্তাদজী বিষম বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তথাচ তাঁহার বাক্যনিঃসরণ নাই। ধন্য ওস্তাদ!!

ওস্তাদজী লোক-মুখে শুনিয়াছিলেন, যেস্থানে সাপে কামড়ায়, সেস্থান বা তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের “সাড়” থাকে না,—তথায় চিম্‌টী কাটিলে লাগে না। তিনি সেই দষ্ট-পদটা একটু সরাইয়া চিম্‌টী কাটিয়া পরীক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে গেলেন। যাই পা সরাইবেন, অমনি একটু গুড়ুৎ করিয়া শব্দ হইয়া উঠিল।

সিন্দুকের দিকেই সুরেশের লক্ষ্য ছিল। এ শব্দ তখনই

তাঁহার কাণে গেল। শব্দ শুনিয়াই তিনি অজ্ঞান-প্রায় হইলেন। তাঁহার সর্ব্ব-শরীরের যেন বাঁধন খুলিয়া গেল। যেন অন্তর্জলির সময় উপস্থিত!

সে শব্দ ঠাকুরদাদার কর্ণকুহরে অবশ্যই প্রবিষ্ট হইয়াছিল। তিনি সুরেশকে জিজ্ঞাসিলেন,—"সিন্দুকে ইন্দুরে বাসা করে নাইত? সিন্দুকের ডালা খু'লে মধ্যে মধ্যে হাওয়া লাগাতে হয়—সিন্দুকের কাগজপত্র মধ্যে মধ্যে রোদে দিতে হয়!—সিন্দুক পরিস্কার রাখিলে, তাহাতে কখন ইন্দুরও ঢোকে না, উইও ধরে না। নিয়ে এস'ত একবার চাবি-কাটীটে, সিন্দুকটা খুলে দেখি।"

প্রকৃতই সুরেশের তখন কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত।

ওস্তাদজী ভাবিতেছেন, "এইবার প্রকৃতই বুঝি মুস্কিল বাধিল। কিন্তু সুরেশের যদি বুদ্ধি থাকে, তবে এখনও খানিক রক্ষা হয়। সুরেশ খানিক খুঁজিয়া বলুক্‌না কেন,—চাবিটী পাওয়া গেল না—হারাইয়া গিয়াছে। তা'হলে ঠাকুরদাদা'ত সুরেশের আর মাথা নিতে পার্‌বে না, নাহয় একটু ধম্‌কাবে। তারপর, কামার ডাকো, চাবি ভাঙ্গো, সিন্দুক খোলো,—সে এখন ঢের কালের কথা!! কিন্তু সুরেশের এ বুদ্ধিটুকু হবে কি?—অথবা আমারই চুক্ হইয়াছিল। সিন্দুকে ঢুকিবার সময় আমিই যদি সুরেশকে বলিয়া রাখিতাম যে, ঠাকুরদাদা চাবিকাটী চাহিলে,—ব'লো,—'হারাইয়া গিয়াছে,'—তাহা হইলেত এখন সব গোলই মিটিত। আমারই আহাম্মকি হইয়াছে।"

আর চাহিয়া দেখিতেছ কি? সুরেশের কপালে গঙ্গামাটী দাও, মুখে গঙ্গাজল দাও, কাণের কাছে হরি-সংকীর্ত্তন কর,—সুরেশের মৃত্যু সন্নিকট!

সুরেশের বাক্‌রোধ। "চাবিকাটী দিতেছি, কি দিব, কি খুঁজিয়া পাইতেছি না,"—ঠাকুরদাদার কথায় তিনি এরূপ কোনও উত্তর দিতে পারিলেন না। যিনি মৃতপ্রায়, তিনি কথা কহিবেন কেমন করিয়া?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরমায়ু থাকিতে মানুষ মরে না। সুরেশের আজও দিন ফুরায় নাই, তাই সুরেশ দৈবানুগ্রহে বাঁচিয়া উঠিলেন।

যে চাকর লম্বা-লম্ফে দৌড়িয়া আসিয়া, ঠাকুরদাদার আগমন-বার্ত্তা-বিষয়ে সুরেশকে প্রথম সংবাদ দেয়, সেই চাকরটাই হাঁপা-ইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, "কর্ত্তা মোশাই, শীঘ্র আসুন,—ভাঁড়ার ঘরে সাপ বেরিয়েচে—"

চাকরের কম্পন।

কর্ত্তা। বলিস্ কিরে?—কি সাপ?—কি সাপ?

চাকর। মস্ত সাপ!—সে আর আপনাকে কি বল্‌বো!

কর্ত্তা। কাকেও কামড়ায় নাইত?

চাকর। তাই বা কেমন ক'রে বল্‌বো!—আপনি শীঘ্র আসুন। গিন্নি ডাক্‌চেন!

কর্ত্তা আগে আগে, চাকর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

বহির্বাটী এবং অন্দরের মধ্যস্থলে এক মাটীর ভাঁড়ার ঘর। এটী ঠাকুরদাদার দুঃখের দশার ঘর। সেকালে এই ঘরের এক-

পাশে তিনি রাঁধিতেন, একপাশে শুইতেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঘরটী লক্ষণযুক্ত বলিয়া ঠাকুরদাদা ভাঙ্গেন নাই।

ঠাকুরদাদা ত সাপ দেখিতে ছুটুন, এদিকে সুরেশচন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া সিন্দুকের চাবি খুলিয়া ফেলিলেন, দেখিলেন, ওস্তাদজীও সংজ্ঞাহীন। তাঁহার মুখটা হাঁ-করা; জিবটা খানিক বাহির হইয়া পড়িয়াছে; নিশ্বাস বহিতেছে কি না সন্দেহ! চক্ষু দুটা মুদ্রিত। সুরেশ প্রথম দৃশ্যেই ভাবিলেন,—ওস্তাদজী বুঝি হাঁপাইয়া মরিয়াছেন। তারপর তাহার নাকের নিকট হাত লইয়া গিয়া দেখিলেন, এখনও মরেন নাই,—এখনও একটু একটু নিশ্বাস বহিতেছে। শেষে সুরেশ এবং তাঁহার শিক্ষক—উভয়ে ধরাধরি করিয়া, সিন্দুক হইতে ওস্তাদজীকে বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন। ওস্তাদজীর অবস্থা—তদ্বৎ,—নড়ন-চড়ন নাই,—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একেবারে যেন শিথিল হইয়া এলাইয়া পড়িয়াছে।

প্রকৃতই কি ওস্তাদজীর মরণ নিকট? তাহা নহে। ঠাকুরদাদা যখন সাপ ধরিতে গেলেন, ওস্তাদজী তখন ভাবিলেন,—সিন্দুক হইতে সহজ অবস্থায় আমার বাহির হওয়া হইবে না,—একটা পেঁচ দেখাইতে হইবে। আমি মড়ার মত হইয়া থাকি,—আমাকে তুলুক, বাতাস করুক, মুখে জল দিউক,—তবে আমার চেতন হইবে। সুরেশ যখন আমাকে পাখার বাতাস দিতে-দিতে বলিবে, 'ওস্তাদজী! আপনি আজ আমার জন্ত বড়ই কষ্ট পেলেন।' আমি তখন বলিব, 'আপনার কার্য্যে প্রাণটী গেলেও আমি কোন কষ্ট বোধ করিতাম না। এ কষ্ট ত ছার!—আপনার জন্ত আমি সর্ব্বস্ব দিতে পারি।' সুরেশ বালক। কিছুই বুঝিবে না। সে আমার কেনা-গোলাম হইয়া থাকিবে। শেষে, এই সিন্দুকে

ঢোকার দরুণ অন্তত একশত টাকা পারিতোষিক আদায় করিয়া লইব।"

ওস্তাদজী যাহা ভাবিয়াছিল, তাহাই ঘটিল। সুরেশ খুষি হইয়া, গুণে মোহিত হইয়া, উপসংহারে ওস্তাদকে নগদ দেড়শত টাকা এবং একখানা পুরাণ কাশ্মীরি-শাল বক্‌শীস্ দিল।

ওস্তাদজীর নাম তারিণী। কি জাতি, তাহা কে জানে?—কিন্তু তাঁহার পৈতা আছে। বাঙ্গালী! পোষাকটা কিন্তু হিন্দুস্থানীর মত। কথা অধিকাংশ সময়, অপরিচিত লোকের সাক্ষাতে তিনি হিন্দীতে কহিয়া থাকেন। তিনি অনেককেই বলেন, আমার নিবাস গোয়ালিয়র! কেহ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলে বলেন, গোয়ালিয়রে বহুকাল বাস ছিল,—এখনও বাসা-বাটী তথায় আছে। আমিই গোয়ালিয়র-রাজাকে সেতার শিখাইতাম, কিন্তু রাজা একদিন একটু সামান্য কড়া কথা বলায়, আমি চাকুরী ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছি।

সেতার বাজনা ব্যতীত, ওস্তাদজী অনেকানেক উৎকট রোগের অনেকানেক উৎকট ঔষধ জানিতেন।

সে যাহাই হউক, ধনবান ব্যক্তির লেখাপড়া-বিহীন উঠন্ত-বয়স্ক বালক দেখিলেই, তিনি যেন চীলের ন্যায় ছোঁ মারিয়া থাকেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যাউক। চাকর, ভাঁড়ার ঘরের কতক মাটী খুঁড়িয়া ঐ সাপ, ঐ সাপ!—ঐ চক্কর!—এই রকম বুলি প্রথমত আরম্ভ করে। কাজেই তথায় লোক জমিয়া গেল। সকলেই বলিল, সাপ বটে,—তবে বাস্ত সাপে কোন দোষ নাই। কেহ বলিল, আমি অমুক দিন ঠিক ঐখানে সাপ দেখিয়াছিলাম! কেহ বলিল,—একদিন আমি ঐ সাপের লেজে পা দিয়াছিলাম। কেহ বলিল, একদিন রাত্রে সাপটা আমাকে দেখিয়া সড়াৎ ক'রে চলিয়া গিয়া ঐ গর্ত্তে সান্ধাইয়াছিল। গিন্নি সাপের কথা শুনিয়া কপাটের অন্তরালে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সেই চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, শীঘ্র কর্ত্তাকে ডেকে নিয়ে এস। তাই প্রভু-ভক্ত চাকর লাফাইতে-লাফাইতে দৌড়িয়া গিয়া, সুরেশের শ্রীমন্দির হইতে কর্ত্তাকে দৌড় কাটাইয়া আনিল।

কর্ত্তা আসিয়া পৌঁছিলে, আরও অধিক লোকসমাগম হইল। চাকর খুব উৎসাহে আবার মাটিখোঁড়া-কার্য্য আরম্ভ করিল। কর্ত্তা চাকরকে বলিলেন, "দেখিস্, মানকে! সাবধানে মাটি কাটিস্—সাপটা যেন উল্টে তোকে চোটায় না।" চাকর উত্তর দিল, আমার গুরুর সেরকম আজ্ঞে নেই, দেখুন, আমি শীগ্‌গি সাপ ধরে নিয়ে যাচ্ছি,—"

এইরূপ আধঘণ্টা অতিবাহিত হইল, সাপ ধরা পড়িল না। মাণিক কোথা হইতে খানিকটা সাপের খোলস্ আনিয়া কর্ত্তাকে

দেখাইল। বলিল, "দেখুন, হুজুর!—এই খোলস্ দেখুন্,—সাপ আজ ধরা পড়িবে না—কাল ধরিয়া দিব।"

সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে গেল। এমন সময় পতিত পরামাণিক উঁকি ঝুঁকি মারিতে-মারিতে কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বলিল,—"কেমন কর্ত্তামোশাই; আমি যা বলেছিলাম, সব মিল'ত?—"

কর্ত্তা। পতে! তোর মত মিথ্যাবাদী লোকত আমি কোথাও দেখি নাই। তুই সোণার ছেলে সুরেশের মিছা কুৎসা ক'রে বেড়াস্! তোর কথা শুনে আমি দৌড়ে যেয়ে দেখি,—সোণারচাঁদ আমার, মন দিয়ে শুদকসা শিখ্‌চে,—তুই নচ্ছার-বেটা বলিস্ কিনা, সুরেশ সেতার বজিয়ে ব'খে গেল! বেরো বেটা নাপ্‌তে আমার ঘর থেকে!—মিথ্যাবাদী!—

পতিত সম্ভ্রান্ত নাপিত। এরূপ গালাগালি হঠাৎ কোথাও বড় খায় না। বিশেষ, পতিত একটু ঠোঁট-কাটা এবং বিলক্ষণ মুখ-টান।

পতিতও যথাসাধ্য, যথাসম্ভব ক্রোধ করিয়া বলিল, "আর যা বলুন্,—পতিতকে মিথ্যাবাদী বল্‌বেন না। পতিত গরীব ব'লে পতিতকে দুঘা মার্‌তে পারেন,—কিন্তু পতিতকে মিথ্যাবাদী বল্‌বেন না। আপনার মত ভদ্দর লোকের মুখে ও-কথা সাজে কি?—"

কর্ত্তা। পতে! তুই জানিস্, তোকে এখনি জুতিয়ে লম্বা ক'রে দিব—

পতিত। তা মারুন না কেন?—পতিত-ত তাতে পেছপাঁও নেই;—পতিত এই দাঁড়িয়ে রই লো,—জুতিয়ে লম্বা

করুন, চেষ্টা করুন,—পতিত কোন কথা কবেন না। কিন্তু পতিতকে মিথ্যাবাদী ব'লবেন না,—ও-কথাটী মুখ দিয়ে বার করবেন না!—পতিত, জেতে নাপিত বটে, কিন্তু সন্ধ্যে-আহ্নিক না ক'রে পতিত জল-গ্রহণ করেন না। অনেক কায়ত-বামুনের চেয়ে পতিতের নিষ্ঠে আছে। পতিতকে আর যা বলুন, সবই সহ্য হবে, কিন্তু পতিত যে, মিছে কথা কয়, একথাটী ব'লতে পাবেন না; একথা ব'ল্‌লে আপনার ধর্ম্ম থাকবে না!

কর্ত্তা। বেটা, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির এসে দাঁড়ালো গো!—বেরো বেটা বাড়ী থেকে—নহিলে এখনি জুতো খাবি—বেরো বেটা—

পতিত। (ঈষৎ শ্লেষের সহিত) বেটা কাকে বলে?

কর্ত্তা। লাগাও পঁচিশ জুতি!

কর্ত্তার ইঙ্গিতমতে পতিতের পৃষ্ঠে একজন ভৃত্য মৃদুমন্দ-মনোহররূপ পাঁচ-সাত-দশ ঘা জুতা বসাইয়া দিল। পতিত ধূলা ঝাড়িতে ঝাড়িতে ক্রোধভরে বাহিরে আসিল। পতিত, চৌকাট ডিঙ্গাইয়াই অর্দ্ধস্ফুটস্বরে বিড়-বিড় করিয়া বকিতে আরম্ভ করিল,—"আঃ—মার্ অমনি পড়ে রয়েছে কি না?—ঘরে পুরে কে-না কাকে মার্‌তে পারে? ঘরে ঢুকিয়ে আমি অমন, রাজার বেটাকেও ঘাস কাটা'তে পারি! মহীরাবণ, পাতালে ঢুকিয়ে রামচন্দরকেও মেরেফেল্‌তে গেছলো!—ওঃ কি আমার মার্ গো?—পথে এসে একবার মারুন না দেখি?" এইরূপ সমস্ত রাস্তা বক্‌বক্ বকিতে বকিতে শ্রীলশ্রীযুক্ত পতিতপাবন পরামাণিক মহাশয় বাসা অভিমুখে চলিলেন।

পতিতকে একজন জিজ্ঞাসিল, "পতিত! কি হয়েছে? আপনা-আপনি অমন বক্‌চো কেন?"

পতিত উত্তর দিল, "বকি কি আর সাধে? এই,—দাওয়ানজী মোশায়ের সঙ্গে জুতোজুতি হয়ে গেল,—তা কি বল্‌বো, আমি একা ছিলাম। সঙ্গে একজনও লোক থাকলে, পতিত কি সহজে ফিরে আসিত?"

এরূপ কিংবদন্তী, পতিত সেদিন ঘরের ভাত বেশী করিয়া খাইয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

পতিতকে জুতা-মারার দিন হইতে ঠাকুরদাদার ধ্রুব-ধারণা হইয়াছিল,—সুরেশ অতি সৎ ছেলে—উহার যোড়া নাই,—হিংসায় কেবল কোন কোন লোকে উহার বদনাম রটায়।

ইহার উপর, ঠাকুরদাদা সুরেশকে প্রাণের সহিত ভালবাসেন; কাজেই সুরেশ যা করেন, তাই তাঁহার ভাল লাগে; সুরেশ যা চাহেন, তাই তখনই পান; সুরেশের দোষ, তাঁহার চক্ষে গুণ বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু তাই বলিয়া, সুরেশ নগদ টাকা চাহিলে, ঠাকুরদাদার নিকট যে প্রাপ্ত হইতেন, তাহা নহে। সুরেশও বুদ্ধিমান্, কখন নগদ টাকা চাহেন নাই। নগদ টাকার রোজগার অন্য উপায়ে হইত। এই দেখুন,—সুরেশ বলিলেন, আমি স্কুলে আর পড়িব না। ঠাকুরদাদা একটীবার মাত্র বলিলেন, "স্কুলে পড়ুবে, বৈকি? স্কুলে না পড়ুলে হয় কি?" সুরেশ

অমনি কাঁদ-কাঁদ হইলেন। ঠাকুরদাদা আর থাকিতে না পারিয়া কহিলেন, "আচ্ছা, থাক্—তুমি ঘরে বসেই পড়। আর, বেশী ইংরেজী পড়িবারই তোমার আবশ্যক কি? ঘরে ব'সে জমীদারীর কাজ শিখ। আমি তোমার জন্যে যা রেখে গেলাম, কাজ-কর্ম্ম শিখে বজায় রাখ্‌তে পারলে, তোমার ছেলের ছেলে পায়ের উপর পা দিয়ে ব'সে খেতে পারবে।"

স্কুল-পরিত্যাগের কিছুদিন পরে, সুরেশ ধরিলেন, গোহাল-বাড়ীতে আমি বসিব,—ঐখানে ব'সেই আমি জমা-খরচ লিখিব, সুদকসা শিখিব।

ঠাকুরদাদা, ঈষৎ দূরস্থিত বাগান-বাটীটী আরব্ধযৌবন পৌত্রকে প্রথমে দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হন নাই। সুরেশচন্দ্র না-ছোড়বন্দা হইলেন.—কেননা ঠাকুরদাদার চক্ষু-কর্ণের অগোচরভূত, দূরে অবস্থিত নির্জ্জন বৈঠকখানা না পাইলে, সুরেশের সুবিধা হয় না! একদিন রাষ্ট্র হইল, সুরেশ রাগ করিয়াছেন, ভাত খান নাই। গৃহে হুলস্থুল পড়িল। গৃহিণী কর্ত্তাকে উপরোধ ধরিলেন, "তাতে দোষ কি? ছেলে গোয়াল-বাড়ীতে থাকৃতে চাচ্চে, থাকুক না কেন?—তুমি ত সব বোঝনা! বলতে নেই শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে,—ছেলে এখন ডাগর হয়েচে, তোমার সাক্ষাতে দিনরাত কি ব'সে থাকৃতে পারে?"

কর্ত্তা। কি জান, চোখে চোখে রাখ্‌তে হয়, নানা কারণে—

গৃহিণী। (জিহ্বা কাটিয়া) না,—না,—সে কথা বলোনা,—সুরেশের আমার, কোন দোষ নাই,—বাছা আমার চোখ্‌ চেয়ে দেখ্‌তে জানে না। অমন ছেলে কি জন্মায়?

কর্ত্তা। তা, আমি জানি, সুরেশের কোন দোষ নাই। ছেলে—

খুবই ভাল। তবে কি জান,—সুরেশ বংশের একমাত্র তিলক; ও বই আর কেউ নাই; ও-ই আমার একমাত্র ভরসা—তাই আমার ভয় হয়, যদি,—

গৃহিণী। অমন ছেলের উপর সন্দেহ করতে নেই। মিছে সন্দেহ কল্লে ছেলের অকল্যাণ হয়!—

আর বিশেষ কিছুই বলিতে হইল না। সুরেশচন্দ্র সেইদিন হইতে গোয়ালবাড়ীর অধিকারী হইলেন। সেইদিন হইতে সুরেশচন্দ্রের হৃদয়ের স্ফূর্ত্তি ষোলকলায় প্রস্ফুটিত হইল। সেই-দিন হইতে আকাশে সুধাংশু হাসিল, বাঁশীর মধুর-রবে যমুনা উজান বহিল। সেইদিন হইতে সুরেশচন্দ্রের শুষ্ক-পৃথিবী, সরস স্বর্গ হইল।

বালককাল হইতেই সুরেশ, ঠাকুরদাদার সহিত একত্র অন্নাহার করিতেন। কিন্তু সুরেশ ক্রমশ এই একত্র আহাররূপ কার্য্য হইতে অবসর লইবার চেষ্টায় রহিলেন। ঠাকুরদাদা মোদ্দা খাবার পূর্ব্বে "সুরো সুরো" করিয়া ডাকেন। কারণ সুরো কাছে বসিয়া না খাইলে, তাঁহার ভাত ভাল লাগিত না। সুরেশকে অনেক সময়েই ডাকাডাকিতে বাধ্য হইয়া আসিতে হয়, কর্ত্তার কাছে বসিয়া খাইতে হয়। ক্রমে শিকল কাটিবার বন্দোবস্ত হইল। প্রথম ৭ দিন অন্তর ১ দিন কামাই। শেষ ১ দিন অন্তর সাত দিন কামাই।—এই ভাবে ঠাকুরদাদার সহিত আহার চলিতে লাগিল। শেষে সব ফুরাইল। এক্ষণে নাতী এবং ঠাকুরদাদা স্বতন্ত্র সময়ে স্বতন্ত্র স্থানে আহার করেন। তবে যেদিন আহারের কোনরূপ বিশেষ উদ্যোগ হইত, অথবা কিছু নূতনত্ব থাকিত, সেদিন ঠাকুরদাদার আজ্ঞানুসারে উভয়েরই একত্র একস্থানে

আহারের স্থান হইত। সুরেশও ইহাতে কিছু বিশেষ আপত্তি করিতেন না।

অদ্য কালাচাঁদ আহার করিবেন। ঠাকুরমা কালাচাঁদকে দেখিবার জন্য চিরদিনই বড়ই ব্যাকুলা ছিলেন। যে কালাচাঁদের বাপকে তিনি স্তন্যদুগ্ধ দিয়া মানুষ করেন, সে কালাচাঁদকে যে, তিনি একটী দিনও খাওয়াইতে মাখাইতে পান নাই—ইহাই তাঁহার অন্তরের দুঃখ। প্রাতে কালাচাঁদের আগমন-মাত্র কর্ত্তা বাটীতে চাকরদ্বারা গিন্নিকে বলিয়া পাঠান "গিন্নিকে ব'লো,—তোমার কেলে-সোণা এসেছে,—এই-খানে খাবে।" ঠাকুরমা, কালাচাঁদের নাম শুনিয়া আনন্দে অধীর হইলেন,—এবং ষোড়শোপচারে আহারের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। স্নানান্তে কর্ত্তাও গৃহে গিয়া গৃহিণীকে বলেন, "কালাচাঁদের জন্য উত্তমরূপ আহারের যোগাড় করিও।" গৃহিণী উত্তর দেন,—"সে কথা কি তোমাকে শিখাইতে হইবে? আমি সাধ্যমত কিছুরই ক্রটী করিব না। তথাচ তখন কর্ত্তা গৃহিণীসমভিব্যাহারে স্বয়ং রন্ধনশালায় গিয়া আহারের সুবন্দোবস্তের বিষয় আরও একবার স্বমুখে বলিয়া আসিলেন।

অদ্য আহারের বিশেষ উদ্যোগ, কাজেই সুরেশও একসঙ্গে আহার করিবেন।

কালাচাঁদকে প্রথম দেখিয়া ঠাকুরমার যখন পূর্ব্বস্মৃতি জাগরূক হইয়াছিল, হর্ষ-বিষাদে যখন তাঁহার দু-নয়নে দশ-ধারা বহিতেছিল, তখন ঠাকুরদাদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সুরেশ এসেচে কি?"

ঠাকুরমা। সুরোকে ডেকে এসেচে—এলো বলে! ঐ যে আসচে—খড়মের শব্দ পেয়েচি!

দশম পরিচ্ছেদ।

সুরেশ হেলিয়া-দুলিয়া, ধীরে ধীরে পা ফেলিয়া, কোমর ঘুরাইয়া, আসিতেছেন! পরিধান উৎকৃষ্ট পট্টবস্ত্র। গায়ে আঙ-রাখা,—কি কাপড়ের তৈয়ারি তা জানি না,—কিন্তু তা দিয়া সর্ব্বাঙ্গের সর্ব্বস্ব দেখা যাইতেছে! গলায় সোণার হার। অঙ্গুলে হীরক অঙ্গুরি। বাউরি চুল। কচি-কচি দিব্য গোঁফের রেখা। অধরোষ্ঠ টুকটুকে লাল। গণ্ডস্থল বেশ গোলগাল হইলেও, কেমন যেন ঈষৎ চড়িয়ে-ভাঙ্গা। নয়ন আয়ত বটে, কিন্তু কোল কেমন বসা। বক্ষ প্রশস্ত। কটীতট ক্ষীণ। নাসিকা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরী। বর্ণ গৌর।

সুরেশচন্দ্র নব-কার্ত্তিকটীর ন্যায় আসিতেছেন বটে, কিন্তু ভাব কেমন বিমর্ষ-বিমর্ষ বা বেজার-বেজার! সুরেশ বোধ হয় ভাবিতেছেন, "কে জানে, আজ কোথা থেকে কে একটা লোক এসেছে,—তার সঙ্গে ব'সে একত্র খেতে হবে!! লোকটা কি জাত, তার ঠিক নাই,—তবু তার সঙ্গে এক পংক্তিতে আহার করিতে হবে! ঠাকুরদাদার যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নাই, যাকে-তাকে অমনি বাড়ী ঢুকিয়ে ফেলেন! যে রকম শুন্‌লেম, তাতে'ত লোকটা নিশ্চয়ই হাড়ী বা বাগ্‌দী হবে। লোকটা যক্ষা কালো, গায়ে গন্ধ, চুলগুলো ঝাঁকড়-মাকড়,—আঙ্গুলগুলো শক্ত যেন বাকারি! আমি ওর সঙ্গে একত্র ব'সে কখনই খাবো না—আজ না হয় উপ'স ক'রে থাক্‌বো,—ঠাকুরদাদাকে বল্‌বো, আমার জ্বর হয়েচে। না,—জ্বরের কথা বলা হবে না!—ঠাকুরদাদা—যদি

নাড়ী দেখে ফেলেন—তবেই গোল হবে। বল্‌বো,—পেট-কামড়াচ্চে! আচ্ছা, দেখা যাউক,—শেষে যা হয়, একটা একরকম স্থির করা যাবে।

বোধ হয় এইরূপ চিন্তামগ্ন হইয়াই সুরেশচন্দ্র আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দরদালানে উঠিয়া দূর হইতে কালাচাঁদমূর্ত্তি দেখিয়াই তিনি অবাক্‌। সুরেশের চক্ষে কালাচাঁদ এইরূপে প্রতীয়মান হইলেন,—"রংটা কালো মিস্‌মিস্‌ করিতেছে, মোটা-সোঁটা কুঁদিকাটা মুষ্‌কি জোয়ান, গোল-গোল রাঙ্গা-রাঙ্গা চোখ্‌ দুটা কুমারের চাকের ন্যায় কেবল ঘুরিতেছে, দাঁতগুলা কিড়্‌মিড়্‌ করিয়া যেন তাঁহার হৃৎপিণ্ড কামাড়াইতে আসিতেছে!"

সুরেশ মনে মনে কহিলেন, "এটা কি মানুষ, না ভূত? এমন জানিলে এখানে কে আসিত?—ঠাকুদ্দা এবং ঠাকুমা দু-জনেই রয়েচেন, পালাই বা কেমন করিয়া?"

অগত্যা সুরেশ নিকটে আসিতে বাধ্য হইলেন। আগমনমাত্র ঠাকুরমা স্নেহভরে সুরেশচন্দ্রকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, "অ,—সুরো! তোর দাদা এসেচে দেখেচিস্‌,—পেন্নাম কর্‌—"

সুরেশের চক্ষুস্থির। মনে মনে কহিলেন,—"ইনি আমার দাদা!!—তবেইত গিয়াছি!—"

ঠাকুরদাদা। ইহাঁর নাম কালাচাঁদ। তুমি এঁকে বোধ হয় এখন চেনোনা; ছেলেবেলায় তুমি একবার-মাত্র দেখেছিলে। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের পৌত্র। তোমার দাদা। ইহাঁকে প্রণাম কর।

কর্ত্তা এবং গৃহিণী উভয়েই যখন অনুরোধ করিলেন, তখন সুরেশ আর থাকিতে পারিলেন না। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, হৃদয়ে

'হরি রক্ষা কর" "হরি রক্ষা কর" বলিতে বলিতে, তিনি কালাচাঁদের পদপ্রান্তে আপন মস্তক নমিত করিলেন। কালাচাঁদও সুযোগ সুবিধা ছাড়িবার লোক নহেন। প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র, তিনি সুরেশের সহিত অমনি কোলাকুলি যুড়িয়া দিলেন। সে বড় সহজ কোলাকুলি নহে;—সাত দিন সুরেশের গায়ে ব্যথা ছিল। গায়ের ব্যথায় সুরেশের বিশেষ কষ্ট নাই;—কিন্তু কোলাকুলি কালে যে তাঁহার বাউরিচুল ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল, ইহাতেই তিনি মর্ম্মাহত হইলেন।

সুরেশ ভাবিলেন, "দর্শনেই এই ব্যাপার,—না-জানি একত্র ভোজনে আরও কত বিভ্রাটবিপত্তি আছে? আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিলাম, বলিতে পারি না! এ কালসাপকে, এ যমদূতকে কেন ঠাকুর্দ্দা ঘরে ঢুকিতে দিলেন? উঃ, মূর্ত্তি দেখ, ঠিক যেন কালভৈরব!"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদের ক্ষুধা ক্রমশই বর্দ্ধনশীল। সমুদ্র শুষ্ক হইয়াছে,—পূর্ণ করিতে হইবে।

কর্ত্তা, গৃহিণী, এবং পৌত্রদ্বয়—চারিজনে ভোজনগৃহের সমীপবর্ত্তী হইলেন। সুরেশের মাতা সে ঘর হইতে সরিয়া গিয়া, ঈষৎ অন্তরালে দাঁড়াইলেন। সে ঘরে রহিল কেবল দুইজন পাচিকা-ব্রাহ্মণী।

কালাচাঁদের দৃষ্টি আহারের দিকে। দূর হইতে দেখিলেন,—ঘরটী কেবল বাটি, থাল, রেকাবীতে ভরা। সবই সাদা-পাথরের—সাদা ধপ্‌ধপ্ করিতেছে। কালাচাঁদের হৃদয়ে আর আনন্দ ধরে না। উদর! আর খাইতে পারি না, বলিও না!—যত আশ, যত সাধ,—আজ ষোলকলায় সম্পূর্ণ করিয়া লও। রসনা! আজ রস-সাগরে ডুবিয়া থাক; হাঁপাইলাম, বলিতে পাইবে না!

সারি সারি তিনখানি আসন; ঈষৎ দূরে দূরে অবস্থিত। প্রথম-খানিতে বসিলেন, ঠাকুরদাদা;—দ্বিতীয় খানিতে কালাচাঁদ;—তৃতীয় খানিতে সুরেশ। সুকোমল পশমের আসনে বসিয়া কালাচাঁদ মনে মনে কহিলেন,—"আ! আজ—কি সুখ!"

বাঁশবনে ডোমকাণা। সারি সারি—রেকাব-বাটীর অনন্ত-সারি দেখিয়া, প্রথমত কালাচাঁদ কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। কোন্‌টায় কি আছে, কোনটাই বা আগে খাইতে হয়, কোন্‌টাই বা ঝাল, কোন্‌টাই বা অম্বল, কোন্‌টাই বা ডাল, কোন্‌টাই বা তরকারি?—প্রথমে ইহার কিছুই মীমাংসা করিতে সক্ষম হইলেন না! ভাবিলেন, ইহাও কম বিপদ নয়!

চারিদিক্ অল্প পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিয়া কালাচাঁদ মনে মনে কহিলেন,—'এই যে, এখনও ভাত দেয় নাই দেখ্‌ চি-যে।

তখন তিনি সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন,—"কেন এমন হইল? অন্ন নাই, কেবল ব্যঞ্জনাদির সমাবেশ; ঘোঁড়া নাই, কেবল চাবুকের ধূম, চন্দ্র নাই কেবল নক্ষত্ররাজির প্রস্ফুটন। স্ত্রী নাই, কেবল সুন্দরী শ্যালিকা-কুলের শোভা।"

ঠাকুরদাদা ওদিকে আচমন করিতে বসিয়াছেন। ধর্ম্মভাবে প্রণোদিত হইয়া চক্ষু বুজিয়া মনে মনে কতই তন্ত্রমন্ত্র বলিতেছেন। কখন বা জল লইয়া চারিদিকে ছিটাফোটা ছড়াইতেছেন। কখন বা অঙ্গুলি-কোণে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি লইয়া ভূমে রাখিতেছেন।

সুরেশ ঠাকুরদাদার আহারের সময় এই সব কার্য্যে বিষম বিরক্ত ছিলেন। ঠাকুরদাদার সহিত একত্র আহার না করার ইহাও একটা প্রধান কারণ ছিল। যেহেতু, আচমন গণ্ডুষাদির পর ঠাকুরদাদা আহার করিতে না বসিলে ত, সুরেশ আহারে বসিতে পারেন না। যেদিন আবার দুই একজন অপরিচিত ব্যক্তি এক সঙ্গে খাইতে বসিত, সেদিন ঠাকুরদাদার আচমন-গণ্ডুষ-কার্য্যে অধিক বিলম্ব ঘটিত।

আজও আচমনে বিলম্ব ঘটিতেছে। কেননা পাশে কালাচাঁদ।

বিলম্ব ঘটায় কালাচাঁদের সুবিধা হইল। তিনি দেখিয়া দেখিয়া, সামগ্রী-পত্র চিনিয়া লইবার অবসর পাইলেন। প্রথম দৃষ্টে তিনি দেখিলেন,—বাটী-রেকাবী'ত একশতের কম কিছু-তেই নহে,—কিন্তু উহাতে একটুকু করিয়া জিনিস কেন? মুগের ডাল আধ ছটাক, বুটের ডাল আধ ছটাক, কড়ায়ের ডাল আধ ছটাক, মুসুরির ডাল আধ ছটাক,—ডাল'ত চারি রকম।—কিন্তু

মালে যে ফাঁক! এর চেয়ে আদা ও হিং দিয়ে কেবল একবাটী কড়ায়ের ডাল দিলে'ত বেশ হইত! কাজ কি ছাই মুগের ডেলে? —উহা'ত রোগার পত্তি!—আমি কি কাহিল না রোগ থেকে উঠেচি, না আমার হজমশক্তি কম?—যে, আমাকে অতটুকু মুগের ডাল দিয়েচে!! উটুকু কি?—মাছের ঝোল বুঝি। যাই হউক, উটুকুকে'ত নশ্যি করিলেই হয়! ইনি বুঝি সুক্তানি,—ফুঁ দিলে উড়ে যান! ঐটী বুঝি গুড়-অম্বল,—ফোঁটা কাটিলেই হয়! ঈস্,—উনি বুঝি খয়রা মাছ ভাজা,—যেন একটী টীকুটীকির ছানা। আরে খেলে যা,—একখানা ধূমো ফুলকাটা রেকাবি ক'রে সিকিভরি ওজনের দু-গাছি শাকভাজা কেন?—নিশ্বাসে উড়ে যাবে যে! আর এসবের ওদিক সারি-সারি যে সব বাটী সাজান রয়েচে, ওগুলাতেই বা কি আছে? সুমুখে যে-সব বাটী রয়েচে, তার দু-চারিটা বুঝিলাম, দশ-বিশটা না হয় নাই বুঝিলাম,—তরকারী-ফরকারী মাথামুণ্ড যা-হোক কিছু একটা হবে!—যোদ্দা ঐ গুলো কি? সারি সারি থাকে থাকে যে সাজান, ওর ভিতর কি আছে? বুঝি ক্ষীর-ছানা-ননি হবে,—পায়েসও আছে, বোধ হ'চ্চে! ঐটে যদি পায়েস হয়, তাহাতে'ত খড়কে ক'রে জিবে ঠেকাতে হবে। আচ্ছা, আমি কি পাখী? ঠোঁটে ঠেকাতেই যে, পায়েসে কুলাবে না!—ছিঃ কেবল ধাষ্টেম! না, নাতি ব'লে ঠাকুদ্দা তামাসা কোচ্চেন? যেমন আশা করিয়া আসিয়াছিলাম, তেমনি তার প্রতিফল পাইলাম। এই, সবগুলা এক করিয়া খাইলেও যে, গলা ভিজিবে না! এক কলসী জল চাই,—এ, শিশির কুড়াইয়া কলসী কত পুরাইব?

যাউক! তরকারির জন্য তত এসে-যায় না! ভাত আনিতে,

ভাত কিছু বেশী করিয়া চাহিয়া লইয়া খাইব। তরকারির অভাব ভাতে পূর্ণ করিব। ঠাকুরদাদা তরকারিতে যেরূপ সরু কাটিয়াছেন, ভাতেও ত সেইরূপ সরু কাটিতে পারেন। তা কাটেন কাটবেন—আমি কিন্তু চক্ষুলজ্জা খাইয়া আবার দ্বিগুণ ভাত চাহিয়া লইব। আগে উদরের তৃপ্তি, তারপর চক্ষুলজ্জা।

এদিকে ঠাকুরদাদার আচমন শেষ হইল। আচমনান্তে ঠাকুরদাদা বলিলেন, "কালাচাঁদ। তুমি আমার জন্য খেতে এত দেরী কচ্ছিলে কেন? আমার কি জান,—৺লক্ষ্মী-নারায়ণে সমুদায় বস্তু অর্পণ ক'রে, তবে আমি খেতে পাই! সেই রাধা-বিনোদন, বংশীবদন শ্রীকৃষ্ণকে দিলেই আমার খাওয়া হয়। আহা! রাধিকা-রমণের প্রসাদ,—অমৃত, অমৃত!!—কেলেসোণা! তবে খেতে ব'স। সুরেশ! তুমিও খাও,—"

কালাচাঁদ সবিস্ময়ে ভাবিতে লাগিলেন,—"ঠাকুরদাদাটা বলে কি?—ভাত কৈ?—যে, খাব! খাই কি?—ভাত নাই, কেবল তরকারি খাইয়া থাকিব নাকি? এ,—যে, মহামুস্কিল বাধালে দেখ্‌চি! আচ্ছা দেখিনা,—ঠাকুরদাদাটা আগে কোন্ তরকারিটে খায়!"

কালাচাঁদ দেখিলেন, ঠাকুরদাদা একটা মেটেরঙের তরকারি হাতে করিয়া ভাঙ্গিতেছেন। ভাঙ্গিয়াই তিনি কালাচাঁদকে বলিলেন "কেলেসোণা। এই পোলাওয়ে আচ্ছা করিয়া নেবু মাখিয়া খাও! পোলাও বড় গরম জিনিষ! দিন-সময় বড় খারাপ পড়েছে।—সুরেশ! তুমি সাবধান!"

এতক্ষণে কালাচাঁদ সব বুঝিলেন। বুঝিলেন, অদ্য ভাত নয়,—পোলাও। বুঝিলেন, এ সব তামাসা নয়, সত্য বিষয়। বুঝিলেন,

ইহা ইন্দ্রজাল নয়, প্রকৃতই অন্নব্যঞ্জন। বুঝিলেন, দুই দিন ত অনাহার হয়ই নাই এ, তৃতীয় দিনও বুঝি অনাহারে থাকিতে হইল।

কালাচাঁদ প্রথমে বস্তুতই পোলাও চিনিতে পারেন নাই,—তাই তখন "ভাত ভাত" করিতেছিলেন। একখানি বৃহৎ থালের উপর প্রকৃতই একমুঠা আন্দাজ পোলাও ছিল। তাহাও অমনি একটু চূড়-করিয়া নৈবেদ্যের মত বাড়া। কালাচাঁদ মনে করিয়াছিলেন, ইহাও বুঝি কোন একরকম তরকারি হইবে। ভাতই হউক আর পোলাওই হউক,—শুদ্ধ ঐ-কটী যে, কেহ বাড়িয়া একজন যুবা পুরুষের সম্মুখে ধরিবে,—ইহা তিনি কখনও ভাবিতেও পারেন নাই।

যাই হউক,—ঠাকুরদাদার ইঙ্গিত পাইয়া, কালাচাঁদ সেই পোলাও ভাঙ্গিলেন; ভাঙ্গিয়া, ঠাকুরদাদার দেখা-দেখি গণা দুটী ভাত প্রথম মুখে দিলেন। তারপর, চারিটী; তৎপর, ছয়টী। অবশেষে আটটীর হিসাবে মুখে উঠিতে লাগিল।

পাঁচ সাতবার ঐরূপ অন্ন মুখে দিয়া, কালাচাঁদ চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এরূপভাবে শুষ্ক হইয়া থাকিবার আবশ্যক কি? আরও পোলাও চাহিয়া লই না কেন? এ বিষয়ের যুক্তি কি?"

কালাচাঁদ পুনরায় চিন্তা করিলেন,—"আবার যদি পোলাও চাই, তাহা হইলে, যতগুলি পোলাও প্রথমবারে দিয়াছে, এবার তাহার অর্দ্ধেকগুলি দিবে। তারপর যদি চাই, না—হয় আবার ততগুলিই দিল। ফের যদি চাই, না-হয় আরও ততগুলি পোলাও দিল। কিন্তু, তা হলেই বা কি হচ্চে? তা'তেই বা কোন্ আমার পেট ভরবে? অতকটী করিয়া ষোলদুগুণে বত্রিশবার দিলেও ...

আমার কিছু হবে না। তবে আর দ্বিতীয়বার পোলাও চাহিয়া ফল কি? চাহিলে জাত যাইবে, পেট ভরিবে না,—অতএব না চাওয়াই স্থির-সিদ্ধান্ত। বরঞ্চ এমত হাত দেখাই যে,—যতটুকু পোলাও দিয়াছে, উহার দশ-আনা ভাগ পাতে রাখি, ছয়-আনা ভাগ মাত্র খাই। ঠাকুরদাদা যদি বলেন, 'কালাচাঁদ! পাতে পোলাও পড়ে রইল যে, আর একটু খাওনা' আমি উত্তর দিব, 'ক্ষুধা নাই,—যাহা খাইয়াছি, তাহাতেই উদর পূর্ণ হইয়াছে।'

এই ভাবিয়া কালাচাঁদ তখন হৃষ্টচিত্তে খাইতে আরম্ভ করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এমন সময় ঠাকুরমা একজন পাচিকা-ব্রাহ্মণীর সহিত একটা বড় রুইমাছের মুড়া লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরদাদা যখন আচমনে বসেন, ঠাকুরমা তখন রন্ধনশালার দিকে গমন করেন। মাছ বনাইবার সময় ঠাকুরমা আপনাআপনি একবার বলিয়াছিলেন, এই বড় মুড়াটা কালাচাঁদ খাবে। কাহাকেও লক্ষ্য করিয়া বিশেষ রূপে এ কথা তিনি বলেন নাই। যখন পোলাও প্রভৃতি পাত্রে সজ্জিত হয়, সুরেশের মা বলেন, 'এ বড় মুড়া কাহাকেও দিয়া কাজ নাই,—এখন রাখো,—কর্ত্তা যদি বলেন, তবে যাহাকে হউক দেওয়া হইবে।' সুরেশের মা জানিতেন,—'কর্ত্তা নিজে মুড়া খান না, সুরেশের পাতে মুড়া দিলেও তিনি রাগ করেন;—বলেন, রুইমাছের মুড়া বড় তৈলাক্ত; উহা খাইলে হজম হয় না, পেট কাঁপে, আমাশয় হয়। বিশেষ, রুয়ের মুড়ো খাইয়া অমুক ব্যক্তির ওলাউঠা হইয়াছিল।' এতৎকারণ নিবন্ধন বড় মুড়া কাহাকেও প্রথমে প্রদত্ত হয় নাই।

ঠাকুরমা ঘরের ভিতর আসিয়া, কালাচাঁদের পাতে মুড়া না দেখিয়াই, পাক-শালায় দৌড়িয়াছিলেন। তথা হইতে মুড়া, আরও কয়েক খানা মাছ, এবং ঝোল, ব্রাহ্মণীকে দিয়া লইয়া আসিলেন। আসিয়াই বলিলেন, "বড় মুড়া,—এই কেলেসোণাকে দাও।"

কালাচাঁদ তখন পোলাও ভোজনের মজায় বিভোর!—অন্তরে হাসিয়া ঠাকুরমাকে বলিলেন,—"উঃ, আমার খুব পেট ভ'রেচে,—আমি আর কিছু খাইতে পারিব না—"

ঠাকুরদাদা এই মুড়া-ঘটিত ব্যাপার অবলোকন করিয়া ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—“কি—ও,” “কি—ও”

ঠাকুরমা। বড়মুড়া কেলেসোণা খাবে—

ঠাকুরদাদা। তা, দাও;—কিন্তু মুড়া বড়ই গরমজিনিস! কিহে কালাচাঁদ! খেতে পারবে'ত?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে, না। যা খেয়েচি, তাহাতেই ছাতি-সমান হয়ে উঠেচে—

ঠাকুরমা। হেঁরে,—কেলেসোনা! তোর খাওয়া অমন উড়ে-গেল কেন?—এই ছেলে বয়স,—এখন খাবিনা'ত' খাবি কবে? আমি বলচি,—তুই খা, কোন অসুখ করবে না।

পাচিকা, গৃহিণীর ইঙ্গিত-মত, কালাচাঁদের সম্মুখে সমুড়া-সমাছ-সঝোল বাটী রাখিল।

ঠাকুরমা বলিতে লাগিলেন, “কেলেসোণা! আমার দিব্য, তোকে খেতে হবে! তোর নাম ক'রে, বাছা! মুড়া বনান হয়েচে,—ও মুড়া কি আর কাকেও খেতে আছে?”

কালাচাঁদ তখন যেন বিশেষ অনুরোধে পড়িয়াই, বাধ্য হইয়া, না-পারি—না-পারি করিয়া, দু-আঙ্গুলের অগ্রভাগ দ্বারা মুড়ার একটু কোণ ঈষৎ খুলিয়া, তাহারই অর্দ্ধেকটুকু একবার মুখে দিলেন।

ঠাকুরমা। কেলেসোণা! পোলাওয়ে একটু ঝোল মেখে খা,—এখনও যে অনেক পোলাও রয়েচে,—খেলি কৈ?

কালাচাঁদ। কি বল্‌বো,—ঠাকুমা!—আমি এখন আর খেতে পারি না,—বিশেষ, আজ আবার খিদে নাই।

ঠাকুরদাদা। যা পারো, তাই খেও,—ওঁর (ঠাকুরমার) কথা শুনে যেন বেশী খেওনা—

কালাচাঁদ। আজ্ঞে,—না। তা কি কখন হয়?

ঠাকুরমা। হাঁ—হাঁ—ওঁর (ঠাকুরদাদার) কথা তোর শুন্‌তে হবে না। উনি সব্ জানেন কি না? উনি নিজে কিছু খেতে পারেন না, তাই মনে করেন, বুঝি আর কেহই খেতে পারে না। এই উঠন্ত বয়সে, বাছা! তুই কি আর একটা গোটা মুড়ো খেতে পারিস্ না?

কালাচাঁদ। ঠাকুমা! আগে আগে আমি খুব খেতে পাত্তাম,—এখন কেমন হয়েচে, অন্ন আর মুখে রোচে না। তবে তুমি বল্‌চো,—আর একটু খাই—এই বলিয়া কালাচাঁদ মুড়াটী লইয়া নাড়িতে চাড়িতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—"হায়! ক্ষুধায় প্রাণ বাহির হইয়া যায়, অথচ এ মুড়া—এমন বৃহৎ, ঘৃতাক্ত, সরস, সুমিষ্ট মুড়া, আমার খাইবার যো নাই! এমন বিড়ম্বনায়, এমন খয়েবন্ধনে কখন'ও পড়ি নাই! মহারত্ন করতলগত অথচ আমি দীন-দরিদ্র! সবই আছে, কিন্তু কিছুই নাই! এ, কি—এ?"

এই ভাবিয়া কালাচাঁদ, মুড়ার গা হইতে আঙ্গুলে করিয়া একটু ঝোল লইয়া, পোলাওয়ে মাখিয়া গুটী-আষ্টেক অন্ন মুখে দিলেন।

ঠাকুরদাদা। সাবধান! কেলেসোণা! সাবধান! একটু হাতে-রেখে। জান'ত, এর উপর আবার পায়েস-পিষ্টক আছে।

কালাচাঁদ। আজ্ঞে, হাতে খুবই রেখেচি—। আর, পায়েস-পিষ্টক'ত আমি খাই-ই না। পিটে খেলেই অম্বল হয়,—বুক জ্বালা করে!—

ঠাকুরদাদা। বটে, বটে,—ঠিক কথা,—বল কি? তবে পায়েস-পিষ্টক তোমার ছোঁয়া হবে না—আমারও,ওতে অম্বল হয়।

ঠাকুরমা. ঠাকুরদাদার উপর কৃত্রিম কোপ করিয়া বলিলেন,—“তুমি চুপ ক'রে থাক'ত! বাছা খাচ্চে, দাগ্ না?—তুমি অমন টীক্‌টীক্ করলে, বাছা খেতে পারবে কেন? কেলেসোণা! তুমি ওঁর কথা শুন না,—তুমি যত পার, তত খাও।”

কালাচাঁদ ঠাকুরমাকে “খাইতেছি” বলিয়া, একবার মুড়ায় অঙ্গুলিচতুষ্টয় বুলাইয়া তাহাই মুখে দিলেন।

লোল রসনা লোলুপ; কিন্তু উপায় নাই। জঠর-দাবানল জ্বলিতেছে,—নির্ব্বাণ হইবে কিসে? ক্ষুধায় শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে,—মহৌষধ মিলিবে কোথা? হাই উঠিতেছে,—চোখে জল পড়িতেছে, কাণ ভোঁ ভোঁ করিতেছে,—করিব কি?—যাইব কোথায়?

কালাচাঁদের কষ্ট হইল। কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন, “ঠাকুরমা আজ যেন স্বয়ং অন্নপূর্ণা অবতীর্ণা হইয়া অন্ন বিলাইতেছেন, তথাচ আমি অনাহারে মারলাম! এই ধনবান্ ব্যক্তির গৃহে, চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সমস্ত সামগ্রীই সমুপস্থিত,—অথচ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আমার প্রাণ যায়-যায় হইতেছে। এমন উদ্‌যোগে, এমন সংযোগে, এমন অভ্যর্থনায়, এমন আদরে,—অদ্য আমি যদি না অন্ন পাইলাম, তবে কল্য আর কোথায় পাইব?”

কালাচাঁদ আরও গভীর চিন্তা করিতে লাগিলেন, “তবে কি অন্ন আমার অদৃষ্টে নাই? বিধাতা কি অদ্য একান্তই অন্ন মাপান নাই?—তবে কি অদৃষ্টই মূল,—ভগবান্‌ই সত্য? দূর! দূর! অদৃষ্ট আবার কি? কেবল ঘটনাচক্রে পড়িয়াই অদ্য আমি খাইতে পাইলাম না,—এইমাত্র। ছুট্ অদৃষ্টকে? আমি মনে করিলে'ত এগুল্‌নি সব খাইতে পারি। আচ্ছা, আমি আঁচাইয়া উঠিয়া,

বাজারে গিয়া একদমে আড়াই সের রসগোল্লা খাইয়া আসিব,—কে আমার গতিরোধ করে, একবার দেখিব?”

এই বলিয়া কালাচাঁদ প্রকৃতিস্থ হইলেন। নখের কোণে একটী সিদ্ধ-পিঠের সূচিকা-বৎ ডগটি কাটিয়া লইলেন। সেইটী দু-আঙ্গুলে টিপিয়া সম্মুখে ধরিয়া হাসিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন,—“এটী মুখে দিব?—না, নাকে দিব? না মাথায় ঠেকাইব?—না ফুয়ে উড়াইব?” শেষে সেইটীকে মুখের কাছে, ঠোঁটের খুব নিকটে একবার লইয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ হাত ফিরাইয়া আনিয়া, আবার, অন্য একটা বাটিতে হাত দিলেন। আবার সেই হাত, সেই-অন্য-বাটী হইতে উঠাইয়া লইয়া মুখের কাছে ঠোঁটের নিকট লইয়া গেলেন, আবার সেই হাত তৎক্ষণাৎ ফিরিইয়া আনিয়া অন্য একটা বাটীতে দিলেন। সর্ব্ব রকমে চৌষট্টীটা রেকাবি-বাটী ছিল,—ক্রমশ প্রায় সবগুলিতেই এই রকম করিলেন। শেষে পরিতুষ্ট হইয়া বলিলেন, “ঠাকুরমা, খুব খাইয়াছি, আর খাইতে পারি না—”

ঠাকুরমা। খেলে কৈ বাছা?—অনেক জিনিসত তোমার পাতে পড়ে রৈল—

কালাচাঁদ। আজ, যে খাওয়া খেয়েচি, ঠাকুমা!—কস্মিন্ কালে এমন খাওয়া খাই নাই—ঠাকুমা, আজকের খাওয়া অনেকদিন মনে থাকবে!—

ঠাকুরমা। বাছা, ও একটু-একটু খাওয়া আমার পছন্দ হয় না! বেশ হাম্-হাম্ ক'রে থাবা-থাবা খাবে, দেখে আমার চক্ষু জুড়াবে। কে জানে, বাছা! এখনকার ও-একরকম কি নূতন খাওয়া উঠেচে, কিছু বল্‌তে পারি না—

কালাচাঁদ। ঠাকুমা! এই তিল তিল করে খেয়েই আমার পেটে ভাল হয়েছে;—আমার আর নড়ন-চড়ন নাই, উত্থান-শক্তি নাই। আজ যা হয়েচে সে আর কি বল্‌বো তোমাকে—এই বলিয়া হাস্যবদন কালাচাঁদ পেট ফুলাইয়া ঠাকুরমাকে দেখাইয়া বলিলেন,—"দেখ ঠাকুমা! পেটে আমার আর একটুও যায়গা নাই।"

ঠাকুরমা। পেট ভরিলেই হলো, বাছা!

আহারান্তে উত্থান-কালে ঠাকুরদাদা গম্ভীর মূর্ত্তিতে এক প্রস্তাব করিলেন, "কালাচাঁদ! তুমি এক কর্ম্ম কর। এখন একটু নুণনেবু এবং হজমীগুলি খাও। আমার ভয়, পাছে গরহজমে অসুখ করে।"

কালাচাঁদ। আমিও তাই বল্‌বো-বল্‌বো মনে ক'রছিলাম। আহার যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে অসুখ করাই খুব সম্ভব।

ঠাকুরমা। বালাই!—ষেঠের বাছা, ষষ্ঠীর দাস! অসুখ কেন করিতে গেল?

ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমার কথায় কোন কাণ না দিয়া, কালাচাঁদের উদ্দেশ্যেই বলিলেন "যদি অসুখ করাই খুব সম্ভব হইয়া থাকে, তবে চাকর'রা পেটে খানিক তেলে-জলে মালিস ক'রবে কি?"

মালিসে কথায় কালাচাঁদের ভয় হইল। একবার তেলমাখানো-ব্যাপারে কালাচাঁদ অস্থির হইয়াছিলেন। ভাবিলেন, "মালিস যদি মাখানো অপেক্ষা আরও কিছু গুরুতর কাণ্ড হয়, তাহা হইলেত এবার প্রাণটা নিশ্চয়ই বাহির হইয়া যাইবে।" প্রকাশ্যে কালাচাঁদ বলিলেন "না,—সে সব কিছু করিতে হইবে না, নুণ-নেবু খাইলেই অসুখ সারিয়া যাইতে পারে।"

ঠাকুরদাদা। আচ্ছা, মালিস এখন থাক্, রোগের অবস্থা বুঝে শেষে যা-হয় করা যাবে।

কালাচাঁদ ভাবিতেছেন, এখন যে, এ ঘর থেকে বা'র হতে পাল্লে বাঁচি!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

আহারাদি সমাপন হইল। উঠিবার সময় কালাচাঁদ আর একটু খাবার জল চাহিলেন।

ঠাকুরদাদা অমনি হাঁ—হাঁ করিয়া উঠিলেন। বলিলেন "অ, কেলেসোণা! খবরদার! তুমি এখন জল কিছুতেই খেতে পাবেনা। ভোরপুর আহারের পর ঠাণ্ডাজল খাইলে পোলাও হজম হইবে না,—পেট ফুলিয়া দমসম হইবে।"

ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদার উদ্দেশে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"হেঁ গা! তোমার কেমন কথা? আহা! তেষ্টার জল বাছা একটু খেতে পাবে না!! জল না খেতে পেলে বাছার গলাটী শুকিয়ে যাবে,—কত কষ্ট হবে! কেলেসোণা। তুমি জল খাও, আমি বল্‌চি। তোমার ব্যারাম আছে, আমি আছি।"

এই বলিয়া ঠাকুরমা খানিক জল আনিয়া কালাচাঁদের ঘটিতে ঢালিয়া দিলেন।

ঠাকুরদাদা, ঠাকুরমার উদ্দেশে বলিতে আরম্ভ করিলেন, "তুমিত বুঝনা,—অসুখ হলে ভুগ্‌বে কে?"

ঠাকুরমা। (ঈষৎ ক্রোধভরে) সে ভাবনা তোমায় করিতে

হইবে না। ভুগিতে হয়, আমি ভুগিব। খাওত, বাছা কেলে-সোণা! জল!

কালাচাঁদ মহাবিপদে পড়িলেন। এক দিকে ঠাকুরদাদা, অন্য দিকে ঠাকুরমা। একদিকে শিব, অন্য দিকে শক্তি। উভয়ে সংগ্রাম। মধ্যে কালাচাঁদ। তিনি কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবেন, ভাবিয়া প্রথমত কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে স্থির হইল, উভয়েরই মন রাখিতে হইবে। বলিলেন, "না, আমি জল বেশী খাবো না,—জল খাবার তত দরকার নাই! তৃষ্ণা পায় নাই!—এই একটা কুলকুচা করিলেই হইতে পারে!"

এই বলিয়া কালাচাঁদ এক চুমুক মাত্র জল পান করিলেন। ভাবিলেন,—জল চাহিয়া আমি কি ঝকমারিই করিয়াছিলাম। এস্থলে আর যে কথা কহিবে, সে শ্যালা, এ ঝাকুড়ার আগুন যে নিবলে বাঁচি,—ফুরলে বাঁচি!

সর্ব্বকার্য্য সমাধা হইলে, তিনজনে আঁচাইতে গেলেন! ঠাকুর-দাদা চাকরদিগকে ধমক্ দিতেছেন, "ওরে তোরা কি রকম আহম্মক বল্ দেখি?—বেসম্ এনে এখনও রাখতে পারিস্ নেই? শীগ্‌গীর বেসম্ নিয়ে আয়, শীগ্‌গীর বেসম্ নিয়ে আয়।"

এইরূপে "লে-আও, লে-আও" ধ্বনি পড়িয়া গেল। একজন চাকর একেবারে একসরা বেসম্ লইয়া উপস্থিত হইল। সে, কালা-চাঁদের হাতে প্রায় একপোয়া বেসম্ ঢালিয়া দিল। এইবার কালা-চাঁদ ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিলেন। সে হাসির অর্থ বোধ হয় এইরূপ;—"আহার অপেক্ষা হাত পরিষ্কারের ধূমটা কিছু বেশী দেখিতেছি। হাতে আছে কি—যে, বেসম্ দিয়া মাজিব? ঐ একসরা বেসমের যদি বড়া তৈয়ারি করিত, তাহা হইলে বরং

খাইয়া বাঁচিতাম। বুড়ো-টা ভুয়া হেঙ্গাম করিতে খুব মজবুত।"

কালাচাঁদ কি করেন,—সেই একপোয়া বেসমেই শুধু শুধু হাত মাজিলেন। আঁচান-পর্ব্ব শেষ হইলে, সুরেশ নীরবে অন্য দিক্ দিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেলেন। সুরেশচন্দ্র গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত একবারও বাঙনিষ্পত্তি করেন নাই।

কালাচাঁদেরও ইচ্ছা ছিল,—দৌড়িয়া পালাই। কিন্তু তাহা তিনি পারিলেন না,—ঠাকুরদাদার অনুমতি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। শেষে তিনি স্থির করিলেন,—ঠাকুরদাদার সঙ্গে সঙ্গেই বাহিরে যাইবেন,—আর'ত বেশী বিলম্ব নাই, ঠাকুরদাদার খড়কে খাওয়া হইলেই সব ফুরায়।

বুড়ার কিন্তু তখনও বুলি ফুরায় নাই। খড়কে খাইতে-খাইতেই তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"জুয়ান দিয়ে খুব ছোট একটী পান কালাচাঁদের জন্য তৈয়ারি কর;—সুপারি তাতে দিবে না। জুয়ান খুব বেশী দিবে। সুপারিতে পেট কামড়ায়।"

কালাচাঁদ মনে মনে অপরিমেয় হাসি হাসিলেন—"জুয়ানের বরাদ্দ'ত প্রচুর দেখিতেছি। কিন্তু হজম হইবে কি? অবশিষ্ট আছে কেবল নাড়ী। বাপু! আমি জুয়ান খাইব না,—শেষে কি নাড়ী হজম হইয়া যাইবে?"

কালাচাঁদ বাহিরে যাইবার জন্য ছটফট্ করিতেছেন। এক পল সময়, তাঁহার যেন একদণ্ড বোধ হইতেছে। কিন্তু বুড়ার খড়কে খাওয়া'ত সহজ নয়!—চলেচে'ত চলেইচে! এই হয়-হয়, আর হয় না।—আবার জাঁকাইয়া বসিয়া, ঠাকুরদাদা নূতন খড়কে দিয়া দাঁত খুঁটিতে আরম্ভ করেন। বুড়ার জ্বালায় কালাচাঁদ পাগল-প্রায় হইয়া উঠিলেন।

ঠাকুরমা সোণার ডিবে করিয়া কালাচাঁদের জন্য মণ্ডলঘাটের কর্পূর-কাত পান লইয়া আসিলেন। একটী কালাচাঁদের হাতে দিলেন। চারিটী ডিবাতে রহিল।

ঠাকুরদাদা উঠিয়া পান-ছেঁচা মুখে দিলেন। কালাচাঁদকে বলিলেন, "এস কালাচাঁদ! সদরে গিয়া একটু বিশ্রাম করসে। বিষম রোদ,—খানিক ঘুম'তে পারিলে ভাল হয়।"

ঠাকুরদাদার কথায় কালাচাঁদ হাতে-হাতে স্বর্গ পাইলেন। আহ্লাদে হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিল। কেননা, কালাচাঁদ এইবার অন্দররূপ কারাগার পার হইয়া সুখের সদরে গমন করিবেন।

ঠাকুরমা ঈষৎ তীব্রস্বরে বলিলেন "সে কি কথা? ছেলেসোণা বাহিরে শোবে কি? আমি নিজে উহার জন্য যে, তেতলার ঘরে খাটের উপর বিছানা ক'রে রেখেচি,—"

ঠাকুরদাদা। কালাচাঁদ তবে তুমি ঘরেই শুয়ে বিশ্রাম কর।

কালাচাঁদের মাথায় অমনি বজ্রাঘাত হইল। তিনি চারিদিক্ অন্ধকার দেখিলেন। ঘুরিয়া ভূতলে পড়িবার উপক্রম হইলেন। তবে শরীর নিতান্ত শক্ত বলিয়াই,সে বিষয় ঝোঁক সামলাইয়া লইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

একটু সামলাইয়া কালাচাঁদ ভাঙ্গা-ভাঙ্গা স্বরে আমৃতা আমৃতা করিয়া বলিলেন, "না—না,—তা বল্‌চিনা।—আমি আজ বাহিরেই শুই না কেন?"

ঠাকুরমা। (ক্রন্দনের স্বরে) বাছা! তবে তুই বুঝি আমাদিগে পর মনে করিস্! দেখ্ বাছা। এ তোর ঘর! তুই আমার ছেলের ছেলে! চিরদিনের পর আজ তোর মুখটি দেখেচি! তুই ভবি ব'লে, আমি নিজে খাটের উপর বিছান

করে রেখেচি!—আয়্ বাছা! আয়—তোর ঠাকুমাকে আর কষ্ট দিস না!"

এই কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরমা, কালাচাঁদের পিঠে হাত দিয়া একটু ধাক্কা দিলেন।

কালাচাঁদ—বাই! মৃত্যুকালে কি এমনি যন্ত্রণা হয়? অন্তরে যেন এককালে সহস্র শূলে বিদ্ধ হইতেছে। জিহ্বা যেন টানিয়া কেহ বাহির করিতেছে। গলা শুকাইয়া, ফাটিয়া যেন রক্ত পড়িতেছে। নয়ন-তারায় ছানি পতিত হইয়াছে,—মানুষ আর নজর হয় না। কর্ণ বধির হইয়াছে। মুখ দিয়া যেন সরক্ত ফেন নির্গত হইবার উপক্রম হইতেছে। দৃষ্টিহীন চক্ষু কপালে উঠিয়াছে। প্রকৃতই কালাচাঁদের মনে হইতেছে,—আজ বুঝি মরিলাম! বুঝি অনন্ত সাগরের অতল জলে ডুবিলাম!

তীক্ষ্ণধার তরবারির দ্বারা কেহ যদি কালাচাঁদের দক্ষিণ হস্তটা কাটিয়া লইয়া যাই, তথাচ কালাচাঁদ এত মর্ম্মযন্ত্রণা পাইতেন না। কিন্তু দিবসে, অন্দরে, ত্রিতলে, খাটে তাঁহাকে শুইতে হইবে, মহিলাকুলমধ্যে তাঁহাকে একাকী দিন কাটাইতে হইবে,—ক্ষুধা-পিপাসা উপেক্ষা করিয়া মুখটী বুজিয়া পড়িয়া-পড়িয়া কড়িকাঠ গণিতে হইবে,—এ যন্ত্রণা কালাচাঁদের পক্ষে একান্তই অসহ্য।

যিনি বনবিহঙ্গের ন্যায় সদা স্বেচ্ছা-ভ্রমণশীল, অন্দর তাঁহার পক্ষে যম-কারাগার।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বাল্যে, কৈশোরে যাহাই থাকুন, কালাচাঁদের পক্ষে একালে, স্ত্রীলোক উপেক্ষার জিনিস বা সম্মানের সামগ্রী হইয়াছিল। যুবতী রমণীর প্রতি তিনি মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতেন না। দৃষ্টি দূরে যাউক, কোন সোহাগিনী সুন্দরী তাঁহার কাছ-ঘেঁসিয়া গেলে, তিনি আস্তে-ব্যস্তে বিব্রত হইয়া পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইতেন। যেন একটু বিরক্ত হইতেন। ভদ্র কুল-মহিলাগণের উপর তিনি অধিকতর সম্মান ভক্তি দেখাইতেন, পতিতপাবনের গৃহে অবস্থানকালে তিনি হুগলীর রাসমণির ঘাটে প্রত্যহ গঙ্গা-স্নান করিতেন। পাড়ার দুরন্ত বালকগণ স্নানার্থ-গমনশীলা কুল-কামিনীর প্রতি কখন কখন তামাসা-ইঙ্গিত করিত। এসব দেখিয়া শুনিয়া কালাচাঁদ বড় চটিয়া উঠিতেন। একদিন তাঁহার সাক্ষাতেই একটা বখা বালক, একটী পঞ্চদশ-বর্ষীয়া অবগুণ্ঠনবতী বধূর পানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার চন্দ্রহারে চাবির জিঞ্জির কৈগো প্রিয়ে!" বধূ লজ্জায় জড়সড় হইয়া একবারে যেন গুটাইয়া গেল। কালাচাঁদ ক্রোধে কম্পিত হইয়া সেই বুড়া বালককে বলিলেন, "তোমার'ত বড় বদ্‌স্বভাব দেখ্‌চি,—পথে ঘাটে ভদ্রলোকের মেয়েকে ঠাট্টা করা উচিত কি? তোমারই স্ত্রীকে কেউ যদি এই রকম ঠাট্টা করে, তোমার মন তখন কেমন হয় বল দেখি?"

বালকটীও কমপাত্র নন। তিনি রোখ্ করিয়া উত্তর দিলেন, "তুই কে? তুই আমাকে বল্‌বার কে?"

বালককে আর অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইল না। কালাচাঁদ তৎক্ষনাৎ অমনি তাহার গালে এক দারুণ চপেটাঘাত করিলেন। বালক ঘুরিয়া পড়িবার যো হইল। কালাচাঁদ তাহার কাণ ধরিয়া বলিলেন, "ফের যদি তুমি স্ত্রীলোককে এরূপ ঠাট্টা তামাসা কর, তাহা হইলে, এই দেওয়ালে নাক্ ঘসাড়ে মুখ দিয়ে রক্ত বা'র ক'রে দিব।" বালক বা অর্দ্ধ-যুবক এইরূপে উত্তম-মধ্যম পুরস্কার পাইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে চলিয়া গেল।

কালাচাঁদ তখন বধূর শাশুড়ীকে বলিলেন, "মা, তুমি বউ লইয়া ঘরে যাও,—কোন ভয় নাই।"

তাঁহারা উভয়ে হদ্দ দু রশিপথ গিয়াছেন, এমন সময় চারি পাঁচটা ধেড়ে-বালক লাঠী লইয়া কালাচাঁদকে মারিতে আসিল। যে বালকটী মার খাইয়াছিল, সে পশ্চাৎ হইতে আঙ্গুল বাড়াইয়া কালাচাঁদকে দেখাইয়া দিল, ঐ লোকটা আমায় মেরেচে।' কালাচাঁদ কোনও বাক্যব্যয় না করিয়া, শীঘ্রহস্তে একজনের হাত হইতে লাঠী কাড়িয়া লইয়া প্রত্যেক বালকের পশ্চাতে, এক এক লাঠী বসাইয়া দিলেন। বালকগণ বেগতিক বুঝিয়া, রণে ভঙ্গ দিয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইল।

রাসমণির ঘাটে তাঁহাকে আরও একবার এইরূপ লাঠী ধরিতে হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, কুলকামিনীর প্রতি তাঁহার কিছু ভক্তি অধিক দেখা যাইত। তিনি বারবিলাসিনীগণকে নিতান্ত উপেক্ষা করিতেন। ছোট ছোট মেয়েকে আদর করিতে বড় ভাল বাসিতেন।

কালাচাঁদের আর এক রোগ ছিল, ইদানীং স্ত্রীলোকের সহিত কথা কহিতে, বা স্ত্রীমণ্ডলীতে বসিতে সাধারণত বড় বিরক্ত

বোধ করিতেন। এই জন্য বন্ধু পতিতপাবন কালাচাঁদের এক নাম দিয়াছিল "হুড়্‌কো।"

সেই কালাচাঁদ আজ অন্দরে মেয়ে-দল-মাঝে কেমন করিয়া তিষ্ঠিবেন! কাহারও মল ঝম্‌ ঝম্‌ করিবে, কেহ হয়ত ফিক্‌ করিয়া হাসিয়া উঠিবে, কেহ হয়ত দুটা রসের কথা কহিবে, এ সব কালাচাঁদের সহ্য হইবে না। এসব কাণ্ডে কালাচাঁদের গাত্রে যেন বিষম সুড়সুড়ি লাগে। বিশেষ খাটে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলে, তাঁহার নাক ডাকিবে, সে ডাক শুনিয়া মেয়েরা কতই না তামাসা ইঙ্গিত করিবে!! আরও এক বিশেষ কথা,—কালাচাঁদ খাটে শুইয়া আছেন, এমন সময় জানেলার ফাঁক দিয়া কোন কামিনী যদি তাঁহাকে লুকাইয়া উঁকি মারিয়া দেখিয়া ফেলেন, তাহা হইলেইত মৃত্যু! একেবারে আধ্যাত্মিক মৃত্যু! বৈদ্যুতিক মৃত্যুতে বরং সময় লাগে, কিন্তু এ মৃত্যু ঘটিতে মোটেই সময় লাগে না।

মার, ধর কাট,—কালাচাঁদ কিছুতেই অন্দরে শুইতে সক্ষম হইবেন না। লক্ষ টাকা নগদ গণিয়া দাও,—কালাচাঁদ বলিবেন "মা লক্ষ্মী মাথায় থাকুন, টাকায় আমার কাজ নাই, আমি অন্দরে শুইতে পারিব না।"

আজ লইয়া প্রায় তিন দিন কালাচাঁদ একরূপ অনাহারেই আছেন। অন্ন বিনা দেহ দুর্ব্বল। কালাচাঁদ ইতিপূর্ব্বে আশা করিয়াছিলেন, সদর বাটীতে পৌঁছিয়া, কোন এক ছল করিয়া, ঠাকুরদাদার অনুমতি লইয়া বাজারে গিয়া আড়াই সের রসগোল্লা খাইয়া আসিবেন। কিন্তু সে আশাও বুঝি নির্ম্মূল হয়। আশা নির্ম্মূল হউক, তত ক্ষতি নাই, কিন্তু না খাইয়া কতদিন বাঁচিব?

কালাচাঁদ ভাবিতেছেন, এখনি কেহ আসিয়া আমাকে যদি খুন করিয়া ফেলে, তাহা হইলে আমি এ যাত্রা বাঁচিয়া যাই। খুন করিবার লোক যদি কেহ না থাকে, তবে কেহ অনুগ্রহ করিয়া অন্ততঃ একটু বিষ দান করুন, কালাচাঁদ তাহাই আজ পূর্ণ আহ্লাদে পরিতৃপ্ত হইয়া ভোজন করেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

প্রকৃতই কালাচাঁদ আজ অতি ঘোর বিপদে নিপতিত হইয়াছেন। ঠাকুরমার ভালবাসাময় বাক্যে তিনি আজ মুগ্ধ। এমন মিষ্ট কথা তাঁহাকে কেহ ইহ জন্মে বলেন নাই। এমন প্রাণভরা-আদর, এমন বুকভরা স্নেহ,—এমন মনোহর কথা তাঁহার অদৃষ্টে আর কখন ঘটে নাই! ঠাকুরমার মধুমাখা কথায় তাঁহার হৃদয়ে আজ সুধা-বর্ষণ হইয়াছে। হৃদয়ের প্রত্যেক তারে স্নেহের আঘাত লাগিয়াছে। কালাচাঁদ পুলকিত, কণ্টকিত, মোহিত। এই স্নেহময়ী ঠাকুরমার আদেশ কেমন করিয়া কালাচাঁদ লঙ্ঘন করিবেন?—তাই তিনি অতিঘোর বিপদে পতিত।

করুণাময়ীও কালাচাঁদকে স্নেহ করিত। কিন্তু সে স্নেহ, আর এ স্নেহ কালাচাঁদের কাছে স্বর্গ মর্ত্ত্য প্রভেদ। সে স্নেহ কেবল গায়ে লাগিত, কিন্তু কালাচাঁদের অন্তরে বাজিত না; কিন্তু ঠাকুরমার স্নেহ দেহ চিনে না, বুঝে না, মানে না,—তাহার সম্পর্ক কেবল অন্তরের সহিত। ঠাকুরমা দেবী, করুণাময়ী মানবী। ঠাকুর মা

দেবপূজ্য অমৃত, করুণাময়ী মানবপূজ্য মিষ্টান্ন। ঠাকুরমা চৌতাল, করুণাময়ী আড়্‌খেমটা।

করুণাময়ীই কালাচাঁদকে বিষম ভাল বাসিয়াছিল। কিন্তু কালাচাঁদত সে ভালবাসার সম্যক্ প্রতিদান দিতে শিখেন নাই,—ভালবাসার বিনিময়ে তাদৃশ ভক্তি প্রত্যর্পণ করেন নাই। কিন্তু ঠাকুরমা কালাচাঁদের নিকট হইতে স্নেহের বিনিময়ে পূর্ণমাত্রায় অথবা অধিকমাত্রায় ভক্তি ফিরাইয়া পাইয়াছেন। করুণাময়ীর ভালবাসা একহাতে তালি—তাই ভাল বাজে নাই। ঠাকুরমার ভালবাসা,—কালাচাঁদের কাছে দুই-হাতে তালি,—সমানে সমান।

তবে কি কালাচাঁদ করুণাময়ীকে আদৌ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন না? করিতেন কিন্তু তাহা যেন কর্ত্তব্যকর্ম্মের অনুরোধে করিতেন। করুণাময়ীকে শ্রদ্ধা করা উচিত, সেইজন্য তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। করুণাময়ীর দারিদ্র্য-দশায়, করুণাময়ীর উত্তেজনায়, করুণাময়ীর দুঃখ দূরীকরণার্থই তিনি কেবল চাকুরি করিতে বাহির হইয়াছিলেন। করুণাময়ীকে ভরণপোষণ করা উচিত, তাই কালাচাঁদ পর-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া, অর্থোপার্জ্জনের জন্য মাষ্টার হইয়াছিলেন। নচেৎ কালাচাঁদ কিছুতেই চাকুরী করিতে স্বীকৃত হইতেন না। তিনমাস পরে, কালাচাঁদ বার টাকা মাহিনাস্বরূপ প্রাপ্ত হন। সেই বার টাকা লইয়া তিনি বর্দ্ধমানে আসেন। বাসায় আসিয়া দেখিলেন, করুণাময়ী নাই,—বাসাঘরে চাবি বন্ধ। লোকমুখে তিনি শুনিলেন, করুণার মৃত্যু হইয়াছে কালাচাঁদ কাহাকেও কোন কথা বলিলেন না। রাত্রে পাঁচীর ডিঙ্গাইয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক, করুণা যে ঘরে শুইত, সেই ঘরের

মেজের নীচে ঐ বার টাকা পুঁতিয়া রাখিয়া চলিয়া আসিলেন। কালাচাঁদ ভাবিয়াছিলেন, "অর্থের অভাবে অনাহারে করুণা মরিয়াছে, এ অর্থ করুণার; আমার গ্রহণ করা উচিত নয়; এ অর্থ করুণারই থাক্!" এই কারণেই ঐ দ্বাদশ মুদ্রা মাটীতে প্রোথিত হইয়াছিল। ইহাকে বালকত্ব বল, পাগলামী বল, বা কর্ত্তব্যজ্ঞান বল,—যাহাই বল,—কালাচাঁদের তাহাতে আসিয়া যায় না। মোদ্দা, ঘটনা এইরূপই ঘটিয়াছিল। রাত্রে এই কার্য্য সমাধা করিয়া, কালাচাঁদ কালবশে, যে গ্রামে তাঁহার মাষ্টারি, সেই গ্রামে রাত্রি-শেষে গিয়া উপস্থিত হন। তারপর তাঁহার বিরুদ্ধে অপবাদ, মোকদ্দমা, কারাবাস—সকলেই জানেন।

কিন্তু ঠাকুমার প্রতি কালাচাঁদের ভক্তি-ভালবাসা অকৃত্রিম,—এখানে কর্ত্তব্যকর্ম্মের কারবার নাই। স্বতঃ-ই কেমন স্নেহ-সাগর উথলিয়া উঠে! ইহা এক ঐশ্বরিক কাণ্ড!

কালাচাঁদের দেহ মন, মরুভূমিবৎ শুষ্ক। তাঁহার মা নাই, তাঁহার বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই—এ সংসারে কেহই নাই। অন্তত আজ আট বৎসর কাল তাঁহার দেহ একদিনের তরেও স্নেহ-জলে অভিষিক্ত হয় নাই। তাঁহার জন্য,—তাঁহার দুঃখে, তাঁহার দুর্দ্দশায় একদিনের তরেও কেহ সরলভাবে অকপট মনে এক ফোঁটাও চোখের জল ফেলেন নাই। একদিনের তরেও তাঁহাকে কেহ "বাছা" বলিয়া সম্বোধন করেন নাই। তাঁহার শরীর যেন শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় খন্ খন্ করিতেছিল।

এতদিন পরে, একেবারে হঠাৎ মূর্ত্তিমতী স্নেহ-দয়া-ভালবাসা কালাচাঁদের সম্মুখবর্ত্তিনী হইল। তিনি একেবারে স্নেহরসে ডুবিয়া উঠিলেন। শ্রান্ত-ক্লান্ত-তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি, হঠাৎ কলসপূর্ণ শীতল

জলপানে বিহ্বল হইয়া উঠিল। কাজেই কালাচাঁদ মজিলেন। ঠাকুরমা-ময় সংসার দেখিতে লাগিলেন।

এহেন ঠাকুরমার কথা কালাচাঁদ প্রতিপালন না করিবেন কিরূপে? ঠাকুরমা, যদি ঠাকুরমা না হইয়া অন্য কোন অসম্পর্কীয় স্ত্রীলোকও হইতেন, এবং সস্নেহে কালাচাঁদকে এই কার্য্যের আদেশ করিতেন, তথাচ কালাচাঁদ সহজে "না" বলিতে সক্ষম হইতেন কিনা সন্দেহ। কেহ মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করিলে, কালাচাঁদ তাঁহার গোলাম। বিশেষ, বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের স্নেহপূর্ণ আদেশ-বাক্য,—তাঁহার নিকট অলঙ্ঘনীয় বলিয়াই যেন মনে হয়। তথাচ তিনি নিজ ঠাকুরমাকেই একবার "না" বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "আমি আজ এখন বাহিরে শুই না কেন?" ইহাতেই বুঝিয়া লউন, কালাচাঁদ কিরূপ ঘোর—ঘোরতম বিপদ্-গ্রস্ত।

কিন্তু পুনরায় যখন স্নেহভরে পিঠে হাত দিয়া ঠাকুরমা কালাচাঁদকে কহিলেন, "আয়, বাছা!—আয়,—তোর ঠাকুরমাকে, কষ্ট দিস্ না।" তখন কালাচাঁদ আর কোনও কথা কহিতে পারিলেন না।

ঠাকুরমা এ কথার কোন উত্তর না পাইয়া মনে মনে বুঝিলেন, কালাচাঁদ ঘরে শুইতেই স্বীকৃত হইয়াছেন, তাই তিনি পথ দেখাইয়া দেখাইয়া অগ্রে অগ্রে চলিলেন।

মাথা ঘুরিয়া উঠিলেও, চোখে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখিলেও, দেহ অবসন্নপ্রায় হইলেও,—কালাচাঁদ ঠাকুরমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তিনি কোন্ দিক্ দিয়া কোথায় যাইতেছেন, কিছুই বুঝিলেন না,—চারিদিকের কোন বস্তুই চাহিয়া দেখিলেন না,—

দেখিতেছেন কেবল ঠাকুরমার চরণ,—এবং যাইতেছেন, কেবল সেই পদানুসরণ করিয়া। কালাচাঁদ কলের পুত্তলী।

ত্রিংলের গৃহে স্বর্ণরজত-খচিত-মহামূল্য খাটে, শ্বেতপদ্মাভা-যুক্ত সুকোমল শয্যায় কালাচাঁদ শয়ন করিলেন। তাঁহার অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্র পূর্ণ-মুদ্রিত হইল। তিনি আছেন, কি নাই, স্বর্গে কি নরকে বোধ হয় তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। কালাচাঁদ সংজ্ঞাহীন সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় পড়িয়া রহিলেন।

তৃতীয় পর্ব্ব সমাপ্ত

কালাচাঁদ।

চতুর্থ পর্ব্ব—মন্ত্রণা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আহারাদির পর, যথা-নিয়মে একটু বিশ্রাম করিয়া ঠাকুরদাদা কাছারি গেলেন। তথায় কাজকর্ম্ম কিছুই করিতে পারিলেন না। অসুখ হইয়াছে বলিয়া, তাকিয়া ঠেস দিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া, তিনি বসিয়া রহিলেন। কাহারও সহিত বিশেষ বাক্যালাপ করিলেন না। বাহ্য-দৃশ্যে বোধ হইল, তাঁহার বুকে যেন কিরূপ একটা বিষম ব্যথা লাগিয়াছে।

বৈশাখের বেলা। তথাচ পাঁচটা না বাজিতে বাজিতেই, জজ সাহেব উঠিবার পুর্ব্বেই, ঠাকুরদাদা পাল্কী চড়িয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। ঘরে আসিয়াই শুনিলেন, কালাচাঁদ এই মাত্র বাটী হইতে চলিয়া গিয়াছেন। শুষ্ক মুখ আরও শুষ্ক হইল;—শরীরে স্বাস্থ্য নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই,—সদাই কেমন অন্যমনস্ক-ভাব। লোকের সহিত দুই একটা কথা কহিলেন বটে, কিন্তু সে-কথা কেমন ছোড়ভঙ্গ,—আদি-অন্তে মিল নাই। বাটীর ভিতর সন্ধ্যাহ্নিক করিতে গেলেন বটে,—কিন্তু নিয়মিত জলখাবার খাইলেন

না;—বলিলেন, ক্ষুধা নাই, অম্বলে কেমন বুকটা জ্বালা করিতেছে! বাহিরে আসিয়া, তিনি এক তাকিয়া ঠেস দিয়া পড়িলেন।

প্রাতঃকালের কথা-মত রামঠাকুর বহুপূর্ব্বেই, বেলা চারিটা না-বাজিতেই, দেওয়ানজীর বাসায় আসিয়া ঘুঘু-পক্ষীটার মত বসিয়া-ছিলেন। কাছারী হইতে প্রত্যাগমন-কালে দেওয়ানজীর পাল্কীর শব্দ পাইয়া, রামঠাকুর তাঁহাকে আগবাড়াইয়া আনিতে পথে দৌড়িয়া যান। পাল্কী হইতে নামিয়া কর্ত্তা কিন্তু তাঁহার সহিত কোন কথা কহিলেন না। রামঠাকুর কর্ত্তার পশ্চাৎ-পশ্চাৎ বৈঠক-খানার উপর আসিলেন। কাছারীর কাপড় ছাড়িয়া কর্ত্তা অন্দরে জল খাইতে গেলেন। ফিরিয়া আসিয়া, তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিলে ব্রাহ্মণ-রামঠাকুর, কায়স্থ কর্ত্তার ঠিক পদপ্রান্তে গিয়া উপবেশন করিলেন। কর্ত্তা তথাচ কোন কথা কহিলেন না। তখন রাম-ঠাকুরের পেট ফুলিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে কর্ত্তা ভাঙ্গা-ভাঙ্গা-সুরে বলিলেন, "ঠাকুর-মোশাই! আমার কপালে হাত দিয়া দেখ'ত, গরম হয়েচে কি না?"

রামঠাকুর কপালে হাত না দিতে-দিতেই বলিয়া উঠিলেন, "উঃ, খুব গরম দেখ্‌চি যে! ভয়ঙ্কর গরম!"

বাস্তবিক তখন কর্ত্তার মাথা বা কপাল তাদৃশ গরম ছিল না। বৃদ্ধবয়সে, সন্ধ্যাকালে, দুর্ভাবনার সময় যেরূপ স্বাভাবিক একটু ঈষৎ গরম হয়, সেইরূপই হইয়াছিল। তবে রামঠাকুর এরূপ অত্যধিক গরমের কথা বলিলেন কেন?

রামঠাকুর কর্ত্তার হৃদয় বুঝিতেন। কর্ত্তার অভিপ্রায় ছিল, তাঁহার কপালটাকে এ-সময় সকলে গরম বলুক। কাজেই রাম-ঠাকুর, কপাল গরম না হইলেও, উহাকে গরম বলা একান্ত কর্ত্তব্য

ঠাকুরদাদার অম্বলের অসুখ।



[১০৯

বলিয়া বিবেচনা করেন। বিশেষ, কর্ত্তা যদি বলেন, আমার অমুক অসুখ করিয়াছে;—তদুত্তরে কেহ যদি প্রতিবাদ করিয়া বলেন, "না, ও কিছু নয়,—আপনি বেশ আছেন";—তাহা হইলে কর্ত্তা প্রকৃতই দুঃখিত হন, কখন বা রাগও করিয়া থাকেন।

কপালটী ভয়ঙ্কর গরম সাব্যস্ত হইলে, কর্ত্তা আবার বলিলেন, "আমার বুকটা খুব জ্বালা করিতেছে, বোধ হয় আজ ভারি অম্বল হয়েছে।"

রামঠাকুর অমনি কর্ত্তার বুকে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "হাঁ, বটে, বুকটা খুবই জ্বালা করিতেছে;—এত অম্বল হ'লো কিসে?"

কর্ত্তা। আজ দ্বিপ্রহরে গুরুপাক জিনিষ ভোজন হয়েছে,—

রামঠাকুর। আপনি খেলেন কেন? আপনি গিন্নীর কথা শুনেন কেন? আহা! গৃহিণী নন্ ত—যেন সাক্ষাৎ ভগবতী! গৃহিণীর গুণেই সংসার! আমি বাড়ীর ভিতর খেতে ব'স্‌লে, গিন্নী বামুনকে ব'লে দেন, "ঠাকুরের পাতে আরও সন্দেস দে, আরও সন্দেস দে!" আমি খেতে পারবো না, তবু গিন্নী ছাড়িবেন না। আহা! এমনি তাঁর লোকের প্রতি স্নেহ যত্ন।

কর্ত্তা এ-সব কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "দেখ, ঠাকুর-মোশাই! আজ বড় অসুখ হয়েছে—"

রামঠাকুর। (বিস্ময়ে) বলেন কি? বলেন কি? ছিরাম কবিরাজকে ডেকে আন্‌ব না কি? চাদর লইব নাকি? অসুখইত বটে,—তাই'ত!—ঘোরতর অসুখ!

কর্ত্তা। না, এখন আর কবিরাজকে ডাকিতে হইবে না। একটু ঘুমাইলেই সারিতে পারে। একবার ঘুমাইবার চেষ্টা দেখি—

এ কথা শুনিয়া রামঠাকুর বড়ই বিষণ্ণ হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা

ছিল, বড়কর্ত্তার অসুখ হইয়াছে,—দেওয়ানজীর অম্বলে প্রাণ যায়-যায় হইয়াছে;—এই ব্যাপার লইয়া অন্তত রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত তিনি একটা হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি করিবেন। কবিরাজ আসিলে তাঁহার নিকট হইতে বল-বৃদ্ধির একটী বটিকা লইয়া তিনি নিজে খাইবেন। অন্দরের দ্বারে একবার দৌড়িয়া গিয়া গিন্নীকে উদ্দেশ করিয়া সংবাদ দিবেন, "কর্ত্তার অসুখ একটু কমিয়াছে, কবিরাজ আসিয়া ঔষধ দিয়াছেন, কোন চিন্তা নাই।"—কিন্তু ইহার মধ্যে কোন কামনাই পূর্ণ হইল না।

দুঃখের উপর দুঃখ। কর্ত্তা যদি ঘুমাইয়া পড়েন, তাহা হইলে ত ভোলা-ময়রার কথা, মনোমোহিনী ময়রাণীর কাহিনী, দোকানে চাবি-ভাঙ্গা সন্দেশ খাওয়া—এ-সব কথা ত কিছুই উত্থাপন করা হইল না! না জানি, কি অশুভ-ক্ষণেই অদ্য যাত্রা করিয়াছিলাম। বারবেলায় কি বাহির হইয়াছিলাম?—

রবৌ বর্জ্জ্যং চতুঃপঞ্চ
সোমে সপ্তদ্বয়ং তথা।

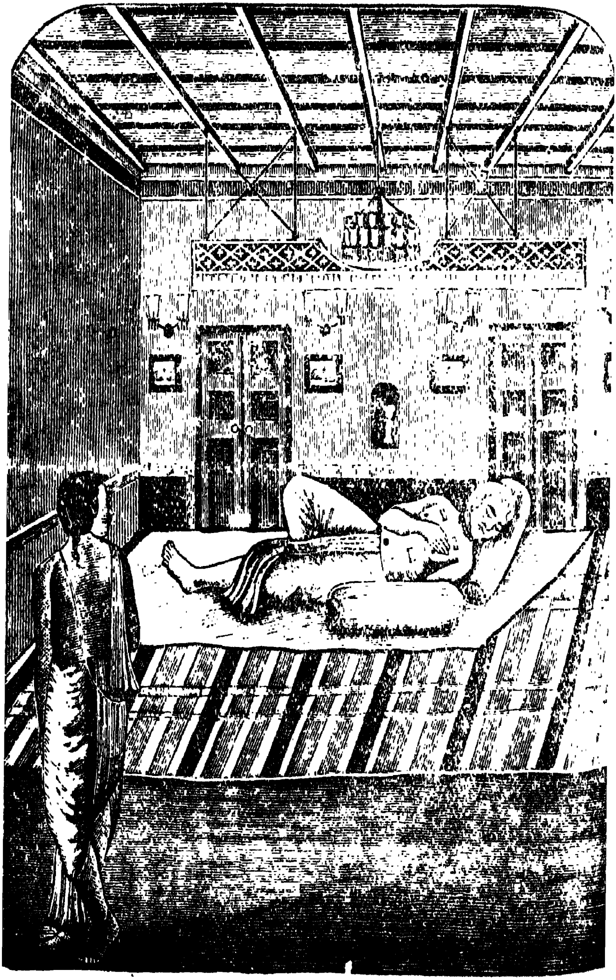
তাহাও নহে! বোধ হয় যাত্রাকালে কেহ হাঁচিয়া থাকিবে! অথবা পথে ধোবা দেখিয়া থাকিব!

রামঠাকুর এইরূপ চিন্তা করিতেছেন,—এমন সময় কর্ত্তা আবার বলিলেন, "ঠাকুর-মোশাই! তুমি যাবার সময় চাকরদিগে ব'লে যাওত, আমার কাছে যেন কোন লোকজন আজ না আসে। কেহ জিজ্ঞাসিলে চাকরেরা যেন বলে "কর্ত্তার অম্বলে বুকজালা ক'রে অসুখ হয়েছে, তাই তিনি ঘুমিয়েছেন।"

রামঠাকুর। হঠাৎ এমন অসুখটা কিসে হলো?

কর্ত্তা, সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "যদি কালা-

রামঠাকুরের ঠাকুরদাদা—দর্শন।



চাঁদ আসে, তবে তাকে না হয় আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে ব'লো।"

রামঠাকুর ভাবিতে লাগিলেন, "তাই'ত!—গতিক কি?—আমাকেও উঠিয়ে দিতেছেন!—আস্‌বে কি না সেই কালা-চাঁদটা?—সেটার সঙ্গে এত ভাব কিসে হলো?—"

কর্ত্তাকে কোন বিষয়ে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করিবার তাদৃশ ক্ষমতা রামঠাকুরের নাই। কাজেই তিনি কালাচাঁদ-সম্বন্ধিনী কোন কথা কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা করিতে সক্ষম হইলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রামঠাকুর কি করেন,—উঠিয়া যাইতেই বাধ্য হইলেন। তথাচ তিনি উঠিতে একটু বিলম্ব করিতে লাগিলেন।—ইচ্ছা,—যদি একটুকু সময়ের মধ্যে কর্ত্তা তাঁহার সহিত আরও দুই একটী কথা কহেন। কর্ত্তা কিন্তু নীরবই হইয়া রহিলেন,—আর একটীও বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। তখন অগত্যা রামঠাকুর উঠিলেন,—দাঁড়াইলেন। এমনি ধীরে ধীরে আলস্যের সহিত দাঁড়াইলেন, যেন, দাঁড়াইতেও দুই মিনিট সময় লাগিল। তার পর, পদ-বিক্ষেপ। এই প্রথম পাদক্ষেপেও বুঝি এক মিনিট সময় অতি-বাহিত হইল। অনন্তর, মুখ ফিরাইয়া পশ্চাৎদিক্ সন্দর্শন। "শুন, ঠাকুরমোশাই, শুন, বলি"—কর্ত্তা তাঁহাকে এই বলিয়া ডাকিবার উপক্রম করিতেছেন কি না, বুঝি ইহা দেখাই তাঁহার

পশ্চাতে মুখ ফিরাইবার উদ্দেশ্য। তদনন্তর এককালে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ পদবিক্ষেপ। অতঃপর উঁকিঝুঁকি মারিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত। দেখিতে দেখিতে রামঠাকুর উঠানে গিয়া পড়িলেন।

রামঠাকুর অবশেষে দেখিতে পাইলেন, কাঁধে চাদর ফেলিয়া দ্রুতপদে একটা লোক আসিতেছে।

রামঠাকুরকে কোন কথা কহিতে হইল না, সে লোকটা ঈষৎ দৌড়িয়া আসিয়া দণ্ডবৎ করিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া এই ভাবে কাতর কণ্ঠে, বলিল, "আপনারা আমায় রক্ষা করুন, আমি ধনে প্রাণে মরিলাম।"

রামঠাকুর। কেহে! ভোলানাথ নাকি? হাঁ—হা, সব শুনেচি! একটু আস্তে কথা কও। কর্ত্তার বড় অম্বলের অসুখ করিয়াছে। বোধ হয়, তাঁর একটু নিদ্রা এসে থাকবে।

ভোলানাথ। আজ্ঞে, আমি কর্ত্তা-মোশায়েরই শরণ নিতে এসেচি। তিনিই দেশের রাজা,—আমরা তাঁর সন্তান তুল্য। তিনি না রাখ্‌লে, আমাদিগকে আর কে রাখ্‌বে?

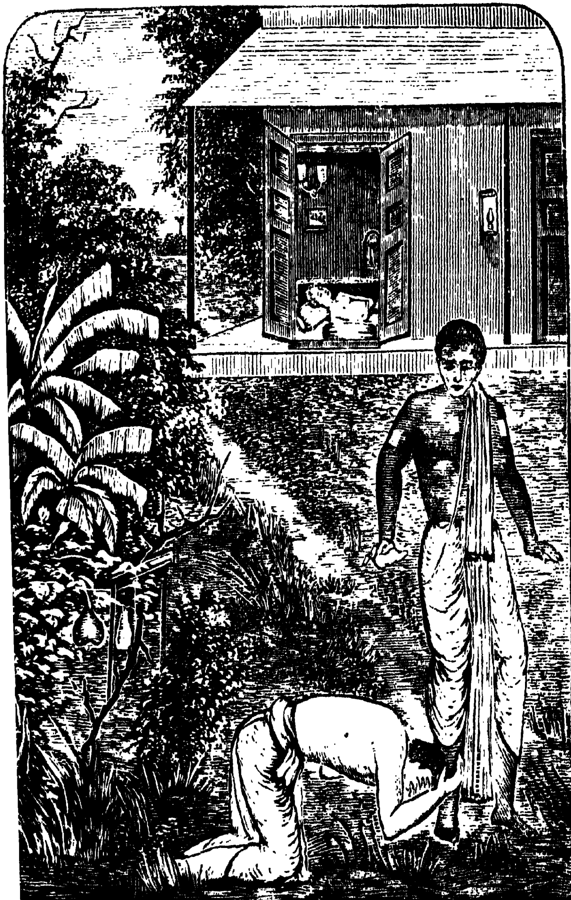
রামঠাকুর। ঠিক,—ঠিক!

ভোলানাথ! আমি গরীব মানুষ; কোথা কি পাবো? কর্ত্তা মোশায়ের জন্যে এই আটটী টাকা নজর এনেচি। এই ক্ষুদ-কুঁড়ো কটী পান খেতে নিয়ে আমাকে রক্ষা কত্তে হবে।

এই বলিয়া ভোলানাথ ট্যাক্ হইতে টাকা খুলিয়া লইয়া হাতে রাখিল।

কর্ত্তা এতক্ষণ নয়নদ্বয় মুদ্রিত করিয়া নীরবে নিদ্রিত ছিলেন। টাকার শব্দ শুনিয়া জাগিলেন। চক্ষু চাহিয়া বলিলেন, "ভোলা নাকিরে!"

রামঠাকুরের চরণে ভোলানাথের পতন



A. T. DHUR.

ভোলানাথ। আজ্ঞে, কত্তা-মোশাই, আমাকে এ-যাত্রা মুক্ত হবে।

এই বলিয়া ভোলানাথ কর্ত্তার নিকট পৌঁছিল।

কর্ত্তা। তোর কি হয়েচে?

ভোলানাথ। সে কথা আর কি বলবো?

এই বলিয়া ভোলানাথের ক্রন্দন।

কর্ত্তা। বল্‌না কি হয়েচে? কেবল কাঁদ্‌লে কি হবে?

ভোলানাথ। আজ্ঞে, কাল রাত্রে কখন্ আমার দোকানে চুরি হয়েচে, তার আমি বাপ্প কিছুই জানি না। একখুলি রসগোল্লা চোরে খেয়েছে, একহাঁড়ী ক্ষীর খেয়েচে আর বাক্সভেঙ্গে নগদ ৯৲ টাকা নিয়েচে।

কর্ত্তা। তোর বাক্সে কত টাকা ছিল।

ভোলানাথ। একশ' টাকা সাড়ে বার আনা ছিল।

কর্ত্তা। এ কি রকম কথা হ'লো? ৬১৸১০ টাকার মধ্যে চোর লইল ৯৲,—বাকী টাকা রাখিয়া গেল কেন?

ভোলানাথ। এই জন্যই ত আজ মারের চোটে আমার পিঠের চামড়া উঠে গেছে! চোরে ৯৲ টাকা নিলে,—১০৲ টাকা নিলে না, কি ১৫৲ টাকা নিলে না, কি সব টাকাই নিলে না,—তার আমি কি করবো? চোরের মনের মৎলব আমি কি ক'রে ব'লবো? কর্ত্তা-মোশাই! আপনি তো দেশের রাজা—আপনিই এর বিচার করুন।

কর্ত্তা। আচ্ছা, তোর মার খেয়ে পিঠের চামড়া গেল কেন?—তোকে মেরেচে কে?

ভোলানাথ। আজ্ঞে, এই, দারোগা মোশাই মেরেন। তিনি

ব'ল্লেন,—বল্ এখনি,—কে চুরি করেচে? না ব'ল্লে এখনি তোকে কড়ীকাঠে টাঙ্গিয়ে তোর্ এক হাত জিব বা'র্ ক'রে ফেল্‌বো।

কর্ত্তা। তার পর কি হ'লো?

ভোলানাথ। আজ্ঞে, আমি তাঁকে বুঝিয়ে ব'ল্লাম—'চোর কে,—তাই যদি আমি জান্‌বো, তবে আমি থানায় খবর দিতে আস্‌বো কেন? জান্‌লে,—একবারে চোরের টুঁটী ধরে এনে, তাকে জেলখানায় সাঁদ ক'রে দিতাম।' এই কথা শুনে, দারোগা-মোশাই আরও রাগ ক'রে বল্লেন, "ভোলা, তুই বেটা পাকা বদমাস্,—সোজা কথায় বল্‌বি ত বল্ নইলে তোর্ পিঠে ২৫ জুতা লাগাবো।" ওই কথা শুনে আমি ভয়ে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লাম,—যোড়হাতে দারোগা-মোশাইকে ব'ল্লাম, 'দোহাই খোদাবন্দ! আমায় রক্ষা করুন,—আমি এর ভাল মন্দ কিছুই জানি না।'

কর্ত্তা। তার পর—

ভোলানাথ। দারোগা-মোশাই আরও রাগ ক'রে খুব চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "ভোলা! তুই ব্যাটা, ছেলে-ভুলুস্ কা'কে? নৌকাভাড়া ক'রে চোর এসে বাক্স-ভেঙ্গে ৯৲ টাকা নিয়ে গেল, আর ৫২৬১০ টাকা তো-ব্যাটার জন্যে রেখে গেল—নয়?—ভোলা! তুই ন্যাকা বুঝুস্ কা'কে? নিশ্চয় তুই নিজে চুরি করেচিস্—নয়,—চোর তোর ঘরেই আছে?—চোরে চুরি কত্তে এলে, পাহারাওয়ালাদের কাছে থেকে সে কি আর ফিরে যেতে পাত্তো? এটা চুরি নয়,—যেন একটা রঙ-তামাসা পড়ে গেছে,—মার্ শালাকে!"

ভোলানাথ এইবার আওয়াজ একটু গম্ভীর করিল। ধীর-স্বরে সাধুভাষায় সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল,—"দেওয়ানজী-

মোশাই! আপনি ধন্মাবতার। ঐ উপরে ভগবান্, নীচে আপনি। আপনার কাছে আমি মিথ্যে কথা বল্‌বো না। দারোগা-মোশাই, একজন চৌকীদার দিয়ে, জুতো মেরে আমার পিঠ ছিঁড়ে দিয়েচেন! পিঠ ফেটে রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌লো। তখন আমাকে রোদে বসিয়ে রাখ্‌লেন্। আমি কি করি,—বেলা যখন তিতীয় পহর, তখন পাঁচটী টাকা দারোগামোশাইকে পান-খেতে দিয়ে তবে বাড়ী আস্‌তে পাই। দারোগা-মোশাই ব'লে দিয়েচেন, 'চোরের সন্ধান তোকে ক'রে দিতেই হবে।—যদি আজ একান্ত চোর না পা'স্, তবে কাল তোকে চোরকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌তেই হবে!' এ বিপদে আর কার কাছে যাব?—তাই আপনার কাছে এসেচি,—আপনি ছিমধোস্দন,—আমাকে রক্ষা করুন।"

এই বলিয়া ভোলানাথ কর্ত্তার পদপ্রান্তে তাহার মস্তক ন্যস্ত করিল। কর্ত্তা বলিলেন, "ভোলা! ওঠ্, ওঠ—ভয় কি?"

ভোলানাথ আটটী টাকা কর্ত্তার বিছানায় রাখিয়া দিল।

কর্ত্তা বলিলেন, "ও—কি—ও?—"

ভোলানাথ। আজ্ঞে, এই পান-খেতে যৎকিঞ্চিৎ নিয়ে এসেচি—

কর্ত্তা। টাকা তুই ফিরে নিয়ে যা,—টাকায় আমার কাজ কি? হেঁরে ভোলা! তোকে কি আর আমায় টাকা দিতে হয়?—

ভোলানাথ। (যোড়-হাতে) আজ্ঞে, আপোনার ছিচরণ মনে করে, এই ক্ষুদ-কুঁড়ো-কটী এনেচি,—এ আপনাকে নিতেই হবে—

কর্ত্তা। ওরে ভোলা! তুই আগে খালাস হ',—তারপর

আমাকে না হয়,—দুসের সন্দেস দিস্,—টাকা এখন ফিরে নিয়ে যা—

ভোলানাথ। আজ্ঞে হুজুর! ছোট ধামি ক'রে আজ আড়াই-সের সন্দেস আপনার জন্তে আন্‌ছিলাম,—বাঁ-কাঁধে ধামিটা বসানো ছিল, সন্ধ্যে তখন হয়ে গেচে,—ঠিক বারোয়ারির কাছে, একটা লোক পেছুপেছু এসে ধামিটা তুলে নিয়েই দৌড়্ মার্‌লে! আমার মুখ দিয়ে আর কোন কথা বেরুল না,—আমি অমনি 'থ' হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেম্।

কর্ত্তা। বলিস্ কিরে? সত্য না কি?—

ভোলানাথ। দেওয়ানজী-মোশাই! এ চূণের ঘরে আমি মিথ্যে কথা বল্‌বো না,—আমি লজ্জায় ও ভয়ে এতক্ষণ এ কথা বলি নাই। দারোগামোশাই যদি শোনেন, তা'হলে বোল্‌বেন,—তুই এ চোরটাকেও ধ'রে নিয়ে আয়।

কর্ত্তা। সন্দেসের ধামি তুলে নেবার পর, তুই কি কোন কথা কইলি না?—

ভোলানাথ। আজ্ঞে, একটু পরে, আমি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেম,—'চোর! চোর! ঐ সন্দেস নিয়ে যায়,—সন্দেস নিয়ে যায়।' সে চোরটা ঠিক যেন যমদূতের মত। হি-হি ক'রে একটা বিতি-কিচ্ছি হেসে, বাঘের মত লাফ দিতে দিতে, পাশের গলির ভিতর ঢুকে গেল।

কর্ত্তা। আশ্চর্য্য কাণ্ড বটে! সন্ধ্যাবেলা সদররাস্তায় ডাকাতি! লোকের রাস্তা-চলা ভার হলো দেখ্‌চি।

ভোলানাথ। লোকের আর কি হচ্ছে? আমারই উপর শনির দিষ্টি পড়েচে,—কাল রাত্রে আমারই ঘরে চুরি হলো, আজ

রাত্রে আমার হাতথেকে সন্দেশের থামি তুলে নিয়ে গেল। এই দেখুন না, দেওয়ানজী-মোশাই! হুগলী সহরের মধ্যে আর কার কি হয়েচে?

রামঠাকুর এতক্ষণ নীরব ছিলেন। তিনি পুলকে পূর্ণ হইয়া, একান্তমনে এই গুরুগল্প শুনিতেছিলেন। কিন্তু তিনি আর থাকিতে পারিলেন না,—বলিয়া উঠিলেন, আচ্ছা, কর্ত্তা-মোশাই! একটা মজা দেখেচেন,—সন্দেসই কেবল চুরি হচ্চে!! টাকা-কড়ি গেল,—সোণা-দানা গেল,—চুরি হচ্চে কেবল ক্ষীরসন্দেস আর রস-গোল্লা! যেন রঙ্গরসের তরঙ্গ-বয়ে চলেচে। এটা চুরি নয়,—ঠিক যেন শালা-ভগিনীপতির তামাসা আরম্ভ হয়েচে!—ভোলা-নাথ! তুমি ঠিক্ ব'লো, এর ভিতর গুপ্ত রহস্য আছে কি না? কর্ত্তার কাছে সে সব কথা বল্‌তে দোষ নাই!—আর এখানেই বা অন্য কে আছে।

এইরূপ কথা কহিতে পাইয়া, রামঠাকুরের অন্তরে আর আনন্দ-রস ধরে না,—যেন উপ্‌চিয়া উঠিবার উপক্রম হইল। যিনি পল-কার্দ্ধ-কালের জন্য বসিবার তিলার্দ্ধমাত্রও স্থান প্রাপ্ত হন নাই, এক্ষণে তিনিই এককাঠা-প্রমাণ স্থান-জুড়িয়া বসিয়া অনন্ত সময় প্রাপ্ত হইলেন;—তাঁহার আনন্দ হইবে না ত কি? যিনি হৃত-সর্ব্বস্ব, অবমানিত হইয়া বিতাড়িত হইতেছিলেন, তিনিই এখন রাজরাজেশ্বর হইয়া সর্ব্বসুখভোগ করিতে লাগিলেন;—তাঁহার আনন্দ হইবে না ত কি?

ভোলানাথ, রামঠাকুরের কথায় যোড়-হাতে উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, আমি গরীব-মানুষ;—আমার শালাও নাই, ভগ্নিন-পো'তও নাই! ঠাকুর-মোশাই! আমি কিছুই জানি না!—আমি আপনাদের শরণ নিয়েচি, আমাকে রক্ষা করুন!"

রামঠাকুর। তুমি আমার কাছে মিথ্যা ব'লো না!—আমি সব জানি। তার আর লজ্জা কি?—খুলে বল,—কোন ভয় নেই!

ভোলানাথ। (ম্লানমুখে) ঠাকুর-মোশাই! আমি সত্যিই বল্‌চি—আমি ভাল মন্দ কিছুই জানি না।—আমি বড় গরীব!

ভোলানাথের চক্ষু দিয়া টস্-টস্ জল পড়িতে লাগিল। ভোলানাথের ভাবনা হইল, এ-যাত্রা বুঝি আর উদ্ধার নাই। আমি বুঝি ধনে প্রাণে মজিলাম! ও-বেলা দারোগা আমায় আধ-মারা করেচেন! এ-বেলা, রামঠাকু ও ঠিক সেই সুরে কথা আরম্ভ করেচেন। এখানেও কি আমাকে শেষে মারখেতে হবে?

ব্যাপার কথঞ্চিৎ বুঝিতে পারিয়া কর্ত্তা বলিলেন, "ভোলা! তুই আজ ঘর যা! তোর কোন ভয় নাই। আমার বড় অসুখ করেচে—"

ভোলানাথ। আজ্ঞে, আমি তবে চল্‌লাম! কিন্তু এ গরীবকে ভুল্‌বেন না! আমি বড় গরীব! আমার কেউ নাই!

ভোলনাথ উঠিবার উপক্রম করিল। কর্ত্তা কহিলেন, "টাকা রেখে যাচ্চ যে!"

ভোলানাথ দন্ত বাহির করিয়া কাতরস্বরে কহিল,—"আজ্ঞে—আজ্ঞে!—উটী গরীবকে মাপ করতে হবে! টাকা আমি এ রাজ-কাছারি থেকে নিয়ে যেতে পার্‌বো না—"

কর্ত্তা। ওরে পাগল! তুই আগে খালাস হ'; তা, দেখে আমার আহ্লাদ হোক্। তার পর বিশ পঁচিশ টাকা খরচ ক'রে ৺মদনমোহনের একদিন মোচ্ছব দেওয়া যাবে।

ভোলানাথ। আজ্ঞে! তবে ঠাকুরের মোচ্ছবের জন্ত এখন ৮৲ টাকা রৈল। কাল সকালে আর ১২৲ টাকা আন্‌বো। তা,—এসবই আপনার কাছে গচ্ছিত থাক্‌বে।

কর্ত্তা আর কোন কথা কহিলেন না। ভোলানাথ স্বগৃহে প্রস্থান করিল। রামঠাকুর ক্ষুব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন "তাই'ত—ভোলাবেটাও পালালো! এখন করি কি? উপায় কি?"

বাস্তবিকই রামঠাকুরের বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। দীনদরিদ্রের হস্তে হঠাৎ একটী সাত-রাজার ধন মাণিক আসিল; কিন্তু অর্দ্ধদণ্ড পরে সে মাণিকটী উড়িয়া পলাইল। রামঠাকুরের অবস্থা ঠিক তদ্রূপ! ইহাতে তাঁহার কষ্ট না হইবে কেন?

কর্ত্তা কহিলেন, "ঠাকুর-মোশাই! তবে তুমি যাও।—চাকরদিগে সে কথাটা বলে যেয়ো—"

রামঠাকুরের একটু যেন অভিমান হইল। তিনি আর বাক্যব্যয় না করিয়া শীঘ্র প্রস্থান করিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ-ঠাকুরদাদার উপর শ্রীরাধা-রামঠাকুরের যেন দুর্জ্জয় মান উপস্থিত হইল। বৃন্দাবন-বিলাসিনী শ্রীমতী-ঠাকুর-মোশাই এতক্ষণ বাঁকা বংশীধর শ্রীযুক্ত হরিতারণ দত্তকে একমুহূর্ত্ত না দেখিলে বাঁচিতেছিলেন না,—কিন্তু যাই অভিমান উপজিল, অমনি কৃষ্ণপ্রেম ত্যাগ করিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিলেন।

একটা চাকর কর্ত্তাকে দেখিতে আসিল। কর্ত্তা বলিলেন "প্রদীপটা নিবাইয়া দিয়া কপাট বন্ধ করিয়া যাও।"

কার্য্য, কথানুযায়ী সম্পন্ন হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কেহ যেন মনে না করেন, কর্ত্তার প্রকৃতই আজ অম্বলে বুকজ্বালা করিতেছে। কর্ত্তা বিকারী রোগীর ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া শুইয়া আছেন বটে, কিন্তু ইহা জ্বর-বিকার নহে। পণ্ডিতগণ ইহাকে মানস-বিকার কহিয়া থাকেন। বৈদ্যশাস্ত্রের মতে এ রোগের প্রকৃতি বড়ই ভয়ঙ্করী। জ্বর-বিকারের ঔষধ আছে, কিন্তু এ-বিকারের ঔষধ নাই।

মানস-বিকারে রোগী শীঘ্র প্রাণে মরে না বটে, কিন্তু অষ্টপ্রহর যন্ত্রণায় অস্থির হয়। কিছুতেই সুখ নাই, স্বস্তি নাই, সব শূন্যাকার। কাহারও সহিত কথা কহিতে বা কাহারও কথা শুনিতে, ভাল লাগে না। প্রিয়জন বিরক্তিভাজন হয়। অঙ্গে চন্দন লেপিলে, গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। ক্ষুধা-মান্দ্য হয়। পিপাসা-বৃদ্ধি হয়। কণ্ঠ শুষ্ক হয়। বুক ধড়্‌ধড়্‌ করে। রাত্রে অনিদ্রা ঘটে। মাথা ঘুরিতে থাকে। মনে ত্রাস-যুক্ত হয়। ইচ্ছা হয়, মাটীতে মুখ গুঁজিয়া, চোখ বুজিয়া, চুপ করিয়া কেবল পড়িয়া থাকি, আর ভাবি। কিন্তু তাহাতেও সুখ নাই। প্রাণ কেমন আইঢাই-ছট্‌ফট্‌ করে। তখন মনে হয়, বুঝি গড়াগড়ি দিলেই ভাল থাকিব।

এইরূপ যন্ত্রণায় কাল কাটিতে থাকে। সহজে মৃত্যু হয় না। যেন তুষানলে অঙ্গ অল্পে অল্পে ধীকি-ধীকি পুড়িতে থাকে।

শ্রীযুক্ত রায় হরিতারণ দত্ত বাহাদুর—দেওয়ান-মহাশয়ের মানস-বিকার অদ্য কতমাত্রায় উঠিয়াছে, তাহা সু-স্পষ্টরূপে

সু-পরীক্ষা করিয়া দেখা নাই-ই হউক, মোদ্দা তিনি এ-পাশ ও-পাশ ছট্‌ফট্‌ করিতেছেন

এতই যদি তাঁর কষ্ট, তবে তিনি ভোলা-ময়রার সহিত কথা কহিলেন কেন? সুহৃৎপ্রবর রামঠাকুরকেও যিনি কাছে বসিতে দিলেন না, তিনি ভোলা-ময়রার সঙ্গে অর্দ্ধদণ্ডের অধিক কাল বাক্যালাপ করিলেন কেন?

রামচন্দ্রের সীতা, 'প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী'; দেওয়ানজীর টাকা—'প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।' বালক-বয়স হইতেই তিনি পয়সা ভাল বাসিতেন। আমরুল শাকের রস দিয়া মাজিয়া-ঘষিয়া, ময়লা-পয়সাকে তিনি চক্‌চকে করিতেন। ঝক্‌ঝকে রগ্‌রগে টাকা ভিন্ন, অপরিষ্কার টাকা তিনি কাহারও নিকট হইতে লইতেন না। কোথাও টাকার ঝুন্‌ঝুন্ শব্দ হইলে সেই দিকে কাণ পাতিয়া থাকিতেন;—প্রেমিকের নিকট অপ্সরা-কন্যার নূপুর-নিক্বণের ন্যায়, সে ধ্বনি তাঁহার নিকট সুমধুর, সুন্দর, সুখদ বোধ হইত।

ভোলাময়রা প্রথম যখন রামঠাকুরের সহিত কথাবার্ত্তা কয়, কাতর হইয়া 'রক্ষা কর, রক্ষা কর'—ইত্যাকার শব্দ করে, কর্ত্তা তখন চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বোধ হয় নিদ্রিতই ছিলেন,—বোধ হয় নিদ্রাবস্থাতে বড়ই বিরক্ত হইতেছিলেন। কিন্তু টাকার শব্দে এবং টাকার কথায় তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিল, নয়নদ্বয় উন্মীলিত হইল। তখন ভোলানাথের সকল কথাই তাঁহার কর্ণে সুধা বর্ষণ করিতে লাগিল। ভোলানাথের মূর্ত্তি তাঁহার চক্ষে রতিপতি কামের ন্যায় কমনীয় বোধ হইতে লাগিল। এত যে যন্ত্রণা, এরূপ যে সহস্র বিছার দংশন,—কিছু ক্ষণের জন্য কর্ত্তা বোধ হয় সমস্তই বিস্মৃত হইলেন। একটী হউক, আধটী হউক, লক্ষ হউক, কোটী হউক,—তাহাতে

কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই,—টাকা-জিনিসটাই তাঁহার পক্ষে সর্ব্ব-ব্যাধি-হর, সর্ব্ব-সুখাকর, এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর সামগ্রী।

ভোলাময়রা চলিয়া গেলে কাজেই কর্ত্তা আবার এপাশ ওপাশ ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন।

ব্যাধির কারণ কি?—কিসে হঠাৎ এরূপ নিদারুণ মানস-বিকার উপস্থিত হইল?

ব্যাধির কারণ,—কালাচাঁদ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তা ভাবিতেছেন, "করি কি? উপায় কি? মনে মনে যাহা যাহা ঠিক করিয়া রাখিলাম, সবই কি তাহার বিপরীত হইল? ভাবি এক, হয় অন্য। কেন এমন হয়? এই সুবর্ণ কলসপূর্ণ বিশুদ্ধ দুগ্ধে কেন বিন্দু গোমূত্র পতিত হইতে দিব? পূর্ণিমার শশধরে কলঙ্ক-কালী কেন থাকিতে দিব? এই সোণার সংসারে এই দুরন্ত কালসাপকে কেন বাস করিতে দিব? আজ পঁচিশবৎসর কাল'ত এই চেষ্টাই স্বতঃপরতঃ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু মনোরথ পূর্ণ হইতেছে কৈ? তবে কি সত্যসত্যই বাসনা ফলবতী হইবে না? তবে কি এই বিভীষণ বিষধরই আমাদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে?

"তাও কি কখন হয়? আমি জীবিত থাকিতে—এই হরিতারণ দত্তের দেহে এক ফোঁটা রক্ত থাকিতে,—তাহা কখনই ঘটিতে দিব না। এই হরিতারণের প্রতাপে হুগলী সহরটা কাঁপিয়া উঠে,—ও-

ছিনে-জোঁকটা'ত কোন্ ছার? আমি হুগলীতে একশত খুন করিয়া হজম করিতে পারি!—আমায় কে কি করিবে? আমার ভয় কা'কে? আমি মনে করিলে আজই কালেক্টরি লুটাইতে পারি,—অথচ আমার বিরুদ্ধে একটীও সাক্ষী মিলে না! আমি মনে করিলে, এই দণ্ডে কালাচাঁদকে কাটিয়া টুকরা-টুকরা, করিয়া, তিল-তিল করিয়া গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিতে পারি—অথচ, আমার কেহই কিছুই করিতে পারে না। কেলে-ছোঁড়াটাকে আমার ভয় কি? ওটা'ত শিশু,—বালক,—গলা টিপিলে দুধ বার হয়,—তেঁতুলতলা দিয়ে গেলে ওর গলায় দই বসে,—ওকে আমার ভয়ই বা কি?—ভাবনাই বা কি? ওর আছে কি যে, ওর জন্য আমাকে চিন্তিত হ'তে হবে? কেলে-ভূতোটার বিষয় নাই, জমী নাই, টাকা নাই, বাড়ী নাই, ভিটা নাই, উমুন নাই,—আজ-খায়, এমন সংস্থান নাই;—কিছুই নাই,—তবে ও ছোঁড়াটা আমার সঙ্গে সমান টক্কর দিবে কিসে? জেল-খাটা, ঘানি-টানা, কয়েদ-খালাসি, বদমাইস ফাঁসুড়ে, চোর—ওর আবার হুগলী-সহরে সহায়-সম্পত্তি কে হবে? কার হিম্মতে, কার হেমাকতে, ও গাঁটকাটা-টা আমার সঙ্গে মোকদ্দমা লড়বে? এমন কে আছে,—কার ঘাড়ে এমন দুটা মাথা আছে যে, সে ব্যক্তি কালাচাঁদকে পশ্চাতে করিয়া বিবাদার্থ আমার সম্মুখীন হইতে সক্ষম হইবে? অথবা এমনই বা কে আছে যে, সে ব্যক্তি কালাচাঁদকে সম্মুখে রাখিয়া, পশ্চাৎ হইতে আমার সহিত বিবাদ করিতে সাহসী হইবে? সে কি জানে না, আমি নবাব-বাবুকে জেল খাটাইয়াছি,—প্রাণকৃষ্ণ হালদারকে দ্বীপান্তর পাঠাইয়াছি,—নির্দ্দোষ হরচন্দ্রকে ফাঁসি-কাঠে ঝুলাইয়াছি!—সে কি জানে না, আমি রাণী বিন্দুবাসিনীকে পথের ভিখারিণী করিয়াছি,—জমীদার

জয়কালী মুখুয্যের ভিটায় ঘু-ঘু চরাইয়াছি,—মুচ্ছুদ্দি যাদবদত্তের মাথা প্রকাশ্য রাজপথে দ্বিখণ্ডিত করাইয়াছি? এত জানিয়া-শুনিয়া কে আমার সঙ্গে সম্মুখ-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে? তবে কালাচাঁদকে আমার ভয় কি? ও-ছোঁড়া আমার কি করিতে পারে? ও দুগ্ধ-পোষ্য বালকটা আমার কাছে কোথায় লাগে? আজই ত আমি ওকে মিছামিছি চোর বলিয়া হাতে হাতকড়ি দেওয়াইতে পারি!—ছয়মাস কারাগারে রাখাইতে পারি। দারোগা করিম্ সেখত আমার গোলাম,—গোলামের গোলাম!—তাকে যা বলিব, তাই সে করিবে। দারোগা, দু-বেলা বাসায় এসে যোড়হাত ক'রে দূরে দাঁড়াইয়া থাকে—সে, আমার কথায় কি না করিতে পারে? খবর দিলে, দারোগা আজই রাত্রে ছেলেটাকে ধ'রে বেঁধে নিয়ে যেতে পারে! ওদিকে ডেপুটী বকাউল্লা,—সে'ত পরম বন্ধু। এক-বার তাঁকে চোখের ইঙ্গিত করলে, ছেলেটার এক মুহূর্ত্তেই ছয়মাস জেল হয়ে যাবে! আমি পারি না কি? তবে কালাচাঁদকে ভয় কি?

ভয় কিছুই নাই! তবু মন কেমন ধুক্-ধুক্ করে! কেন এমন হয়? কেন এক একবার বুকের ভিতর গুর্-গুর্ করিয়া উঠে! যাহা ভাবি, যাহা স্থির করি,—কেন তার উল্টা উৎপত্তি হয়? যাহাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিব,—এরূপ সংকল্প ছিল, সে কেমন করিয়া এরূপ বৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় বাড়িয়া উঠিল? যাহার বিলোপ সাধন জন্য, আজ প্রায় পঁচিশ বৎসর কাল স্বতঃপরতঃ চেষ্টা করিয়াছি, সে-ই এখন বড় হইয়া, প্রকাণ্ড মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে মাছ-দই-সন্দেস ভেট দেয়, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে, ভক্তিভরে দাদা বলিয়া ডাকে! তবে কি এই হরিতারণ দত্তের ক্ষমতার

হ্রাস হইয়াছে?—শক্তির লাঘব হইয়াছে? তেজস্বিতা খর্ব্ব হইয়াছে? হরিতারা দত্তের ঈষৎ দৃষ্টি নিক্ষেপে, সামান্য অঙ্গুলি-হেলনে দিক্ সমভূম হয়, কিন্তু আমার এই পঁচিশ বৎসরের তীব্র-কুটিল-কটাক্ষে, বিষম বাহ্বাস্ফোটেও—এই পিতৃমাতৃহীন নেংটী-ইন্দুর কালাচাঁদ, বিশাল শাল-বৃক্ষবৎ বিপরীতরূপে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠিল! ওঃ!—কেন এমন হয়?

ওঃ—ওঃ!—কি নিদারুণ বিভীষিকা! প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত সকল কথা ভাবিতে গেলে, দেহে আর প্রাণ থাকে না। কালাচাঁদের আপন ঠাকুরদাদা কাটা পড়িল, কালাচাঁদের বাপও জ্বররোগে মরিল,—আমি ভাবিলাম, আপদ গেল, কণ্টক দূর হইল,—নহিলে জ্ঞাতিশত্রুদ্বারা চিরদিন হাড়ে-নাড়ে জ্বলিতাম! বেশ নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছি, এমন সময় হঠাৎ একদিন শুনিলাম, কালাচাঁদের মা পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা। শুনিয়াই মাথাটা কেমন ঘুরিয়া উঠিল। প্রথম ভাবিলাম, এ-কথা কখন সম্ভব হইতে পারে না। কালাচাঁদের পিতার তিন মাস হইল মৃত্যু হইয়াছে,—সুতরাং তাহার স্ত্রীর গর্ভ হইবে কিরূপে? ক্রমশ শুনিলাম, গর্ভ প্রকৃতই বটে! মনটা বড়ই খারাপ হইল! ভাবিলাম, স্ত্রীলোক-টাকে ভ্রষ্টা বলিয়া তাড়াইয়া দিই না কেন? মনে হইল, এ কাজে তত সুবিধা হইবে না;—বরং গোলযোগ ঘটিলেও ঘটিতে পারে। বিশেষ গিন্নী (আমার স্ত্রী) উহাকে সতী-লক্ষ্মী বলিয়া থাকেন। তার পর ঠিক হইল,—গর্ভস্রাব করাইয়া দিলে ক্ষতি কি? চেষ্টাও হইল,—হতভাগী ঔষধও খাইল,—কিন্তু কিছুই ফল হইল না। গর্ভ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রকৃতই আমার ভয় হইল। আমি তখন কৌশলে যোগাড়যন্ত্র করিয়া হতভাগীকে বাপের বাড়ী

পাঠাইয়া দিলাম! ভাবিলাম, বর্ষাকাল, শ্রাবণমাস, নদ-নদী খাল-বিল পূর্ণ,—পথসমূহ কর্দ্দমক্লিষ্ট এবং পিচ্ছল,—এ-সময় ঝড়বৃষ্টি-বজ্রাঘাতেরই বা অভাব কি? ডুলি করিয়া গেলেও, গর্ভবতী স্ত্রীলোকের এ-সময় নিশ্চয় প্রাণ-সঙ্কট হইবে! একটী খুব খারাপ দিন দেখাইয়া, অশ্লেষা, দিক্‌শূল, পাপযোগ দেখিয়া, বারবেলায় হতভাগীকে পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলাম। কিন্তু ইহাতেও কিছু হইল না। অবশেষে মনকে দৃঢ় করিলাম,—বেটা হবে, কি মেয়ে হবে,—তার ঠিক নাই!—আমি এখন এত মিছা ভাবিয়া মরি কেন? বিশেষ, জন্মিয়াই অনেক শিশু প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে। আরও এক কথা,—গর্ভবতী স্ত্রীলোককে নদীপার হইতে নাই;—হতভাগী নয়মাস গর্ভে সাতটা নদী খাল পার হইয়াছে। অতএব পুত্রই হউক আর কন্যাই হউক,—ছেলেটী কিছুতেই বাঁচিবে না,—কিছুতেই তিন দিন পার হইবে না।

এইরূপ আশ্বাসে বসিয়া আছি, এমন সময় একদিন সংবাদ পাইলাম, হতভাগীর একটী পুত্র-সন্তান হইয়াছে। বুকটা অমনি ধসিয়া গেল। কি করি—উপায়ত নাই!—তিনদিন কাহারও সহিত কথা কহিতে পারিলাম না। জন্মক্ষণ জানিয়া পাঁজি খুলিয়া দেখিলাম,—শনিবার অমাবস্যায় ছেলেটা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। মনে অল্প আহ্লাদ হইল। অমাবস্যার ক্ষণে জন্মিয়াছে,—তাহাতে আবার শনিবার পাইয়াছে,—সুতরাং এ ছেলে কিছুতেই বাঁচিবে না। একজন আচার্য্যকে ডাকাইলাম। কথা-প্রসঙ্গে কৌশলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, অমাবস্যার রাত্রি, শনিবারে কোন ছেলে জন্মিলে, সে ছেলেটা বাঁচে কিনা? আচার্য্য পুঁথি খুলিয়া, শ্লোক আওড়াইয়া,—বলিলেন, 'যখন ভাদ্রমাস, শনিবার, অমাবস্যা

এবং রাত্রিকাল,—মঙ্গলের দশা, রাক্ষসগণ,—তখন সে-ছেলে কিছু-তেই বাঁচিবে না। এই দেওয়ালে লিখে রাখুন,—একবৎসর মধ্যে সে-ছেলের মরণ নিশ্চয়।” মনটা তবু কতক আশ্বস্ত হইল।

এক বৎসর উত্তীর্ণ হইল, তবু কালাচাঁদ মরিল না। চর পাঠাইয়া সংবাদ লইলাম,—সে আসিয়া বলিল, ছেলেটা কালো কিট্‌কিটে হইয়াছে,—ঠিক্ যেন ধানসিজে-হাঁড়ির তলা। সেটা মামার বাড়ীতে ভাল খেতে-মাখ্‌তে পায় না। লোকের ছাঁচ-তলায়, আঁস্তাকুড়ে বেড়িয়ে বেড়ায়। কাহাকেও কিছু খাইতে দেখিলে, সে তাহার মুখটী-পানে চাহিয়া থাকে। তার মামারা গরীব,—কোথা কি পাবে? শুনিলাম, দুধের বদলে কেলেটাকে ফেন খেতে দেয়! কেলেটার চেহারা দেখিলে মনে হয় ঠিক্ যেন, সেওড়া-গাছের ভূত।

এ কথা শুনিয়া তবু মনটা একটু ঠাণ্ডা হইল। ভাবিলাম, ছোঁড়াটা মামার বাড়ী না খেতে পেয়েই মরিয়া যাইবে। পাঁচ সাত বৎসর এই ভাবেই কাটিল,—আমিও তাহার মরণ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।

কিন্তু দুঃখ এই, অদৃষ্টের ফের-ঘোর এমনি যে, কালাচাঁদ মরিল না। পরম্পরায় শুনিলাম, কালাচাঁদ বেশ মোটাসোটা হইয়াছে,—বর্দ্ধমানে রাজার স্কুলে পড়িতেছে,—এবং দিব্যসুখে আছে। একথা শুনিয়াইত আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু তখন রাগ করিয়া লাভ কি? ভাবিলাম, একবার কালাচাঁদকে বর্দ্ধমান থেকে আনাই না কেন?—দেখি না কেন,—কেমন হই-য়াছে! লোকের কথা সত্য কি মিথ্যা, একবার স্বচক্ষে দেখিয়া সে বিষয় পরীক্ষা করিয়া লই না কেন? বর্দ্ধমানে তার মামাকে

চিঠি লিখিয়া কালাচাঁদকে আনাইলাম,—তাহার মূর্ত্তি যাহা দেখিলাম, তাহা বড় আশাপ্রদ নহে,—ঠিক যেন গুলি-বাঁধ। বড় বড় চঞ্চল চোখ দু'টা যেন চর্কি ঘুরিতেছে। নাকে মুখে-চোখে যেন কথার ফোয়ারা উঠিতেছে। খায় ঠিক রাক্ষসের মত। সেই ছেলে বয়সেই একদমে ছত্রিশটা লুচি খেয়ে ফেলিল। পাড়ার ছেলেগুলাকেও মেরে-ধরে, কামড়ে-কুমড়ে পাড়াছাড়া করিল। বিসর্জ্জনের পূর্ব্বে ঠিক যেন ডাকাত পড়া গোছ প'ড়ে, মা-দুর্গার মুকুটখানি ছিঁড়িয়া লইয়া পলাইল। অবশেষে কালাচাঁদ কিনা, বাছা সুরেশের গালে এক চড় মারিল। বাছা সুরেশ অমনি ঘুরিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইল। আমার তখন ইচ্ছে হইল, ছেলেটাকে দু-আধখানা ক'রে কেটে মাটীর নীচে পুঁতে ফেলি! কিন্তু চারিদিক দেখিয়া, পাঁচ সাত ভাবিয়া'ত কাজ করিতে হয়। আমি মনে করিলাম, কালাচাঁদকে যদি এখন আমি কিছু বলি, তবে গ্রামের সকল-লোক আমাকে দোষ দিবে। বলিবে,—ও-ছেলেটির মা-বাপ নাই ব'লে কি, ওর বুড়ো ঠাকুরদাদার ওকে অমন ক'রে মারা উচিত হয়েছে? এইরূপ আমি সাত-পাঁচ নানা-খানা ভাবিয়া, কালাচাঁদকে তার পর দিনই আমার বাড়ী পাঠাইয়া দিলাম। এখন মনে হইতেছে—সে কাজটা আমার ভুল হইয়াছিল,—শীকার হাতে পাইয়াছিলাম, ছাড়িলাম কেন? দু'দশদিন পরে তখনই একটা এস্পার ওস্পার করিলেই ভাল হ'ত।—কালাচাঁদের মামাকে না হয় একটা চিঠি লিখিতাম,—"হঠাৎ সর্পাঘাতে কালাচাঁদের মৃত্যু ঘটিয়াছে। সকলি ভবিতব্য। বাছার জন্য কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি অন্ধ হইয়াছি।"—কিন্তু তখন সে বুদ্ধি আমার ঘটে আসিল কৈ? আর আমিই বা তখন কেমন করিয়া বুঝিব যে, কালাচাঁদ ক্রমশ

এমন দারুণ দিগ্বিজয়ী হইয়া উঠিবে? সে সময় একদায়ে কিন্তু গুরু রক্ষা করিয়াছিলেন। গিন্নী তখন কাশী গিয়াছিলেন। আজিকার যে রকম ভাবগতিক দেখিলাম, তাহাতে বোধ হয়, গিন্নী যদি সে সময় বাটীতে থাকিতেন, তাহা হইলে কালাচাঁদকে লইয়া কাঁধে করিয়া নাচিতেন,—হয়ত বলিতেন, কালাচাঁদ এইখানেই থাকবে, আর তার মামার বাড়ী যাওয়া হবে না। আমার পূর্ব্ব-জন্মের অনেক পুণ্যবল ছিল, তাই গিন্নী তখন বাটীতে থাকেন নাই। সে যাহা হউক, এখন গতকর্ম্মের অনুশোচনা করা বৃথা। উপস্থিত কিসে রক্ষা হয়, তাহা ভাবাই ভাল।

আচ্ছা,—তেমনটা কেন হইল?—সবইত ঠিক হইয়াছিল, চারে মাছ আসিয়াছিল,—টোপ গিলিয়াছিল,—তবে এমন ফস্কা-ইল কেন? কালচাঁদের মামাকে ১০১৲ টাকা নগদ গণিয়া দিলাম,—হৃষ্টচিত্তে সে টাকা লইল। একরাত্রি বাটীর ভিতর টাকা রাখিল। নগদ কর্‌কর়ে টাকার উপর অবশ্যই তাহার মায়া জন্মিল,—সে বোকা প্রাতে হঠাৎ টাকাগুলা ফেরত দিল কেন? টাকা সিন্দুকজাত হইবার পর সে টাকা কি কেহ ফেরত দিতে পারে? বিশেষত, কালাচাঁদের ঘর-ভিটা পুকুর-বাগান বিক্রয় হইয়া গেলে, তার মামার কি ক্ষতি ছিল? ক্ষতি ত কিছুই দেখি না,—কিন্তু তথাচ মামা টাকা ফেরত দিল কেন? আমি যে কৌশল-জাল পাতিয়াছিলাম, তাহা কি বুঝিতে পারিয়া, মামা আমাকে ফিরাইয়া দিল? সে তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে? তাহাকে আমার সম্পত্তির কার্য্যনির্ব্বাহক নিযুক্ত করিব বলিয়া-ছিলাম,—একশত টাকা মাসিক বেতনেরও কথা আভাস দিয়া-ছিলাম,—কৌশলে ঝগড়া উইলনামাও দেখাইয়াছিলাম,—দেখিয়া-

শুনিয়া, সকল কথাইত সে বিশ্বাস করিয়া বলিয়া বোধ হয়। বিশ্বাস যদি না করিবে, তবে সে টাকা লইবে কেন? রাত্রে কি তার বুদ্ধি বাড়িল? রাত্রিকালে শুইয়া শুইয়া, ভাবিয়া-ভাবিয়া, সে, বুঝিতে পারিল যে, আমার সবটাই ফাঁকি,—ষোলকড়াই কাণা? বর্দ্ধমানে কোন বন্ধুর বাটীতে আমি সেই দরোয়ানটাকে লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম; দ্বারবান্‌কে লুক্কায়িত করিবার কথা রাত্রে কি কোনরূপে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল? প্রকাশ পাইবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। আর প্রকাশ পাইলেই বা আমার মনোগত অভিসন্ধি কিছুতেইত প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল না। কালাচাঁদের ঘরভিটা এবং উইল,—দুইটা একসঙ্গে রেজষ্টরি করিব,—ইহাই মামাকে প্রস্তাব করা আমার স্থির ছিল। যদি ঘরভিটা কোন গতিকে রেজেষ্টরি না ঘটে, তাহা হইলে তখনই পলাইবার উপায় বিধান জন্য খানসামা দ্বারা দ্বারবানকে ডাকাইয়া বলাইব,—"আপনি শীঘ্র বাটী চলুন,—সুরেশের ব্যারাম"—ইহাও স্থির ছিল! কিন্তু এই মানসিক গূঢ় সঙ্কল্পের বিষয় প্রকাশ হইবার কোনও উপায় ছিল কি? দ্বারবান্ ত অবিশ্বাসী নহে! খানসামা ত প্রভুভক্ত,—তবে কালাচাঁদের মামা কেমন করিয়া টের পাইবে, আমার সকলি ভুয়াবাজী!—উইল-রেজেষ্টরী মিথ্যা—ফাঁকি দিয়া কালাচাঁদের ঘরভিটা লওয়াই কেবল সত্য!

তবে কি করুণাময়ী, মামাকে ভাঙ্গাইল? সে নচ্ছার ছুঁচো বেটী ভাঙ্গচালি দিবার কে? কালাচাঁদের ভিটা আমি টাকা দিয়া কিনিব,—তাতে বাধা দিবার জন্য তো-বেটীর মাথাব্যথা পড়ে কেন? কালাচাঁদ তোর কে হয়? তোর কি? সে-দিন অদৃষ্টে কতই না কর্ম্মভোগ ছিল! সেই পাড়া-মজানি বেশ্যাটাকে জানেলার

কাছে আনিয়া দুটা মিষ্ট কথায় বুঝাইবার জন্য কতই না আমাকে টাকার ঝনঝনানি শব্দ করিতে হইয়াছিল? শুনিয়াছিলাম, ও-বেটী কালাচাঁদ-গত প্রাণ হইয়া-ছিল,—তাই তাহারও তোষামোদ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম! কিন্তু কি আপশোষ! মাছ গাঁথিয়া খেলাইবার সময় ডোর ছিঁড়িয়া গেল! ও-বেটী যেমন আমার মনে সেদিন কষ্ট দিয়াছিল, তেমনি সে, শেষে নিজে কষ্ট পাইল! দিনকতক পরে উপপতিটা মরিল,—কালাচাঁদ পলাইল, শেষে নিজে না খেতে পেয়ে, ঘরে মরে' তিনদিন বসিমড়া হয়ে, ঘরের ভিতর পচিল। আমাকে কষ্ট দিয়ে কেহই সুখে থাকৃতে পারে না! যে আমাকে কষ্ট দিবে,—একটা না-একটা তার বিভ্রাট ঘটিবেই।

সত্য সত্যই কি করুণার জন্য সেই মহা উদ্দেশ্য সফল হইল না?—তাই কি?—কেমন করিয়া নিশ্চয় বলিব?

অথবা বুঝি আমার দুরদৃষ্ট এবং কালাচাঁদের শুভাদৃষ্ট-নিবন্ধনই এ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে!! তেমন কৌশলময় সূক্ষ্ম পাকা ওস্তাদি জালে মাছ পড়িয়া ছিঁড়িয়া পলাইল,—তখন অবশ্যই কালাচাঁদের ভাগ্যবল বলিতে হইবে।

আচ্ছা,—সব কথাই ছাড়িয়া দিলাম। কালাচাঁদের অদৃষ্ট না হয় খুব ভাল বলিয়াই মানিয়া লইলাম, তথাচ তাহারত তিনবৎসর জেল হইল,—ঘানিগাছে ঘুরপাক দিতে হইল। কালাচাঁদকে কারাগারে পাঠাইবার প্রধান উদ্যোগকারী কে? আমি গোপনে তদ্বির না করিলে, কালাচাঁদ নিশ্চয়ই খালাস পাইত। সে যেরূপ কৌশল-জাল পাতিয়া জজের মন ভুলাইয়াছিল, তাহাতে জুরিগণও একবাক্যে 'কালাচাঁদ নির্দ্দোষ' এই কথা বলিত। সৌভাগ্যক্রমে জুরি আমার বশে ছিল,—তাই যা'হোক তিনবৎসর মিয়াদ হইল,—

নচেৎ জজকে হস্তগত করিতে পারিলে, নিশ্চয় তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইত। অভিযোগ অতীব গুরুতর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কেলে-ছোঁড়াটা জেলে গেল,—আমি ভাবিলাম, ছোঁড়া এইবার নিশ্চয় মারা পড়িবে! জেলের ঘানি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বাছার বত্রিশ-নাড়ী পাক পাইবে। শেষে চিঁ-চিঁ ডাক ছাড়িয়া বাছাধনকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে; ইহাই আমার ধ্রুব ধারণা ছিল। এমন কি, আমি একবৎসর পরে নাএব-দারোগাকে পর্য্যন্ত বলিয়া রাখিয়াছিলাম যে, "কালাচাঁদের যদি কোন ভালমন্দ ঘটে, তবে তৎক্ষণাৎ যেন আমি সংবাদ পাই।" নাএব-দারোগা বড়ই বোকা। সে সপ্তাহে সপ্তাহে আসিয়া সংবাদ দিত, "আপনার কালাচাঁদ বেশ আছেন,—কোন কষ্ট নাই।" আরে আহাম্মক! আমি কি কালাচাঁদের শুভ-সংবাদ খুঁজিতেছি? আমি যে, কালাচাঁদের মৃত্যুসংবাদ পাইবার কেবল কামনা করিতেছি!! যাহা হোক, সেই দারুণ গাধা দারোগাটাকে দেখিলেই আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিত! কিন্তু কি করি? "কালাচাঁদ আছেন ভাল"—তাহার মুখে এ কথা শুনিয়া আমাকে অগত্যা প্রতি সপ্তাহেই একবার কাষ্ঠহাসি হাসিতে হইত!

উঃ! হিসাবের এত তফাৎ হয় কেন? কারাগারে কালাচাঁদের নিশ্চয়-মৃত্যু ভাবিয়া ঠিক এই সময়েই আমি তাহার ভিটাটুকু দখল করিয়া লইয়াছিলাম। সেখানে এখন প্রকাণ্ড ত্রিতল ইমারত! কালাচাঁদ এখন যদি তাহার ঘরভিটা চায়,—তবে তাহা কেমন করিয়া দিব?—গলাধাক্কা দিয়া দূর করিয়া তাড়াইয়া দিব,—বলিব, "কোথা তোর ভিটে, তা কে জানে?" যদি বেশী বাড়াবাড়ি করে,—বলিব, 'তামাদি হইয়াছে,—আর নালিশ চলে না।'

শেষে ত কালাচাঁদকে সকলেই ঐ কথা বলিবে,—কিন্তু আমার এরূপ হিসাব ভুল হইল কেন? ভিটাটুকু এতদিন ফেলিয়া রাখিলাম,—আর চারিদিক্ না দেখিয়া কারাবাসকালে কেনই বা লইলাম?

কালাচাঁদ কারাগার হইতে বাহির হইল,—শুনিলাম, খুব হৃষ্টপুষ্ট যুবাপুরুষ হইয়া আসিয়াছে। জেলখানা, যমের দক্ষিণদ্বার স্বরূপ। কেলোছোঁড়াটা কিনা সেখানে থেকে ফিরিয়া আসিল!—শুধু ফিরিয়া আসিল,—মোটা হইয়া ফিরিল! লোকমুখে এসব কথা শুনিয়াই ত আমার চক্ষুস্থির।

ক্রমশ পরম্পরায় আরও শুনিলাম, কালাচাঁদ জেলখানা হইতে অনেক টাকা রোজগার করিয়া আনিয়াছে। সহসা সে কথা বিশ্বাস হইল না। তদুপরি এমন কথাও কর্ণগোচর হইল,—কালাচাঁদ দানধ্যান আরম্ভ করিয়াছে। গরীব দুঃখীকে দেখিলে সিকি আধুলি দেয়, কাপড় কিনিয়া দেয়। এসব কথা শুনিয়া আমার আর রাত্রে ঘুম হয় না। কেবলই তখন মনে হইতে লাগিল, "কেলেটা ক'ল্লে কি!" পতে নাপ্‌তেটারই বা কি আক্কেল?—কি সম্বন্ধ সোহাকৎ? এ হুগলী সহরে কালাচাঁদকে বাসা দিবার জন্য লোকে কে সেধেছিল? ইচ্ছা হয়, পতেটাকে জুতিয়ে খাঁটি সোজা করিয়া দিই, জুতো খেলেও ত পতের লজ্জা নেই। ঐ পতেটাই কালাচাঁদকে সঙ্গে ক'রে আমার বাসায় এসেছিলো। আমি তখন কালাচাঁদের চেহারা দেখিয়াই চটিয়া গেলাম। তুই কোথাকার ছোঁড়া?—তোর মা নেই, বাপ নেই,—লোকের পাত কুড়িয়ে খেয়ে, তুই মানুষ,—তুই এমন মোটা-সোটা 'গন্ধুর-গুপ্‌সা' হ'য়ে গেলি কেন? যেমন মানুষ

তেম্নি থাক্! তোকে সেদিন আমার সঙ্গে দেখা করিতে এখানে কে আসিতে বলিয়াছিল? তুই আমার চোখের সাম্নে আস্‌বার কে? বেরো হতভাগা, বেরো আমার বাড়ী থেকে!! সেদিন এমনি রাগই হয়েছিল। দেখিয়াই যাকে বিরক্ত বোধ হয়, তার সঙ্গে আর কথা কহিব কি? কেলেটার সঙ্গে সেদিন বিশেষ কোন বাক্যালাপও করিলাম না;—দুই এক কথা কহিয়া মুখ বাঁকাইয়া বসিয়া রহিলাম।

বাক্যালাপও করিলাম না বটে, কিন্তু মনটা সেইদিন হইতেই দমিয়া গেল। প্রথম চিন্তা হইল,—পতে নাপ্‌তেটাকে এদেশ থেকে তাড়াইবার উপায় কি? বৃক্ষে পাখী বাসা করিয়াছে,—বৃক্ষটীর মূলচ্ছেদ করিলেই পাখীটী পলাইবে। প'তেটার ঠ্যাং খোঁড়া করিয়া দিলে হয় না? প'তেটা ডুলি করিয়া দেশে গিয়া ভুগুক,—আর কালাচাঁদও একদিক্ দিয়া পলাইয়া যাক্। না,—প'তের বাড়ীতে ডাকাইতি করিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুটিয়া আনিব? অথবা তাহার ঘর জ্বালাইয়া দিব? গৃহদগ্ধ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা! প'তের দুখানি ঘরই পুড়িয়া ছাই হইবে,—কালাচাঁদও স্থানাভাবে অন্যদেশে যাইতে বাধ্য হইবে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া গৃহদাহের উদ্যোগ আদি করিতেছি, এমন সময় শুনিলাম,—কালাচাঁদের পয়সা কমিয়াছে, মুদীর দোকানে ধার হইয়াছে, পতিতের্ও সহিত তাহার মাঝে মাঝে একটু আধটু ঝগড়া বচসা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কৌশলে পতিতকে ডাকাইলাম। মিষ্ট কথায় নাপিতকে ভুলাইলাম। পতিতকে বাটীর ক্ষৌরকার নিযুক্ত করিলাম। চৈত্রমাসে চড়কের দিন পতিতকে দুইটী টাকা সন্দেশ খাইতে দিলাম। পতিত

আমার গোলাম হইল। নাকবেঁধা পশুর মত পণ্ডিতকে তখন যা বলি, তাই সে করে।

কৌশলে পণ্ডিতের নিকট প্রস্তাব করিলাম,—"তোমার বাসা হইতে কালাচাঁদকে শীঘ্র তাড়াইয়া দূর করিতে হইবে।" তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, "কালাচাঁদ চোর, ডাকাইত, ফাঁসুড়ে। কালাচাঁদ লোকের গলায় ছুরি দিতে পারে। হয় ত তোমাকে একদিন খুন ক'রে, তোমার বাক্স ভেঙ্গে কালাচাঁদ চলে যেতে পারে! দেখ্‌চো না উহার চেহারা? ঠিক যেন যমদূত! ও লোকটা কত গৃহস্থের যে সর্ব্বনাশ করেছে, সে কথা তোমাকে কি আর বল্‌বো! পাকা ডাকাত না হ'লে, কি আর ও জেল খাটে?"

পণ্ডিত আমার কথার উত্তর দিল, "আজ্ঞে, আপুনি যা ব'লচেন, —সবই ঠিক কথা। আমি এতদিন ঠাওরাইতে পারি নাই। এখন আমাকে যা আজ্ঞা কর্‌বেন, তাই কর্‌বো!—পণ্ডিত ত আপনা-ছাড়া নয়?"

আমি। কালাচাঁদের এখন চলে কিসে?

পণ্ডিত। মাথামুণ্ড চল্‌বে আর কিসে? দু-পাঁচ টাকা জেল থেকে চুরি ক'রে এনেছিলো, তাই দিন কতক একে ৷৹ আনা, ওকে ১৲ টাকা দিয়ে বাবুগিরি করা হলো। আমি তখন তাকে ঢের নিষেধ কর্‌লাম,—তা, তখন টাকার গরমে সে আমার কথা শুন্‌বে কেন? পণ্ডিতের কথা বাসী হ'লেই মিষ্টি লাগে। পণ্ডিত যা ব'লেছিলো, শেষে তাই এসে ঘটলো! আমি মর্‌বো কবে, তা'ই বল্‌তে পারি না,—নচেৎ আপনার ছিচরণ-আশীর্ব্বাদে পণ্ডিত কি না জানে? আরবছর ছিষ্টিধর ঘোষকে ব'লে এলেম, তোমার বিষয় থাক্‌বে না,—আর এ বছর সেই বিষয় অষ্টমে চড়্‌লো!

আমি। এখন কালাচাঁদের ঘরে কি হচ্চে?

পতিত। এই হ'রে মুদীর উঠনোর দেনা আঠার টাকা হয়েচে, পরন্তু আমি তাকে টিপে দিয়ে এলাম, নগদ পয়সা ভিন্ন তুমি পাই-পয়সার জিনিস কালাচাঁদকে দিও না। শেষে যে তুমি পতিতকে দূষবে তা, কখন হ'তে পা'রে না। পতিত কারু কখন সিকি পয়সা ধার করে না। পতিতই বরং লোককে ধার দেয়।

আমি। দোকানদার কি কালকুটেটারে উঠনো আর যোগাইল?

পতিত। আজ্ঞে, না,—উঠনো আসিল না দেখিয়া, কালাচাঁদ এদিক্-ওদিক্ চারিদিক্ চাইতে লাগ্‌লো—চাল নাই, ডাল নাই, নুন নাই, তেল নাই, হাঁড়ীটেও ফাটা,—তা, চারিদিক্-পানে চাইলে ত হাণ্ডী-কাঠ-নুন-তেল-চাল-ডাল আইসে না!—আমি কালাচাঁদের গতিক দেখিয়া সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িলাম! আমার ভয় হইল, পাছে কালাচাঁদ আমার নিকট হইতে পয়সা ধার চায়। কর্ত্তা-মোশাই! আপনিই বলুন, আমি কালাচাঁদকে কত আর ধার দিব? দিন নাই, রাত নাই, সময় নাই, অসময় নাই,—সদাই তা'র পেটের ভাতের জন্য পয়সা চাওয়া। আমি একলা পতিত কত দিক্ সামলাবো বলুন? প্রত্যহ আমাকে ৺লক্ষ্মীনারায়ণের জন্য একটী পয়সা রাখ্‌তে হয়,—ভাল বামুন দেখিয়া প্রত্যহ আমি একটী করিয়া পয়সা দান করি,—কাণা খোঁড়াকে দিতে প্রত্যহ পড়ে দুইটী করিয়া পয়সা যায়,—তা, আমি গরীব-মানুষ, আর কোথা কি পাবো?—কালাচাঁদকে খাওয়াতে নিত্যি নিত্যি পয়সা কোথা পাবো?

আমি। তবে কি গত পরশ্ব কালাচাঁদ খাইতে পায় নাই

পণ্ডিত। কর্ত্তা-মোশাই! কালাচাঁদের কথা আমি কিছু বুঝ্‌তে পারি না। সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরে এসে শুনলাম,—কালাচাঁদ পথে তিনটী পয়সা কুড়াইয়া পাইয়াছে। তাহাতেই মালসা কিনেচে, চাল্‌ কিনেচে,—কার্‌ বাগান থেকে চুরি করে কাঠ ভেঙ্গে এনেচে,—এই সব যোগাড় ক'রে ভাত ফুটিয়ে গণ্ডে-পিণ্ডে খেয়েচে। সে খাওয়ার চোট্‌ কি মোশাই! তিনটী পয়সার মধ্যে দুইটী পয়সা,—ঐ খাওয়ার খরচ,—আর এক পয়সার অম্বুরী তামাক কিনেচে। আমি বাসায় ঢুক্‌তে না ঢুক্‌তে, কালাচাঁদ হেসে হেসে আমাকে ডাক্‌লে, "এসো এসো বন্ধু এসো;—একবার অম্বুরী তামাকটা খেয়ে যাও!" আমি এ-কথা শুনে ভয়ে আর বাঁচিনা। ভাবলাম,—বিষ খাইয়ে আমাকে মার্‌বে নাকি? কি করি, ঘরে যখন কাল-সাপ পুষেচি, তখন চারা কি আছে? কর্ত্তা-মোশাই। আমাকে আর যা বলুন, সব কর্‌তে পারি,—বাঘের মুখে আমি ঢুক্‌তে পারি, কিন্তু অমন গোঁয়ার-গোবিন্দ লোকের কাছে আমি ঘেঁস্‌তে পারি না। কি জানি, পাছে যদি সে একটা চড়িয়ে দেয়, তা'হলে ত একেবারেই গেছি! তার আঙ্গুল নয় ত ঠিক যেন আছোলা বাকারি! তখন ছিমধুসূদনের নাম স্মোরণ করিতে করিতে আমি কালাচাঁদের কাছে যেয়ে উপস্থিত হ'লাম। আমাকে দেখেই তার অমনি খিল খিল হাসি আরম্ভ হলো।

আমি। আচ্ছা। সে কথা যা'ক্‌। হ'রে মুদীকে এখনি তুমি আমার নাম করে ডেকে নিয়ে এসো। আজই ছোট আদালতে কালাচাঁদের নামে নালিষ দায়ের ক'রে দাও! নালিষের নাম শুন্‌লেই কেলেটা ভয়ে পালিয়ে যাবে! আর তুমিও গিয়ে বল্‌বে,—"কালাচাঁদ! আমার বাড়ী থেকে তুমি এখনি চলিয়া যাও!"—

হায়! এরূপ কত উদ্যোগ-সংযোগ করিলাম, কত কৌশলে কেমন পাকা ফাঁদ পাতিলাম,—কিন্তু আজ সবই ব্যর্থ হইয়া গেল! গত কল্য হ'রে মুদীকে দিয়া ছোট আদালতে কালাচাঁদের নামে নালিষ করাইলাম, পতিতকে দিয়া তাহার বাসা হইতে তাড়াইলাম,—কিন্তু অহো! আজ কিনা সেই কালাচাঁদ মাছ হাতে করিয়া, দই-সন্দেশ তরকারি ভেট লইয়া আসিয়া, আমাকে দাদা বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল!!

আমি যতই তার বুকে পাথর চাপান্ দিতে চাই, ততই সে ফুলিয়া উঠে। যতই তাহাকে হ্রস্ব করিবার যত্ন করি, ততই সে দীর্ঘ হইয়া দাঁড়ায়! আমি যতই তাহার মৃত্যু কামনা করি, ততই সে যেন অমর বর পাইয়া, ধেই-ধেই রবে আমার সম্মুখে বিকট নৃত্য করিতে থাকে। জানি না, ভবিষ্যতে আমার অদৃষ্টে কি লেখা আছে! আমি বুঝি মজিলাম! ডুবিলাম! মরিলাম!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

অদ্য প্রাতে যখন মাছ হাতে করিয়া কালাচাঁদ আমাকে "অ, দাদা-মোশাই!" বলিয়া ডাকিল, তখনি তার মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিলাম, একি?—একি!—যেন এক বিষম বিভীষিকা দেখিয়া উঠিলাম! একি ভূত, প্রেত, যক্ষ, না যমদূত? কল্য যাহার একটী মাত্রও পয়সা সংস্থান ছিল না, কল্য যাহাকে অভুক্ত অবস্থায় বিতাড়িত করিয়াছি, কল্য যাহার ছিন্ন মলিন বসন

ভিন্ন সম্বল ছিল না,—সে আজ কেমন করিয়া নববস্ত্র পরিধান-পূর্ব্বক, হাসি-হাসি মুখে, মাছ-দই-সন্দেশ ভেট লইয়া আমাকে দাদা বলিয়া ডাকে? এ ব্যাপার দেখিয়াই ত দেহে আর আমার প্রাণ রহিল না। প্রথম মনে হইল, এই লোকটা কি কোন বহু-রূপী?—কালাচাঁদের মূর্ত্তি ধরিয়া আমাকে ভয় দেখাইতে আসি-য়াছে কি? তখনি আবার মনে হইল,—ইহা কিছুই নহে,—আমি বুঝি কেবল আতঙ্ক-যুক্ত স্বপ্ন দেখিতেছি! শেষে দেখিতে দেখিতে স্থির বুঝিলাম, ইহা বহুরূপীও নহে, স্বপ্নও নহে,—ইহা সত্য-সত্যই কালাচাঁদ! তখন যদি আমার সম্মুখে বজ্রাঘাত হইত, অথবা মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িত, তাহা হইলে আমি তত আশ্চর্য্যান্বিত বা কাতর-যুক্ত হইতাম না।

কিন্তু কি করি? উপায় ত কিছুই নাই!—চারিদিক্ চাহিয়া, আকাশ-পাতাল ভাবিয়া কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। আমার ভাবনা হইল, কালাচাঁদ বুঝি ভিটার ভাগ চাহিতে আসিয়াছে! বুঝি আমার ত্রিতল দালানের ইট একখানি করিয়া খুলিয়া ফেলিয়া দিয়া, কালাচাঁদ দড়ি ধরিয়া ভিটার ভাগ লইতে উদ্যোগী হইয়াছে।

আমার মনে হইল, কালাচাঁদের পশ্চাতে অলক্ষ্য শত শত লোক আছে। কালাচাঁদ একা নহে,—যেন সৈন্যদল-পরিবেষ্টিত সেনাপতি।

এখন আমার ধ্রুব ধারণা জন্মিয়াছে, কালাচাঁদ কোন লোককে কল্য রাত্রে সহায়-সম্পত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। আজ তাই তাহার উপদেশ মত, সৌহার্দ্দভাবে বিষয়ের অংশ লইতে কালাচাঁদ আসিয়াছে। সে লোক অবশ্যই বলিয়াছে, যদি বন্ধুত্বে কার্য্যশেষ না হয়, অন্তিমে নালিষ করাইয়া বিষয় দখল দেওয়াইয়া দিব। তাই

সে ব্যক্তি মাছ-দই-সন্দেশ দিয়া, প্রথমত কালাচাঁদকে আমার কাছে পাঠাইয়াছে!

বিষয় কি?—সুতরাং কালাচাঁদ তার অংশ লইবেই বা কি? যদি দুষ্ট লোকের দুষ্ট পরামর্শ শুনিয়া কালাচাঁদ বলে,—মৎকৃত এই অতুল বিষয়, জমীদারী সমস্তই পৈতৃক ধনে খরিদ,—তখন উপায়!! কালাচাঁদ যদি আদালতে বলে, "ঠাকুরদাদা দেওয়ানী কাজ করেন, ৫০৲ টাকা মাত্র মাহিনা পান,—তিনি স্বোপার্জ্জিত অর্থে কেমন করিয়া এই লক্ষ টাকা মুনফার বিষয় খরিদ করিবেন?"—তাহা হইলে আমি তাহার কি উত্তর দিব? কালাচাঁদ আদালতে আরও বলিতে পারে "আমরা একান্ন-ভুক্ত পরিবার,—কস্মিন্‌কালে পৃথকান্ন হই নাই,—যদি পৃথকান্ন পৃথক্‌বাটী হইতাম, তাহা হইলে আমার নিজস্ব ঘর ভিটাই বা কোথায় গেল?" বিশেষ, পৈতৃক পুকুর বাগান জমী—সমস্তই ত উঁহার ঠাকুরদাদা (আমার জ্যেষ্ঠ) রামতারণদত্তের নামে খরিদ,—মোকদ্দমা সূত্রে সে দলিল দুইবার আদালতে দাখিল হইয়া তাহা পাকা হইয়া আছে। সেই পুকুর-বাগান-জমী-ভিটা সম ই আমি দখল করিতেছি। বর্ত্তমান সমস্ত জমীদারীই আমার নামে খরিদ,—(কেবল কোম্পানীর কাগজ গুলি গিন্নীর নামে আছে।) কালাচাঁদ আপত্তি তুলিবে, "যখন আমার নিজ ঠাকুরদাদার নামীয় সম্পত্তির উনি অর্দ্ধেক দখলিকার, তখন উঁহার নামীয় সম্পত্তির আমি অর্দ্ধেক দখলিকার হইব না কেন?"

কালাচাঁদ বোধ হয় আদালতে আরও বলিবে,—বাল্যকালে আমার পিতৃ-মাতৃ-বিয়োগ হয়,—এতদিন নাবালক ছিলাম;—এক্ষণে সাবালক হইয়া এই নালিষ উপস্থিত করিয়াছি।

এইরূপ ভাবিয়াই আমি প্রাতে কালাচাঁদকে তত আদর করি-

লাম। মনে ঠিক করিলাম, কালাচাঁদকে এখন বশ করাই আমার পক্ষে সর্ব্বপ্রকারে শ্রেয়ঃকল্প। কালাচাঁদ ছেলে-মানুষ,—দুটা মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া, গায়ে হাত বুলাইয়া, বাছাধনকে বশে আনিব। কালাচাঁদের কাঁচা বয়স,—হাতে নগদ কিছু টাকা ফেলিয়া দিব,—তাহাতেই সে ভোর হইয়া থাকিবে! মোদ্দা কালাচাঁদকে আর ছাড়া হইবে না।

পাঁচ চাল আঁটিয়াই প্রাতে ব'ড়ে টিপিয়াছিলাম। কালাচাঁদ ভাল-সামগ্রী উদর পুরিয়া খাইতে পায় না,—তাই তাহাকে আজ দ্বিপ্রহরে মহা-মহোৎসবে ভোজন করাইলাম। এঁ-এঁ,—কালাচাঁদ বশে থাকিবে না কি?—শিকলি কাটিয়া পলাইবে কি?—কিছুতেই কি সে পোষ মানিবে না?—কিছুতেই কি তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারিব না?

যদি একান্তই বশে না থাকে, তখন উপায়?—না থাকিলে—ভাবনাই বা কি আছে?—অবশেষে আমি 'মরিয়া' হইয়া, ঢাল খাঁড়া ধরিব! বালক-কালাচাঁদ কতক্ষণ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম হইবে?—ঐ এক-রত্তি ছেলে, আমার কি করিবে?—ফুঁ দিয়া উড়াইয়া দিব! ভয় কি?

তবে কিনা,—এরূপ ভাবে একটা নালিষ ফসাদ হইলে, দেখিতে শুনিতে বড়ই মন্দ হইয়া দাঁড়াইবে। বিশেষ, আমার অনেক শত্রু আছে। এই জ্ঞাতি-বিরোধ দেখিয়া শত্রুদের আনন্দ বাড়িবে। তা বাড়ে, বাড়ুক। তাতেও হরিতারণ দত্ত ভয় খান না!!

কিন্তু ভিটা, পুকুর, বাগান—কালাচাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য। এগার বিঘা জমীও তাহার প্রাপ্য। তা, এগার বিঘা কেন, একশত বিঘা জমী লইয়া, সে ক্ষান্ত হউক,—আমি তাহাতে রাজী আছি। একশত

বিঘাই বা বলি কেন, সে পাঁচশত বিঘা জমী লউক, নগদ পাঁচশত টাকা লউক,—আমাকে একটা একরার-নামা লিখিয়া দিউক যে, "কি বাস্তুভিটা, কি বাগান, কি পুষ্করিণী, কি অন্য কোন সম্পত্তি—কিছুতেই আর কালাচাঁদ দত্তের স্বত্ব নাই";—এ প্রস্তাবে আমি সবিশেষ সম্মত আছি।

কালাচাঁদ যদি বলে, আমার টাকা চাই না, জমী চাই না,—চাই কেবল বাস্তুভিটা।—তাহা হইলেই মুস্কিল বাধিবে। ন্যায্য প্রাপ্য না দিলে, লোকেও ত দোষ দিতে পারে!

আচ্ছা, জাল-দলিল তৈয়ারি করিলে হয় না কি? দলিলে এই ভাবে লেখা থাকিবে, কালাচাঁদ দত্তের পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে পরিবার-বর্গের ভরণ-পোষণের জন্য আমাকে ভিটা, বাটী, পুকুর, বাগান সমস্তই বিক্রয় করিয়া গিয়াছে!

তাহাই বা কেমন করিয়া হয়? কালাচাঁদের মামা পুকুরে মাছ ধরাইত, চালে খড় দিয়া ঘর ছাওয়াইত, বাগানের আম পাড়াইয়া লইয়া যাইত;—এসকল কথা ত অনেকেই জানে। তবে কেমন করিয়া কালাচাঁদের পিতাকর্ত্তৃক তদীয় বিষয়-বিক্রয় সাব্যস্ত করিব?

যাউক ও কথা। ঝগড়া গণ্ডগোল করা অপেক্ষা প্রথমত কালাচাঁদের সঙ্গে ভাব করাই ভাল! প্রাণপণে সে চেষ্টা করাই এক্ষণে যুক্তি-সঙ্গত! আমি লক্ষ লোক ভুলাইলাম, আর কালাচাঁদকে কি ভুলাইতে পারিব না? অবশ্যই সে কার্য্যে সক্ষম হইব। কিন্তু এক গোল দেখিতেছি। গিন্নী যেরূপ কালাচাঁদকে স্নেহ করিতেছেন, তাহাতে কালাচাঁদকে কিছুতেই এ বাড়ীতে রাখা সুপরামর্শ নহে। আমি গিন্নীর জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিলাম! গিন্নী তাহাকে এত ভাল বাসিবেন জানিলে, কে আজ কালা-

চাঁদকে বাড়ী ঢুকাইত। পূর্ব্বে-পূর্ব্বে গিন্নী মধ্যে মধ্যে বলিতেন বটে, "কালাচাঁদ কোথায়?—তার কিছু খবর জান কি?" আমি এসব কথা কৌশলে উড়াইয়া দিতাম। অধিক কি, কালাচাঁদ যখন হুগলী-জেলে ছিল,—তখন একদিনের তরেও সে-কথা গিন্নীকে বলি নাই। এখন বুঝিতেছি, সে সব কথা না বলিয়া, ভালই করিয়াছিলাম। গিন্নী যে, কালাচাঁদকে দেখিয়া এরূপ হায়-হায় করিবেন, স্নেহ-রসে গলিয়া চোখের জল ফেলিবেন, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই! ওঃ—আজ কি কুকর্ম্মই করিয়াছি!—কেন আজ কালাচাঁদকে ঘরে ঢুকিতে বলিলাম, কেন তার সঙ্গে একত্র আহার করিলাম, কেনই বা গিন্নীর সহিত তাহার সাক্ষাতের সুবিধা করিয়া দিলাম? গিন্নী যখন কালাচাঁদকে বাড়ীর ভিতর অদ্য দুপুর-বেলা শুওাইয়াছেন, তখন গিন্নী যে বলিবেন, কালাচাঁদ এ বাড়ীতে খাবে—মাখবে-থাকবে—সে'ত এক রকম নিশ্চয় ধরা কথা। এরূপ প্রস্তাব গিন্নী করিলে, আমি কি বলিয়া তাহাকে নিষেধ করিব? গিন্নী যদি লুকাইয়া-লুকাইয়া কালাচাঁদকে টাকা-কড়ী দেন, তাহারই বা উপায় আমি কি করিব? মহা-বিপদ ঘটিল—দেখিতেছি!

কালাচাঁদকে বশে রাখিতে হইবে, খুব ভাল বাসিতে হইবে, ভরণপোষণ করিতে হইবে,—অথচ কালাচাঁদকে বাটীতে থাকিতে দেওয়া হইবে না,—তাহারই বা সদ্যুক্তি কি?

এখন কথা হইতেছে, গিন্নী যদি জেদ করিয়া বলেন, কালাচাঁদ এই বাটীতেই থাকিবে;—বালক-কালাচাঁদও যদি জেদ্ ধরে, "হাঁ। আমি এই খানেই থাকিব;"—তখন উপায় কি? কূল-কিনারা ত কিছুই দেখি না!

এখন আমি করি কি? যে দিকে চাই, সেই দিকেই অন্ধকার দেখি! যে পথে চলিতে যাই, সেই পথেই বাধা বিঘ্ন সমুপস্থিত হয়! যে ডাল ধরি, সেই ডালই ভাঙ্গিয়া পড়ে! আজ আমার কাছে জাহ্নবীজল কুক্কুর-মূত্র হয়। পদ্মপত্র বিছুটিতে পরিণত হয়। সুধা বিষ হয়। আমি করি কি? কোন্ পথ দেখি? কোন্ দিক্ রাখি? কোন্ পাশ বাঁধি? উঃ, গেলাম! আমি কোথায় যাই! কার কাছে যাই! কিসের কথা বলি! আমার কে আছে। আমার কি আছে? আমার কে নাই? আমার কি নাই? ইহা ত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।

উঃ! আমার বুক বড়ই ধড়াস্-ধড়াস্ করিতেছে, মাথা বনবন্ ঘুরিতেছে, দেহ থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছে! আমার মনে দেখা দিতেছে, বুঝি ঐ মহাপাপ কালাচাঁদ-কর্ত্তৃক আমার বিষয়-সর্ব্বস্ব বিনষ্ট হইল! বুঝি কালাচাঁদ আমার জিহ্বা টানিয়া ধরিয়া আমার প্রাণ-বধার্থ উদ্যত হইয়াছে। আমি কোথাই যাই! কোথায় গেলে রক্ষা পাই!

বৃদ্ধ হরিতারণ দত্ত, সে রাত্রে প্রকৃতই এইরূপ ছটফট্ আই-ঢাই করিতে লাগিলেন। কখন্ যে কি কথা ভাবেন, তাহার কিছুই ঠিক থাকে না। তিনি কোনরূপ সু-মীমাংসায় উপনীত হইতে পারেন না! তিনি যখন যে মন্ত্রণাটী স্থির করেন, তখনই তাহার শত শত দোষ দেখিতে পান।

বৈশাখের সেই কালরাত্রে আদৌ ঠাকুরদাদার চক্ষে ঘুম আসিল না। তাঁহার দেহ যেন তুষানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। তাঁহার হৃৎপিণ্ডটা হামানদিস্তায় কে যেন ছেঁচো করিতে লাগিল। তাঁহার চোখে কে যেন অসংখ্য ক্ষুরধার ছুঁচ বিঁধিতে লাগিল।

ঠাকুরদাদা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া "ত্রাহি মধুসূদন, ত্রাহি মধুসূদন,"—ডাক ছাড়িতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কবি কহিয়াছেন,—

কর্ম্মফলে কপালে কেবল সুখ-দুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক॥
স্কন্ধে করি বয় কেহ, কেহ চাপে স্কন্ধে।
যত দেখ ফলাফল সেই কর্ম্ম বন্ধে॥

ঠাকুরদাদা এ অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়া,—কষ্ট পাইতেছেন,—কেবল সেই আপনার কৃতকর্ম্মের ফলে। কালাচাঁদ এই রাজাবিশেষ ঠাকুরদাদার নাতী হইয়াও, স্বয়ং ধীশক্তিসম্পন্ন, প্রশস্তমনা হইয়াও, কষ্ট পাইতেছেন,—কেবল সেই আপনার কৃতকর্ম্মের ফলে।

কালাচাঁদ, ঠাকুরদাদার কাছে ভিটার ভাগ লইতেও আইসেন নাই, বিষয়ের অংশ লইতেও আইসেন নাই,—আসিয়াছেন, আপন খেয়ালে, আপন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য। কালাচাঁদ এখনও জানেন কিনা সন্দেহ যে,—তাঁহার ভিটায় ঠাকুরদাদা এক ত্রিতল অট্টালিকা বিনির্ম্মিত করিয়াছেন,—স্বগ্রামে তাঁহার পুকুর বাগান ভিটা আছে কিনা, হয়'ত এখন তাঁহার মনেই নাই! মনে থাকিলেও, সে দিকে এক্ষণে তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র দৃক্‌পাতও

নাই! সে ভিটায় বসবাসের স্বত্ব ঠাকুরদাদারই হউক, অথবা শৃগাল-কুক্কুর-সর্পেরই হউক—সে সম্বন্ধে কালাচাঁদের কিছুই ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি আসিয়াছেন, আপন মনে, অন্য কারণে,—ঠাকুরদাদার সহিত সাক্ষাৎ করিতে।

কোথায় কিছুই নাই,—মেঘ নাই, বিদ্যুৎ নাই, বজ্রাঘাত নাই,—অথচ ঠাকুরদাদা যন্ত্রণায় অস্থির! সর্ব্বদিক্ সুপ্রসন্ন, ধূলা-রহিত বায়ু মন্দ মন্দ বহিতেছে, নীলাকাশের কোল দিয়া বক-কুল উড়িয়া যাইতেছে,—অথচ ঠাকুরদাদা কাতর,—মর্ম্মপীড়াগ্রস্ত, যেন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত! কেন এমন হয়?—সেই কেবল কর্ম্মফল।

কালাচাঁদ যে, আজ প্রায় তিন দিন খাইতে পাইলেন না, তাহাও কর্ম্মফল। ভূরি-ভোজনের মহামহোৎসবে, একশত আট রকম ভোগের সুবন্দোবস্তে, কালাচাঁদের উদরের এক কোণের এক-ষোড়শাংশও যে পূর্ণ হইল না,—ইহাও সেই কর্ম্মফল।

কালাচাঁদ ঠাকুরদাদার নিকট কেন আসিলেন? কেন হঠাৎ তাঁহার এরূপ মতিগতি ফিরিল? কালাচাঁদ আজ ছয় মাস কাল হুগলীতে আছেন;—একটী-দিন ব্যতীত, তিনি ঠাকুরদাদার হুগলীস্থ বাসাবাটীর উঠান মাড়ান নাই এবং সেই একটী দিনেও তিনি ঠাকুরদাদার উপর মহা-বিরক্ত হইয়া সে বাসা পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন। যদি এমনটাই হইল, তবে আজ আবার এরূপ বিপরীত ভাব ঘটিল কেন?

আজ শুধু আগমন নয়,—মাছ-দই-সন্দেশ লইয়া আগমন,—হাসি-হাসি মুখে, ভাবে গদ্গদ হইয়া আগমন,—প্রেম-প্রীতি-ভরে যেন মাটীতে লুটাইতে লুটাইতে আগমন! কেন এমন হয়?

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি,—কালাচাঁদ-চরিত্র আঁকা

বড় কঠিন,—বুঝা ততোধিক কঠিন! যদি এ কালাচাঁদ-কীর্ত্তি-কলাপের কোন কথা কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম না হন, তাহা হইলে জানিবেন, হয় আমার লিখিবার দোষ, না হয় তাঁহার বুঝিবার দোষ। অধিকাংশ বাঙ্গালী-পাঠকই অন্তঃসার-শূন্য,—উপর দেখিয়াই উন্মত্ত,—বাহ্য-চাক্‌চিক্যে বিমোহিত। লিখিবার দোষ-টুকু যে, বুঝিয়া, সারিয়া লইবেন,—সে আশাও কম।

সেই আশা কম বলিয়াই, প্রতিপদে কৈফিয়ত দিতে হয়। বাজে কৈফিয়তে বিজ্ঞ পাঠকের বড়ই বিরক্তি জন্মে। বিজ্ঞ, বড়জোর হাজারকরা একজন। নয়শত নিরানব্বই জন লেখাপড়া শিখিয়া মা-সরস্বতীর বরপুত্র। এই বরপুত্রগণকে উপেক্ষা করিয়া, পশ্চাতে ফেলিয়া যাওয়া কি উচিত? কাজেই কৈফিয়ত দিতে হয়।

কালাচাঁদ-চরিত্র বিচিত্র। সাদা, লাল, কালো—সবরকম রঙই আছে। সরু-মোটা, তিক্ত-মধুর, নরম-গরম—সকলপ্রকার ঢঙই আছে। কালাচাঁদ কখন স্বর্গে, কখন মর্ত্ত্যে, কখন পাতালে—এ চরিত্র কি আঁকা যায়?

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

মহাক্ষুধায় প্রপীড়িত কালাচাঁদ গতকল্য নিশীথে গঙ্গার ঘাটে বসিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, আপন মনে স্থির করেন,—"চুরি করায় কোনও দোষ নাই।" পূর্ব্বে পূর্ব্বে যখন চুরি করিতেন, তখন তাঁহার ধারণা ছিল যে,—তিনি একটা মন্দ কাজ করিতেছেন। ক্রমশ চৌর্য্যকর্ম্ম অভ্যস্ত হওয়ায়, মন্দ-কাজ-করার আঘাত তাঁহার হৃদয়ে বড় একটা লাগিত না। তবে স্থূলত এই বিশ্বাস ছিল, চুরি করা অপকর্ম্মের মধ্যে গণ্য। তৎপরে গ্রহ-বৈগুণ্যে তাঁহার কারা-বাস হয়। তিন বৎসর কাল কারা-কূপে বাস করার পর, তিনি যখন খালাস পাইলেন, তখন পৃথিবীকে যেন নূতন দেখিলেন। আলোকমালায় বিভূষিত, স্বচ্ছন্দ বিহারী পক্ষিকুল দ্বারা ধ্বনিত, সুখস্পর্শ সমীরণ সেবনে সদা প্রফুল্লিত—ধরাধামের এই রূপ অপূর্ব্ব রঙ্গ-ভঙ্গ দেখিয়া কালাচাঁদের হৃদয়ে কেমন এক অভিনব উল্লাসের উদয় হইল। কারাগারেও কালাচাঁদ একরকম সুখে রাজত্ব করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু সে সুখ রাজার সুখ, ব্যবসাদারের সুখ,—নিকৃষ্ট লৌকিক সুখ। কিন্তু মুক্তির পর যে সুখোদয় হইল, তাহা যেন ঋষির সুখ,—নির্ব্বাণমুক্ত পুরুষের সুখ। কালাচাঁদ সদানন্দ পুরুষ হইলেন। অন্ধব্যক্তি বহুদিন পরে বহু-কষ্টে চক্ষুরত্ন-লাভ করিয়াছে, আর কি রক্ষা আছে? কালাচাঁদের কি আহ্লাদের সীমা আছে?

ক্রমশ কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন,—"কেন মিছে চুরি করিয়া মরি!!"—এইবার কিন্তু সুখে দুঃখ আসিল। ভাবনাই দোষ।

ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার হৃদয়ের সেই পরম উল্লাস,—সেই নির্ব্বাণ-মুক্ত পুরুষের ন্যায় সুখ কমিল! সুখ কমুক,—তিনি কিন্তু চুরিবৃত্তি ছাড়িয়া দিলেন; লোকের দুঃখ-দূরীকরণার্থ তাঁহার সঞ্চিত অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন,—স্ত্রীমণ্ডলী তাঁহার কাছে জননীর ন্যায় পূজনীয়া হইলেন।

কালাচাঁদের দেহে ভাবনা-কীট প্রবেশ করিল। কি ভাবনা,—তাহা কালাচাঁদও ভাল বুঝিতে পারেন না। মোদ্দ,—তিনি কেবল ভাবেন!—নীরবে, নিস্পন্দে কখন হয় ত এক প্রহর কাল এক স্থানে বসিয়া থাকেন! অন্নে রুচি কমিল। দেহও যেন কিঞ্চিৎ দুর্ব্বল হইল।

কালাচাঁদের ভাবনার আদি-অন্ত-মধ্য নাই—আরম্ভ-শেষ-সীমা নাই,—মাত্রা-ওজন-পরিমাণ নাই,—আছে কেবল, ভাবনা আর ভাবনা! ভাবনার অনন্ত সমুদ্র;—যে দিকে চাই, সেই দিকেই ভাবনা! মধ্যে মধ্যে আবর্ত্ত-বুদ্‌বুদ্‌-তরঙ্গ-ফেন-সঙ্কুল।

কালাচাঁদ কখন ভাবেন,—"আচ্ছা, আমি পতিতপাবনের আশ্রয়ে থাকি কেন? পতিত ত পাকা গাঁটকাটা, তাহার সহবাসে থাকিলে ত আমারও দেহমন কলুষিত হইতে পারে! কিন্তু পতিতকে ত্যাগ করিই বা কেমন করিয়া? পতিত আমার প্রথম আশ্রয়-দাতা। আশ্রয়দাতাকে উপেক্ষা করা ত কখনই উচিত নহে! করি কি?"

কালাচাঁদ আরও ভাবেন, 'পতিত যে আমাকে সহজে ছাড়িবে, এমন ত বোধ হয় না। পতিত আমার নিকট হইতে পয়সা পায়, খাবার সামগ্রী পায়, মিষ্ট কথা পায়। এমন কল্পতরুকে সহজে কে ত্যাগ করিবে? আমার যদি কখন পয়সা কমে, তথাচ

পতিত আমাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না। কারণ পতিত জানে, আমার ক্ষমতা অসীম। আজ যদি পয়সা না থাকে, দুদিন পরে আবার অনেক পয়স হইতে পারে।

"আর আমার পয়সাই বা কমিতে গেল কেন? সৎপথে থাকিলে 'অর্দ্ধেক-রাত্রে অন্ন হয়'। আমি ত এখন আর কোন মন্দকর্ম্ম, অসৎকর্ম্ম, পাপকর্ম্ম করিতেছি না যে, আমি অন্নাভাবে বা অর্থাভাবে কষ্ট পাইব? সাধু ব্যক্তি সদাই সুখী,—আমার অসুখ হইবে কেন?

"পতিতপাবন শঠ, প্রবঞ্চক, চোর হউক,—আমাকে বুঝি সে যথেষ্ট ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে। সে-দিন আমার জ্বর হইল, পতিত আমার কত সেবা-শুশ্রূষা করিল। প্রকৃতই পতিতের আমার প্রতি যেন বড়ই মমতা জন্মিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। চোর-ডাকাতদেরও-ত স্ত্রীপুত্র-পিতামাতার প্রতি স্নেহ-ভক্তি আছে,—এস্থলে, পতিতের আমার প্রতি ভক্তি-ভালবাসা না থাকিবে কেন?

"অতএব যে-দিক্ দিয়া, যেভাবেই দেখি, পতিতের হাত হইতে কোন দিকেই পরিত্রাণ দেখিতে পাই না। অথচ পতিতের গৃহে, পতিতের সহিত একত্র বসবাস করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে! করি কি?

"আচ্ছা পতিতের গৃহে থাকিতেই বা দোষ কি? পতিত মন্দ হয়, হউক; আমি মন্দ না হইলেই ত হইল। সত্য বটে, মিথ্যা-কথা পতিতের অঙ্গের ভূষণ, কিন্তু তা হউক,—আমি মিথ্যাকথা না কহিলেই ত হইল। নিজে খাঁটি থাকিলে, অপরে কে কি করিতে পারে? আমার কি এরূপ শক্তি নাই যে, আত্ম-সমর্থন-পূর্ব্বক আমি এ সংসারে অবস্থান করি? শক্তি আছে বৈ কি?

আর, শক্তি থাকিলে সবই সম্ভব। শক্তি ছিল বলিয়াই মহাদেব কণ্ঠে মহাবিষ রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। আর, আমি কি এমনই অক্ষম যে, আমি এই ক্ষুদ্র পাপের সংস্রবে থাকিতে সক্ষম হইব না?”

কালাচাঁদের চিন্তাস্রোত এই ভাবেই প্রবাহিত। তিনি কখন কোন্ কথা ভাবেন, তাহার কিছুই নির্ণয় নাই। ‘কুলবধূর প্রতি কটাক্ষপাতে দোষ কি? কেবল চোখের দেখা একবার দেখিয়া লইব বইত নয়?—ইহাতে কোন পক্ষেরইত ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। পুরুষের নয়নকর্ত্তৃক একদৃষ্টে নিরীক্ষিত হইলে, রমণীর কোমল অঙ্গ ক্ষয় প্রাপ্ত হয় কি? দৃষ্টি কি মহাদ্রাবক? না,—ব্রহ্মাস্ত্র? ও সব কিছুই নয়। কেবল দেখা। দেখায় আসে-যায় কি? গোলাপ-ফুল, মল্লিকাফুল, চাঁপাফুল,—একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিলে ত কেহ দোষ দেয় না। সুন্দরী-রমণী সংসার-অরণ্যের প্রস্ফুটিত পদ্ম-পুষ্পের তুল্য;—ক্ষণভঙ্গুর মানব দেহ ধারণ করিয়া, স্বভাবের সে শোভা সন্দর্শন-পূর্ব্বক নয়ন সার্থক না করিব কেন? শরদাকাশে বৎসরান্তে দুইটী দিন মাত্র সুখকর পূর্ণচন্দ্র উদিত হন, কিন্তু এই ধরাধামে কত সুধামুখীর মুখচন্দ্র বারমাস ভূমে গড়াগড়ি যায়। আকাশের চন্দ্রটীকে দেখিলে কোন দোষ নাই,—কিন্তু এই পৃথিবীর চন্দ্রের পানে চাহিলেই যত গোলযোগ!

“ভাল হউক মন্দ হউক, দোষ হউক গুণ হউক,—আমি সতী সুন্দরী রমণীর মুখ-চন্দ্রের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিব। চাহিয়া, চাহিয়া, বিধাতার সৃষ্টি-নৈপুণ্য দেখিব। মনে মন্দভাব না থাকিলেই হইল!

‘দেখিব ত মনে করি,—কিন্তু কেমন বাধ-বাধ ঠেকে! কেমন

যেন চক্ষুলজ্জা হয়। রমণীর সঙ্গে যদি চারি-চক্ষে চাওয়া-চায়ি হইয়া যায়, তাহা হইলে ত গিয়াছি! স্ত্রীলোকটী মনে করিবে কি? সে যদি ভাবে, আমি কামভাবে তাহার পানে তাকাইয়া আছি, তাহা হইলে ত এ কাজ বড় সুবিধাজনক নহে। তখন সেই কুলবালা লজ্জায় কতই না ম্রিয়মাণ হইবে! হয় ত ভয়ে থরহরি কাঁপিবে! আর, আমাকে মনে করিবে, এ একটা দুষ্ট, পাপিষ্ঠ, লম্পট পশু! আর এক কথা, যদি সেই কুলবালাটী কুচরিত্রাই হয়,—তাহা হইলেই ত সে-ও এক মহামুস্কিল কাণ্ড। সে আমাকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল! আমিও তাহাকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম! তখন ত ঘোর বিপদ্ ঘটিয়া উঠিবে! অগত্যা আমি তাহার রূপমাধুরী দেখিতে ক্ষান্ত হইলাম; কিন্তু সে যদি আর ক্ষান্ত না হয়,—আমাকে দেখিতেই থাকে,—আর বলে, 'আমি কেবল স্বভাবের শোভামাত্র দেখিতেছি;—সুতরাং তাহাতে আমার লজ্জা ত নাই-ই, কিন্তু তোমার হঠাৎ এমন শুধু-শুধু লজ্জা হয় কেন? অতএব হে নবীন-পুরুষ-বর। তুমি চক্ষু তুলিয়া, আয়ত-লোচনে আমার প্রতি চাহিয়া থাক।'—তখন উপায়?

"এ যে বড় বিষম দায় দেখিতেছি! সুন্দরী—যুবতী—জিনিসটাই খারাপ! ওর ভাল-মন্দ ভেদ নাই, বাস্তু-উটকো বিচার নাই, নরম গরম তারতম্য নাই,—ঐ বস্তুটাই বদ্!—দপদপে আগুনের খাপরা! দূর হইতে মনে হয়, বুঝি ঐ আমার সাতরাজার ধন একটী নীলকান্তমণি জ্বলিতেছে।—কিন্তু কাছে গেলেই পুড়িয়া ছাই হইতে হয়! এই কথাই ঠিক। অন্যের দেখিয়াছি, নিজে ভুক্তভোগীও বটি,—একবার ঝোঁক ধরিলে ত আর রক্ষা নাই! তখন যাঁপ্পীর কলেও, সে বেগ টানিয়া রাখিতে পারে না!

"আরও একটা কথা শুনিয়াছি,—ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজন। যদি স্পর্শনে পূর্ণ পাপ হয় তবে দর্শনে অর্দ্ধ পাপ না হইবে কেন?

আরও কথা আছে। ক্রমশ দেখিতে যদি লোভ জন্মিয়া যায়!—তখন উপায়? প্রথমে না হয় স্বভাবের শোভা বলিয়াই দেখিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু শেষে যদি গোল বাধে?—তখন রক্ষা করিবে কে? মন যদি মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় বৃংহিত ধ্বনি করিয়া উঠে, তবে তখন তাহাকে থামাইবে কে? মনকে বিশ্বাস কি? মনটী ঠিক কালসাপ। দেহ-গৃহে বাস। দেখিতে বেশ ভালমানুষটীর মত। কিন্তু সুবিধা পাইলেই কুট্ করিয়া কামড়!—অমনি বিষে জর্জ্জরিত দেহ!

"আচ্ছা,—সুন্দরীর রূপমাধুরী নাই দেখিলাম!—তাহা হইলেত সকল গোলই চুকিয়া যায়! মেয়েমানুষের মুখ না দেখিলে যে, হাঁড়ি-চড় বন্ধ হয়—এমন ত কিছু নয়? বলিতে পার, স্বভাবের সুন্দর শোভা সন্দর্শনে বঞ্চিত হইলাম। স্বভাবের ঐ শোভাটী না দেখিলে কি তোমার সংসার অচল হয়? আরও ত অজস্র শত শত, সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ, শোভা রহিয়াছে, তাহাই কেন দেখ না? নীলাকাশ দেখ না? অনন্ত কাল, বসিয়া বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া নীলাকাশ দেখ না? আকাশ পছন্দ না হয়,—সবুজ ময়দান দেখ—বেশ লহ লহ ঘাস পূর্ণ মনোহর মাঠ দেখ। ঘাসে রুচি না হয়, সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে বসিয়া, অনন্তবিস্তৃত তরঙ্গভঙ্গময় সমুদ্র সন্দর্শন কর। স্বভাবের শোভা দেখিতেই, যদি এত সাধ, তবে হিমালয়ে যাও—ধবল-গিরিতে বাস কর। আহারার যাও, মরুভূমে ভ্রমণ কর। কেবল মেয়েমানুষের সেই মুখটী না দেখিলে কি তোমার স্বভাবের শোভা দেখা হয় না? ছি!!

রমণী জননীর ন্যায় পূজনীয়া। কুলবধূ—দেবী—স্বর্গের সামগ্রী। দুর্ব্বল মানব সেই দেবীর মুখকমল দেখিবার অধিকারী নহে,—উপযুক্ত নহে। এই কথাই ঠিক্। কুলকামিনী সম্মুখে সমুপস্থিত হইলে, আমি কেবল তাঁহার চরণযুগল নিরীক্ষণ করিয়াই নয়ন সার্থক করিব।"

কালাচাঁদের রমণীসম্বন্ধিনী ভাবনা এইরূপই। সম্যগ্রূপে এই ব্যাপার বর্ণন করিতে সক্ষম হইলাম কি না জানি না! কেন না, এরূপ ভাবনার কূল-কিনারা নাই! কখন এই—কূলের কাছে, কখন ঐ—মাঝ-দরিয়ায়! কখন তরণীর কোলে নিশ্চিন্তমনে সুখ-শয্যায় শয়ান, কখন গভীর আবর্ত্তে পড়িয়া নিরন্তর ঘূর্ণমান! কিছুই ঠিক নাই,—কেমন করিয়া এ কাহিনী কীর্ত্তন করিব?

কালাচাঁদ যে একটী-দিন মাত্র এক বেলা বসিয়া স্ত্রীলোক-ঘটিত বিষয় ঐরূপ ভাবিয়াছিলেন, তাহা নহে। দিন নাই, রাত নাই, যখন খেয়াল চাপিত, তখনই ঐ কথা তোলাপাড়া করিতেন। হয় ত একই কথা একশ-বার প্রস্তাব, আলোচনা এবং মীমাংসা করিতেন। কিছুরই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না।

কারাগার হইতে কালাচাঁদ কয়েক-শত টাকা আনিয়াছিলেন। কিন্তু পতিতপাবনের বাসায় অবস্থান কালে তিনি অর্থের উপর নির্ম্মম হইলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করেন টাকাত খোলামকুচি,—টাকাতে আছে কি? একটা সাদা চাকৃতি বৈত নয়? এই টাকার জন্য মানুষ মারামারি করে, রক্তপাত করে,—এই টাকার জন্য বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়, পিতাপুত্রে বিবাদ হয়, মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। টাকাটা বড় বদ্ জিনিষ—উহা ঘরে রাখতে নাই। অতএব কর বিদায়—টাকা। সম্মুখে সুপাত্র দেখিলে—দাও টাকা। বস্ত্রহীনে

বস্ত্র কিনিয়া দাও; ক্ষুধার্ত্তের ক্ষুধা-শান্তি কর; পিপাসার্ত্তকে শীতল জল দাও।

কালাচাঁদ দানের উপযুক্ত পাত্র বুঝিয়া দান কার্য্য আরম্ভ করিলেন। কাহাকেও চারি আনা, কাহাকেও আট-আনা, কাহাকেও একখানা কাপড়, কাহাকেও দুইসের চাউল,—কালাচাঁদ সাধ্যমত দিতে লাগিলেন। কালাচাঁদকে ঠকাইতে লাগিল,—কেবল বন্ধু-পতিতপাবন পরামাণিক। যাহার কোন অভাব নাই, পতিতপাবন তাহাকে ছেঁড়া কাপড় পরাইয়া. দুঃখী সাজাইয়া, কালাচাঁদের নিকট আনিত; কালাচাঁদ সেই দুঃখীকে যাহা দিতেন, পরামাণিক তাহার অর্দ্ধেক ভাগ তাহার নিকট হইতে লইত। কালাচাঁদ এ সব বুঝিয়াও, তাহা উপেক্ষা করিতেন। যে মাছটীর মূল্য পাঁচ আনার অধিক নহে, পতিত সেই মাছটী বাজার হইতে হাতে করিয়া আনিয়া বলিত, "বন্ধু! তোমার জন্য ৸১৭॥ বার আনা সাড়ে তিন পয়সা দিয়া এই মাছটী এনেচি!—এর কি আমি দাম নিতে পারি?—তুমি খেয়ো।" বলা বাহুল্য, কালাচাঁদ সে মাছের কথিত মূল্যত দিতেনই, অধিকন্তু সে মাছের বার আনা অংশ উপহার স্বরূপ বিনামূল্যে বন্ধু-পতিতপাবনকে অর্পণ করিতেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

অনন্ত গুণাকর পরামানিকের আর একটী অন্তরের সাধ ছিল। সে আশা ফলবতী করণার্থ সেই নাপিত-কুল-ধুরন্ধর বহুবিধ বিশেষ চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু কিছুতেই সেই প্রাণের সাধ পূর্ণ হয় নাই।

সেটি কি? এমন কিছু বিশেষ বিষয় নয় যাহার জন্য ঔৎসুক্যের আবশ্যক! এই,—কিঞ্চিৎ মদ এবং বেশ্যা। এই, কি জানলেন,—কালাচাঁদ একটু আমোদ-প্রমোদ করেন, সুখে স্বচ্ছন্দে হেসে-খেলে বেড়ান—বন্ধু-পণ্ডিতের ইহাই ইচ্ছা। কালাচাঁদের এই উঠতি বয়স,—একটু-আধটু নেশা না করিলে মনের স্ফূর্ত্তি হবে কেন? আর, কালাচাঁদের এই ঘোরতর যৌবনে রমণী ব্যতীত শয্যাগৃহ সজ্জিত হয় কি?—পরমবন্ধু পতিতপাবনের অন্তরে অহর্নিশি এ সকল কথাই উদিত হইত।

এ দিকে বাক্চাতুর্য্যে পতিতপাবন কথঞ্চিৎ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার নানাস্থানে যাতায়াত ছিল, নানা নর-নারীর সহিত আলাপ ছিল।

কালাচাঁদ একদিন পণ্ডিতের ঘরে একাকী বসিয়া আছেন, এমন সময় একটী মেয়েমানুষ আসিয়া দাঁড়াইল। বয়স্ তাহার বছর বাইশ। আধ-ঘোমটা দেওয়া। পরণে রাঙ্গাপেড়ে শাড়ী। হাতে বেলওয়ারি চুড়ি। কপালে একটি টিপ। মেয়েটি আসিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতে, পণ্ডিত দৌড়িয়া আসিয়া কালাচাঁদকে বলিল,—"বন্ধু! এই ঝীটিকে অনেক কষ্টপেয়ে খুঁজে খুঁজে এনেচি।

বড় ভাল মেয়ে এটী। অতি-ই সৎ। মুখে কথাটী নেই। যখন যা বল্‌বে, তখনি তাই কর্‌বে! ঘর ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, বিছানা করা, পান সাজা—সকল কাজই এর দ্বারা হবে। জাতিতে সৎগোপ। বন্ধু! প্রত্যহ উনুন ধরিয়ে রেঁধে খেতে আমার কষ্ট হয়,—তা, ইনি থাক্‌লে, সে সব কিছু দেখতে হবে না! আর, তোমার ঘুম থেকে উঠে রাত্রে দু-তিনবার তামাক খাওয়া আছে; তা, একে বল্‌লে,—ইনি এই ঘরের দাওয়ায় রাত্রে শুয়ে থাকতে পারেন,—আর উঠে উঠে তোমাকে তামাক-টামাক সেজে দেবেন। একে কিছু বেশী মাইনে দিয়ে, রাত-দিনের ঝী ক'রে রাখ্‌লে, বন্ধু! তোমার আর কোন ক্লেশ হবে না।"

স্ত্রীলোকটীকে সম্মুখে রাখিয়া পণ্ডিত এই ভাবেই বক্তৃতা করিতে লাগিল। কালাচাঁদ সেই ঝীটির ত্রিভঙ্গ ঠাট দেখিয়াই অবাক্! সহসা তাঁহার মুখ হইতে বাক্যস্ফুরণ হইল না। তখন সাবেক বৃদ্ধা ঝীর গুণকীর্ত্তন ব্যাপারে, পণ্ডিতের বক্তৃতা-স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিল,—"হ'রের মা-বেটী বুড়ী, বজ্জাত,—কাণে শুনতে পায় না, চোখে দেখতে পায় না,—সে, বাসন মাজলে থালে এটো সকৃড়ি থাকে। সে, বেলায় আসে, সন্ধ্যে হ'লেই চলে যায়,—বাজারের পয়সা চুরি করে। বন্ধু, তাকে আর কাজ নেই,—তার বদলে একে রাখ। এ মেয়েটী আমাদের জানা-শুনা লোক, বিশ্বাসী। স্বভাব-চরিত্তির ঠাণ্ডা। মুখে কথাটী নেই। এমনি এর মেজাজ যে, কোন কাজ ক'র্‌বো না, বা কর্ত্তে পার্‌বো না—এমন কথাটী এর মুখ দিয়ে কখন বেরুবে না। আর কি জান, বন্ধু! তোমারও ত সুখ-অসুখ আছে। তা, সুখে-অসুখে ইনি তোমার বেশ যত্ন-সেবা কর্‌তে পার্‌বেন।"

স্ত্রীলোকটীর চেহারা দেখিয়া এবং পতিতের কথা শুনিয়া ক্রমশ কালাচাঁদের চক্ষুস্থির! পতিত অবিরত মিথ্যা কথা কয়, ঠকাইয়া পয়সা লয়, চোরাই মাল কিনে,—এ সকল কালাচাঁদের সহ্য হইয়াছিল। কিন্তু এই বঙ্কিম-ভাবাপন্না, চারুচন্দ্রবদনা, কুটিলায়ত-নয়না স্ত্রীমূর্ত্তিকে দাসীরূপে রক্ষা করিবার প্রস্তাবে তিনি মহাবিরক্ত হইয়া উঠিলেন। এটী কি গৃহদাসী, না স্বর্গের চক্রিণী? ইহাকে যেরূপ সু-পরিষ্কার, সু-পরিচ্ছন্ন, রঙ্গরাগে পরিপূর্ণ দেখিতেছি, তাহাতে এ আমার বাসন মাজিবে কি!—ইহারই যে, বাসন মাজিতে আমার ইচ্ছা হয়! দণ্ডবৎ! কাজ নাই আমার এমন ঝীয়ে!

কালাচাঁদ এরূপ ভাবিলেন বটে, কিন্তু পতিতকে যে হঠাৎ চটাইয়া দিবেন, বা ঝগড়া করিবেন,—এরূপ তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। কি কথা বলিবেন, কি উত্তর দিবেন—কোন্ কথা বলিলে, সবদিক্ বজায় থাকে,—কালাচাঁদ বিব্রত হইয়া ইহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

পতিত, কালাচাঁদের এপর্য্যন্ত কোন উত্তর না পাইয়া আবার বলিল,—"কি বলো, বন্ধু!—তবে কালথেকেই এই মেয়েটী কাজ-কর্ম্ম করুক—"

কালাচাঁদের মুখে তথাচ কোন কথা নাই। কালাচাঁদ ভাবিতেছেন, "কি বিপদ! এ যে মহামুস্কিল কাণ্ড বাধালে দেখ্‌চি—"

কালাচাঁদকে আর অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না। সাবেক ঝী, —সেই হ'রের মা—সেই বুড়ী ঘরের ভিতর আসিয়া পড়িল। বলিল, "কুসমীকে আর, কালথেকে আসতে বলা কেন? ও এসেচে,—আজ থেকেই কাজ করুক!—আমি এমন চাকুরি কত্তে চাই না! গতর থাকলে ঢের চাকুরি হবে। ভগমান জীব দিয়েচেন

আহার দেবেন! কুসুমা তোমাদের এখানে থাকুক্, দিনে-রেতের কাজ করবে!—"

পতিত নীরব। পতিত ভাবে নাই যে, হ'রের মা এখনি আসিয়া পড়িবে। পতিতের এখন চিন্তা,—"হ'রের মা যদি সব কথা শুনে থাকে তা হ'লে একটা হুলস্থূল বাধাবে আমি তাকে, চোখে দেখতে পায় না, কাণে শুনতে পায় না,—অবিশ্বাসী চোর বলেচি;—এ-সব কথা যদি হ'রের মা শুনে থাকে, তবে সে এখনি একটা কুরুক্ষেত্তর ক'র্‌বে।" বলা বাহুল্য, হরির মাতার শুভাগমনে পতিত নিতান্ত অপ্রতিভ এবং একান্ত বাক্‌শক্তিহীন হইল।

হরির মা। অগো গেরস্থরা! তোমরা জিনিস-পত্তর বুঝে নাও,—আমি চল্লেম! নাও না গো,—দেরি কচ্চো কেন?

কালাচাঁদ মনে মনে বড়ই আনন্দিত হইলেন। মনে মনে বলিলেন,—এ সঙ্কটে, এ ঘোর বিপদে শ্রীমধুসূদনই আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। হরির মা! এ জন্মে আমি তোর ধার শুধিতে পারিব না। তুই আজ আমাকে বড় বাঁচিয়েচিস্! তুই ভয় করিস্ না! দুকথা বলে নে! আমি তোকে একখানা পাটের কাপড় কিনে দিব।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত হরির মা কোন উত্তর না পাইয়া, অঙ্গের বসন কতকটা উন্মোচন করিয়া, আঁচল ঝাড়া দিতে আরম্ভ করিল। মুখে বলিতে লাগিল, "এই নাও,—তোমরা দেখে নাও—আমি কোন জিনিসপত্তর নিয়ে যাচ্চি কি না?—এই দেখো, এই দেখো—"

ক্রমশ অঙ্গবস্ত্র ঈষৎ অধিক মাত্রায় অঙ্গমুক্ত হইতে থাকিল!

পতিত ভাবিল, এ যে ঘোরতর বিপদ্ দেখিতেছি। মাগী ক্রমশ উলঙ্গ হইবে না কি? তখন আর নীরব থাকিতে না পারিয়া,

পণ্ডিত অগত্যা হরির মাকে একটু মিষ্ট কথায়, আমৃতা-আমৃতা করিয়া বলিল,—"হরির মা! তুমি অমন কর্‌চো কেন? তোমাকে ত এখন কেউ কিছু বলে নাই! তুমিও থাকো না কেন?"

হরির মা। আমার আর কি থাকা-থাকির বয়স আছে? আমার হাতে চুড়ি নেই, দাঁতে মিসি নেই, ঠোঁটে আল্‌তা নেই,—আমার দ্বারা বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া চল্‌বে কেন? আমা যদি মিহি শাড়ী থাক্‌তো, পেটো পাড়া চু থাক্‌তো,—বেঁকে বেঁকে কোমর ঘুরিয়ে চলা থাক্‌তো,—ত, হ'লে আজ আমি সোহাগের ঝী হতেম! আমাদের তিন-কাল গিয়ে এক-কালে ঠেকেচে, কাজেই আমরা কাণা, কালা, চোর হয়েচি,—কাজের বার হয়েচি। থাকুক কুস্‌মী,—ওর এখন চোখ ভাল, সব দেখতে পাবে; কাণ ভাল, সব শুনতে পাবে;—ওর এখন হাতের রস আছে, বাসন মাজবে ভাল; ওর এখন পেটে বুদ্ধি আছে, হাটবাজার কর্‌বে ভাল;—অলো! কুস্‌মী! আয়লো!—এখন তোর ঘর, তোর দোয়ার হ'লো,—জিনিস-পত্তর সব দেখে-শুনে বুঝে নিবি আয়!

নবাগতা ঝী-রূপিণী মহিলাটীর নাম—কুসুম-কামিনী। হরির মায়ের হঠাৎ এরূপ আগমনে এবং এরূপ বাগ্‌বিতণ্ডায় সে-ও কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ এবং বিব্রত হইল! কিন্তু হরির মায়ের এখন ঝগড়ার মুখ,—হঠাৎ কোন কথা কহিলে মিছা গণ্ডগোল বাধিয়া যাইবে,—এই ভাবিয়া কুসুম এতক্ষণ নীরব ছিল। কিন্তু হরির মা ক্রমশ যখন কুসুমের উপরই সকল কথা ঝোঁক দিয়া বলিতে আরম্ভ করিল, তখন আর সে নীরব থাকিতে পারিল না। ধীর অথচ কঠোরস্বরে বলিল,—"হেঁগা, তুমি আমাকে নিয়ে অমন কর্‌চো কেন? তুমি যা বল্‌বে, ওঁদিগে বল—"

হরির মা। তোকে আবার কে কি ব'ল্লে যে,—তোর অম্‌নি ঠ্যাকার হলো! সোয়াগে যে, গ'লে পড়েচিস্ লো!—গরবে যে মার গা ধরে না!—

কুসুম তখন সুর একটু রুক্ষ করিল। উচ্চকণ্ঠে বলিল, "তুমি আবার আমার আজ সোয়াগটা কিসে দেখ্‌লে গা? তুমি যাকে তাকে, যা-না-তাই বল?—কেন বল দেখি?

হরির মা তখন একটা বিকট মুখভঙ্গি করিয়া বলিয়া উঠিল,—"অ্যাঁ—কুস্‌মিলো!

তুই অত করিস্ না—অত করিস্ না।
সজ্‌নে খাড়ার মত যেন ঝুলে পড়িস্ না॥

পাড়া-মজানি! পাড়া-ঢলানি! সাতপাড়া মজিয়ে আবার এখানে মজাতে এসেচিস্! তোকে কে না জানে লো! তোর সকল কথা বল্‌তে গেলে প্রাচিত্তির কত্তে হয়।"

কুসুমকামিনী তখন 'দশ-বাই-চণ্ডী' হইলেন। নিজমূর্ত্তি ধরিয়া বাহু নাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"তোকেই বা না জানে কে লো? ডাইনি! রাক্কুসি! তোর মেয়ের খপর রাখিস্—সে এখন কোন্ মুলুকে আছে? আগে তোর ঘরের খপর রাখগে লো,—তার পর পরের খপর রাখিস্—"

হরির মা তখন গাছ-কোমর বাঁধিয়া, চক্ষু দুইটী কপালে তুলিয়া, দন্তে দন্ত ঘর্ষণপূর্ব্বক কিড়্-কিড়্-কিড়্-কিড়্ শব্দ করিয়া, আঁউ আঁউ রবে, কাল-ভৈরবীর ন্যায় তিড়িং তিড়িং নৃত্য করিতে লাগিল। রণভূমি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

পতিতপাবন 'হতভম্ব'। মুখে কথা নাই, চক্ষের পলক নাই, নাসিকারও বুঝি নিশ্বাস নাই।

কালাচাঁদের অন্তরে কেবল আনন্দস্রোত প্রবাহিত। দেহ পুলকে পূর্ণ। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন,—"নারোদ! নারোদ!"

সমর-প্রাঙ্গণে মুহূর্ত্ত-কাল "তাথেই তাথেই" নৃত্য করিয়া হরির মা বাক্য-বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিল,—"অলো হোল্‌সা-মুখী! কটা-চুলী! উট্‌কপালী! চেরন্ দাঁতী! তোকে আমি ডরাবো না লো—আমি ডরাবো না। যারা তোর সোমত্ত বয়স্ দেখে ভয় খায় লো, তাদের কাছে তুই বাক্‌চাতুরী করিস্। সে দিন দত্ত-বাড়ী মার-খেয়ে তোর যে পিঠের চামড়া উঠে গেছলো-লো!—চুণে-হলুদ দিয়ে আরাম কল্লে কে-লো? এই, কথায় বলে,—

তিতাক তিতাক তিতাক লো!

তিন-কুড়ি-তিন তোর সোয়ামী লো!!

তাই হ'য়েচে তোর! তুই আবার কোন্ মুখে কথা ক'স্? ঝেঁটিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দিবো জানিস!

কুসুমকামিনী তখন ব্যাপার বড় গুরুতর বুঝিয়া, কালাচাঁদকে উদ্দেশ করিয়া বলিতে লাগিল,—দেখুন, মোশাই! আপনাদের মুখেই বুড়ী কত অকথা কুকথা বল্‌চে। আপনারা ওকে থাম্‌তে বলুন,—নহিলে আমার সঙ্গে ওর ভাল হবে না—এখনি একটা কাণ্ড বেধে যাবে।"

হরির মা মুখ ভেঙাইয়া, দাঁত বাহির করিয়া, তালে তালে নাচিতে নাচিতে কুসুমের দিকে অগ্রসর হইয়া,—বলিতে লাগিল, "অলো! মার্‌বি নাকি লো!—তোর গায়ে আজকাল বেশী বল্ বেঁধেচে লো,—বল্ বেঁধেচে!—তোর দলে লোক ঢের লো,—লোক ঢের হয়েচে!—মার্-না লো,—মার্-না,—কাঠের সখীর মত

দুই দাসীর দ্বন্দ্ব।



অমন দাঁড়িয়ে রইলি কেন? অলো! মেরে হাতের সুখ করে-নে লো—হাতের সুখ করে-নে!—এমন দিন তোর আর থাকবে-না লো—থাকবে না!”

হরির মা এই কথা বলিতে বলিতে ক্রমশ কুসুমকামিনীর নিকট-বর্ত্তিনী হইল। কুসুম, বেগতিক বুঝিয়া দুই চারি পা পশ্চাৎ হটিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

তখন হরির মায়ের বিক্রম আরও বাড়িল। মুখখানিকে অধিক-তর বিকৃত করিয়া খাটি বাঙখাই সুরে আরম্ভ করিল,—“যাস্ কোথা লো—ময়না! পিঠ যে পেতে দিয়েচি লো,—তুই যদি আজ আমাকে না মারিস, তবে তুই ভেয়ের মাথা খাস্।”

এই বলিয়া হরির মা, কুসুমের গায়ে পিঠ ঠেকাইয়া দিল।

ইত্যবসরে, পতিতপাবন, বিষম বিভ্রাট উপস্থিত দেখিয়া, হাঁ—হাঁ রব দৌড়িয়া গিয়া তাহাদের উভয়ের সংমিলিত অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিয়া মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন কুসুম বলিতেছেন,—“ঠাকুর্দ্দা! তুমি সরে যাও, পথ ছেড়ে দাও,—ও কেমন হরের মা—বেটা-খাগী!—ওকে আমি একবার বুঝবো। ওর মুখ দিয়ে রক্ত বার না ক'রে আজ জলগ্রহণ করবো না!”

এ দিকে হরির মা পতিতকে বলিতেছেন,—“তুমি সমুখে দাঁড়ালে কেন? সরো বলচি—ও নচ্ছারনী—ভাই-খাগী আমাকে একবার মারুক,—ওর গতরে তেজ কত,—মগজে ঘী কত,—আমি একবার দেখবো!—আরে মোর তুমি রে। যা-নয়-তাই ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি!”

প্রকৃতই এবার রণভূমের শোভা শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। দক্ষিণে কুসুমকামিনী, বামে হরির জননী,—মধ্যভাগে শ্রীপতিতপাবন।

একদিকে শেয়াকুল, অন্যদিকে বাব্‌লা,—মধ্যস্থলে খেজুর। এক-দিকে কুকুরী, অন্যদিকে শৃগালী,—মধ্যস্থলে বলীবর্দ্দ।

রণভূমির শোভা যতই বৃদ্ধি পায়, পতিতের অবস্থা ততই শোচনীয় দৃষ্ট হয়। রণ-রঙ্গিণী দুইটী মাতঙ্গিনী, পতিত-পেয়ারাবৃক্ষের দুইদিক্‌ হইতে দুইটী বাহু-শাখা লইয়া আকর্ষণ, বিকর্ষণ, সম্প্রকর্ষণ করিতেছেন। আর ঐ মাতঙ্গিনীদ্বয় যেন বৃংহিতধ্বনি করিয়া মুখে এই কথা বলিতেছেন, "একবার পথ ছাড়িয়া দাও, একবার পথ ছাড়িয়া দাও,—রণভূমে অদ্য রুধিরের নদী বহাইব।" পতিতপেয়ারা-বৃক্ষ দুইটী বাহু-শাখা লইয়া উভয়কেই আটক করিয়া থামাইতে-ছেন, "ক্রোধ সম্বরণ কর, ক্রোধ সম্বরণ কর,—রক্ষা কর রক্ষা কর।"

ক্রমে বাহু-শাখাদ্বয় দেহ-স্কন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল। ঘোররণে মাতঙ্গিনীদ্বয়ের বসনভূষণও শিথিল হইতে আরম্ভ হইল। রণসংঘর্ষণে কুসুমকামিনীর দক্ষিণ-হস্ত-স্থিত চুড়ি কতক ভাঙ্গিয়া ভূতলে পতিত হইল। অর্দ্ধ ভগ্নভাবে কতক চুড়ি হস্তে সংলগ্ন রহিল। সেই অর্দ্ধভগ্ন চুড়ির আঘাতে পতিতের কপাল দিয়া রুধির-ধারা নির্গত হইতে লাগিল। এইরূপে এই মহাসমরে ক্রমশঃ পতিতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইতে থাকিল। পরামাণিকের প্রাণ ওষ্ঠে আসিল।

কালাচাঁদ এখনও ধীরভাবে বসিয়া আছেন। সম্মুখে যে এরূপ প্রলয়-ঝড় বহিয়া যাইতেছে, তৎপ্রতি তাঁহার যেন দৃক্‌পাত নাই। বোধ হয় তিনি এখনও মনে মনে মহানন্দ উপভোগ করিতেছেন। কিন্তু ইহা কি আমোদ-কৌতুকের সময়? তিনটা লোক খুনোখুনি করিতেছে, ইহা দেখিয়া কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? কালাচাঁদের এখন মজা দেখাটা—উচিত হইয়াছে কি?

উচিত হউক, আর অনুচিতই হউক—কালাচাঁদ মোদা মজাই দেখিতে লাগিলেন। ওদিকে সমর-রঙ্গ-ভঙ্গ ক্রমশঃই চরম মাত্রায় উঠিতে চলিল। কুসুমের কবরী খসিল, চুল এলাইয়া পড়িল, টীপ মুছিয়া গেল,—অধিক আর কি বলিব, অঙ্গের বসনও বিধ্বস্ত হইল।

এদিকে হরির মাতা, বক্ষস্থল অনাবৃত করিয়া সজোরে স্বয়ং তদুপরি চপেটাঘাত করিতে লাগিলেন। সেই চটাচট্, পটাপট্, সটাসট্ শব্দে পল্লী প্রকাম্পিত হইল। আর তিনি তদুপলক্ষে মুখে বুলি ধরিলেন,—"অলো কুসমী-লো—মার্-না—মার্-না— মার্-না-লো!—তুই যদি না মারিস, তুই ঝেয়ের মাথা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাস্ লো।" হরির মাতার তখন গলা ভাঙ্গিয়াছে,—কণ্ঠস্বর স্পষ্ট-রূপে উচ্চারিত হইতেছে না।

আর সে-দিকে,—অর্থাৎ পতিতপাবনের দিকে যাহা ঘটিল, তাহা আর বলিবার উপযুক্ত নহে। সে এক বিতিকিচ্ছি বীভৎস ব্যাপার! কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়, চক্ষু মুদ্রিত করিতে হয়, নাসা-রন্ধ্র রুদ্ধ করিতে হয়। সমর-সংঘর্ষণে শ্রীলশ্রীযুক্ত পতিতপাবন পরামাণিক মহাশয়ের কোমরের কাপড় খুলিয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল। সেই সঙ্গে পতিতও ভূমিতে পড়িয়া লুটাইতে লাগিলেন। কুসুমকামিনী অমনি বেগে সে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। হরির মাতাও কুসুমের সম্মুখীন হইবার আশায় সে গৃহ পরিত্যাগের উদ্-যোগ করিলেন।

তখন কালাচাঁদ দৌড়িয়া গিয়া হরির মাকে আটকাইলেন; আর তাহাকে ঘরের বাহির হইতে দিলেন না। মুরুব্বি-আনা-ভাবে বুড়ীকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন—"যাঃ বুড়ী বেটি! ঐ ঘরের ভিতর ব'স্‌গে যা! আর ঝগড়া করে না।"

বৃদ্ধাকে ঠেলিয়া দিয়া, কালাচাঁদ বাহির হইয়া ঘরে শিকল দিয়া রাখিলেন। সম্মুখে কুসুমকে দেখিয়া তিনি মধুর-গম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"কেন মা! আর, বিবাদ কর? দেখ্‌চো ত ঐ বুড়ী ভারি দুষ্ট!—তুমি ঘরে যাও।"

কুসুম তখন কাঁদ-কাঁদস্বরে বলিল, "আপনি মোশাই! ভদ্র লোক! এর বিচার করুন,—আমার কোন দোষ আছে কি না?"

কালাচাঁদ কহিলেন,—"না।"

কুসুম তখন হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিল,—বলিল, "ঐ বুড়ী কি না দশজনের সাক্ষাতে আমার ভাই-কেটে গাল দেয়! নাপিত-ঠাকুদ্দা আমাকে কি না ডেকে এনে এই অপমান কল্লেন?"

কালাচাঁদ। মা! তুমি আর কেঁদো না— ঘরে যাও।

কুসুমকামিনী তখন সর্ব্বরকমে পরম আপ্যায়িত হইয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, গালি দিতে দিতে, গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল।

বলা বাহুল্য, হরির মাতাই ঝী-রূপে কালাচাঁদের গৃহে রহিল। পতিতপাবন অবশ্যই কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইল; তবে মুখ ফুটিয়া কালাচাঁদকে কোন কথা বলিতে পারিল না।

নবম পরিচ্ছেদ।

প্রথম চেষ্টা বিফল হইল। তার পর দ্বিতীয় চেষ্টা। কালাচাঁদের গঙ্গাস্নান যাইবার পথে, কয়েক ঘর বেশ্যার বাস ছিল। পতিতের শিক্ষামত বারাঙ্গনাগণ কালাচাঁদকে দেখিয়া মুচকি হাসিত, ইশারা-ইঙ্গিত করিত, কখন বা স্পষ্ট ত বলিত, "আসুন্ না মোশাই!—এক ছিলিম তামাক খেয়ে যাবেন!" কালাচাঁদ ঈষৎ হাসিয়াই সে কথা উড়াইয়া দিতেন।

একবার পতিতের ষড়যন্ত্রে বার জন বিলাসিনী গঙ্গার ঘাটে কালাচাঁদকে ঘেরাও করিয়াছিল। কালাচাঁদ বিব্রত হইয়া বলিলেন, "আমাকে পথ ছাড়িয়া দাও।" প্রধানা বেশ্যা উত্তর দিল,—"যদি কথা রাখো তবে পথ ছাড়িব।"

কালাচাঁদ। আমার সঙ্গে তোমাদের আবার কি কথা?

প্রধানা। কোন গূঢ় কথা না থাকিলে কি আর আমরা তোমার শরণ নিতে এসেচি?

কালাচাঁদ মনে মনে ভাবিলেন, "বাবা! বেশ্যাগুলা বলে কি?—আমার আবার শরণ নিতে চায়!"

প্রধানা। কথাটী রাখবে ব'লো—তা' হলে বলি। নহিলে বেণাবনে মুক্তা ছড়িয়ে লাভ কি?

কালাচাঁদ। কি কথাটাই আগে বল না কেন? রাখারাখির কথা পরে হবে।

প্রধানা। (হাসিয়া) তা হবে না,—আমাদের এক একটী কথার দামই লাখ টাকা। কথাটী শুনে নিয়ে শেষে তুমি ফাঁকি

দিয়ে চলে যাও—আর, আমরা ফ্যাল্‌-ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে থাকি আর কি? বাঃ বাঃ মজা বেশ! আগে তুমি গঙ্গাসাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বীকার কর যে, নিশ্চয় আমাদের কথা রক্ষা করিবে,—তবে ত আমরা সে কথা বলিব।

কালাচাঁদ। আমি এত সাত-সতের কাণ্ড করিতে, প্রতিজ্ঞা করিতে গঙ্গাজলি করিতে পারিব না। তোমাদের ইচ্ছা না হয়;—সে কথা আমাকে বলিয়া কাজ নাই। তার পর, তোমারাও ঘরে যাও, আমিও ঘরে যাই। স্নান ক'রে ভিজে কাপড়ে এমনভাবে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিব?

প্রধানা। কাপড় তোমার ভিজেই হউক, শুকনাই হউক,—পথ আমরা কিছুতেই ছাড়িতেছি না। আমরা এই তোমাকে ঘেরিয়া রহিলাম,—তোমার শক্তি থাকে আমাদিগকে ভেদ করিয়া যাও।

কালাচাঁদ মনে করিলেন, "এ পর্য্যন্ত এমন বিপদে ত কখনও পড়ি নাই। এমন অঘটন ঘটনাও ত কখন দেখি নাই। হুগলীটা বড়ই বিশ্রী সহর। এখানে মেয়ে মানুষে পুরুষের মাথায় চ'ড়ে বেড়ায়!—এই মেয়েগুলাকে ঠেলিয়া-ঠুলিয়া ভেদ করিয়াই বা যাই কিরূপে? যদি একটা মেয়েকে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া যাইতে চাই, -আর যদি বাকী এগারটা মেয়ে আমার ঘাড়ে পড়িয়া আমাকে আটকাইবার চেষ্টা করে,—তখন ত একটা বিপরীত-ব্যাপার ঘটিয়া উঠিবে। মেয়েগুলার সঙ্গে ধরাধরি, হুটাপাটি, পাছড়া-পাছড়ি, বাধিয়া যাইবে। হয় ত আমার দারুণ আঘাতে কোন মেয়েটার হাত ভাঙ্গিবে, নাক দিয়া মুখ দিয়া রক্ত পড়িবে, কাহারও বা চুল এলাইয়া ছিন্নভিন্ন হইবে,—এমন কি, কেহ বা

কালাচাঁদের রসগোল্লাভক্ষণ



বিশ্বস্তাও হইতে পারে। এখন, এই বেশ্যাগুলার নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় কি?—আচ্ছা ইহাদের সেই গূঢ় কথাটাই কি,—তাহা শুনা যাক্ না কেন?—তার পর যা হয় হ'বে। প্রথমত একটা কৌশল করা যাক্।"

এই ভাবিয়া কালাচাঁদ বলিলেন, "আচ্ছা, আমি তোমাদের কথা রাখিব,—প্রতিজ্ঞা করিতেছি। কিন্তু তোমাদিগকেও আমার নিকট এক সত্য করিতে হইবে—"

প্রধানা। আমরা সকলেই রাজী আছি। তোমার কথা শুন্‌বো—এ কোন্ বড় কথা? তুমি হ'লে আজ আমাদের ইষ্ট-দেবতা!—তুমি যা বলিবে, তাই করিব।

কালাচাঁদ। এইবার তবে তোমাদের সেই গূঢ় কথা বল।

প্রধানা। অদ্য রাস-পূর্ণিমা। আমরা একটী কৃষ্ণের অনুসন্ধান করিতেছিলাম। তোমাকে সেই পদে বরণ করিলাম। অদ্য রাসলীলায় তোমাকে শ্রীকৃষ্ণ সাজিতে হইবে।

কালাচাঁদের শরীর দিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। বাজারের বেশ্যাগুলা বলে কি? ইহাদের এত সাহস বাড়িল কিসে? আমার সঙ্গে আলাপ নাই, চাক্ষুষ কথাবার্ত্তা নাই, পরিচয় নাই, ইহারা পথে যাইতে আমাকে দেখে এই মাত্র—তথাচ ইহাদের এত আস্পর্দ্ধা হইল কিরূপে? অবশ্যই ইহারা কাহারও নিকট হইতে সাহস পাইয়া, আমাকে এরূপ-ভাবে বেষ্টন করিয়াছে। বোধ হয়, বন্ধু পতিতপাবনেরই এই কাজ। যাহাই হউক,—উদ্ধারের এখন উপায় কি? ইহারা যদি বারজন স্ত্রীলোক না হইয়া, বারজন মল্ল-বেশধারী অস্ত্রশস্ত্রে ভূষিত দস্যু হইত,—তাহা হইলে আমি এত ভয় করিতাম না।—এত কেন, ইহার সিকির সিকি ভয়ও করি-

তাম না। এখন মেয়ে-মানুষের গায়ে হাত তুলিব কেমন করিয়া? —শুধু হাত তোলা নয়,—প্রকৃত-প্রস্তাবে মল্ল যুদ্ধ আরম্ভ করিতে হইবে। তাহাই বা কেমন করিয়া করি? বিষম লেঠা দেখিতেছি। যা'হোক, এখন কথা কাটাকাটিই খানিক চলুক,—ভবিষ্যতে অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই ঘটিবে।

তখন কালাচাঁদ ধীরভাবে বেশ্যাগণকে বলিলেন, "আমি আমার প্রতিজ্ঞামত নিশ্চয়ই কৃষ্ণ সাজিতেছি। কিন্তু তোমরা এখন তোমাদের সত্য রক্ষা কর।"

প্রধানা। প্রভুর যা আজ্ঞা হয়, এ দাসীগণ এখনি তাই করিতে সম্মত।

কালাচাঁদ। আমার কথা এই, 'তোমরা পথ ছাড়িয়া দাও, আমি ঘর যাইব।'

তখন বেশ্যামণ্ডলী হইতে একটা কল-কল হল-হল ধ্বনি উত্থিত হইল। কিন্তু প্রধানা নায়িকা, সকলকে থামাইয়া কালাচাঁদের উদ্দেশে যোড়হাতে বলিল, "তুমি কি ফাঁকি দিয়ে পলাবে হে শ্যাম?—তুমি কি চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে যাবে হে?—তা'ত হবে না — পালা'তেত দিব না! আমরা প্রেমডোরে বেঁধে তোমায়, হৃদি-কারাগারে রাখব বার মাস।"

এ কথা শুনিয়া কালাচাঁদের পায়ের নখের মুড়ি হইতে মাথার চুলের ডগ পর্য্যন্ত একেবারে তেলে বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল। তিনি একটা বিভীষণ হুঙ্কার ছাড়িয়া উর্দ্ধে যেন দশহাত লাফাইয়া উঠিলেন।

তার পর কি ঘটনা ঘটিল, তাহার প্রকৃত ইতিহাস নাই। পতিত বলেন,—"কালাচাঁদ কয়েক জন বেশ্যা দেখিয়া, ভ‍ে গঙ্গা-

জলে ঝাঁপ দিয়া পড়েন,—শেষে সাঁতার কাটিয়া, গঙ্গা পার হইয়া গরিফায় গিয়া আশ্রয় লন।” কালাচাঁদ বলেন, “আমি লাফাইয়া বীর-পুরুষের ন্যায় চলিয়া আসি,—বেশ্যারা আমার গামছা-খানি ধরে,—তা, গামছা-খানি তাহাদের হাতেই থাকিয়া যায়।” সে যাহা হউক—এ প্রসঙ্গ লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে।

পতিতপাবনের সব আশাই অন্তর্হিত হইল। কালাচাঁদ, কামিনীর মোহিনী মায়ায় ভুলিলেন না, কাম-ফাঁদে পড়িলেন না। পতিতের দুঃখের অবধি রহিল না!

দশম পরিচ্ছেদ।

কারাবাসের পূর্ব্বে, কালাচাঁদ মদ, ভাঙ্গ, গাঁজা, আফিং, চরস, চণ্ডু, সিদ্ধি, তামাক—সব কয়টা নেশাই যথানিয়মে করিয়াছিলেন। তবে সুবিধার মধ্যে এই ছিল,—তিনি কোন নেশারই অধীন হইয়া পড়েন নাই। যখন যে মাদক-দ্রব্যটা সম্মুখে পাইতেন, তখন তাহাই সেবন করিতেন। দশদিন কোন নেশা করিতে পারিলেন না,—তাহাতেও ভ্রূক্ষেপ নাই। তামাকটা কিন্তু প্রায় অষ্ট-প্রহরই আবশ্যক হইত।

কারাগারেও কালাচাঁদের কিছু-কিছু নেশার কার্য্য চলিয়াছিল। কারামুক্তির পর কালাচাঁদ সব নেশাই একেকালে ছাড়িয়া ছিলেন; —কেবল কয়েক দিনমাত্র গাঁজা এক-আধ-ছিলিম খাইতেন। শেষে তাহাও তিনি পরিত্যাগ করিলেন। রহিল কেবল, গুড়ুক-তামাক,—সেটা বেস সঙ্গের সাথী।

কালাচাঁদের গাঁজা-ত্যাগের কথা শুনিয়া, পতিতপাবনের ডাক-ছাড়িয়া কান্না পাইল! শতপুত্রের শোক পণ্ডিত ভুলিতে পারে,—কিন্তু কালাচাঁদের গাঁজাত্যাগের কথা ভুলিবার নহে। হে গাঁজে! তুমি ত্বরিতানন্দ! তোমার মহিমায় মুহূর্ত্তমধ্যে করতলে স্বর্গ পাই! তুমি আছ বলিয়াই, এ-সংসার, মরুভূমি হইয়াও, ফুল্লকমলদলপূর্ণ কেলিকুঞ্জবন। তোমার সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় পাইয়া, পথশ্রান্ত পথিক সর্ব্বকষ্ট ভুলিয়া যায়। তোমার সাহায্যে, ব্যোমযান-ব্যতীত আকাশপথে উড়িতে পারি। তোমারই সাহায্যে, বাষ্পীয়-শকট-ব্যতীতও, অল্পসময় মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ-ভ্রমণে সর্ব্বতোভাবে সক্ষম। তুমি যখন দেহে বাস কর, তখন ক্ষুধা থাকে না, তৃষ্ণা থাকে না, বাসনা থাকে না;—শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-পুরুষের ন্যায়, আত্মারাম হইয়া কেবল এক অক্ষয়, অদ্বিতীয়, অনির্ব্বচনীয় পরমানন্দ উপভোগ করি। তখন কেবল মনে হয়,—

আমি কার, কে আমার
কারে ভাবিরে আপন।

এ-হেন গঞ্জিকা-বিহনে পরামাণিকের কান্নাই ত আসিতে পারে। কান্না ত সামান্য কথা,—নিদারুণ-যন্ত্রণায় পতিতের দেহ যে, চৌষট্টি-খণ্ডে বিভক্ত হয় নাই,—ইহাই আশ্চর্য্য। পতিত, প্রকৃত বীরপুরুষ বলিয়াই, এ দুরন্ত দৈব-বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; অন্য কোন সামান্য মানব হইলে, সেই দিনই তাহার অপমৃত্যু ঘটিত।

অভিমান ভরে পতিত গোটা একদিন-কাল কালাচাঁদের সহিত কথা কহে নাই। কিন্তু কালাচাঁদ যে, পরামাণিকের প্রাণের বন্ধু;—কথা না কহিয়া কতক্ষণ তিষ্ঠিবে?

পরদিন প্রাতে তামাক খাইতে খাইতে পণ্ডিত খুব গম্ভীর স্বরে কালাচাঁদকে বলিল ;—"বন্ধু! তুমি কাজটা ভাল কর নাই! বড়ই কু-কাজ হইয়াছে।"

কালাচাঁদ ব্যাপার তত তলাইয়া বুঝেন নাই—একটু চমকাইয়া উঠিলেন ; বলিলেন,—"এঁ,—আমি এমন কি খারাপ কাজ করিয়াছি ?—কিছুই ত মনে হয় না !!"

পণ্ডিত। আমি একা নই,—পাড়ার সকলেই বলিতেছে,—অতি মন্দ কাজ হইয়াছে। আমার নিজের জন্য বলি নাই ;—বন্ধু! তোমার ভবিষ্যৎ ভাবিয়াই বলিতেছি।

কালাচাঁদ। বলই-না শুনি, মন্দ কাজটা কি!

পণ্ডিত। এই, এখানকার জল একরকম,—সেখানকার জল একরকম ;—এখানকার খাওয়া একরকম, সেখানকার খাওয়া একরকম! তা, সহ্য হবে কেন? শেষে একটা ঘোরতর কাণ্ড উপস্থিত হবে দেখ্‌ছি!

কালাচাঁদ। অত ভূমিকায় কাজ কি?—খুলেই বল না,—কি হয়েচে?

পণ্ডিত। তোমাকে আর সে সব কথা ব'লেই বা কি হবে?—তুমি কি বুঝালে, বুঝ যে,—বুঝাব? এখন এক দিন-কাল ছিল,—পণ্ডিত যা বল্‌তো, তাই হ'তো। এখন পণ্ডিতকে মানে কে? পণ্ডিতের কথা শুনে কে? বন্ধু! তোমারই ভালোর জন্য বলি। এতে আমার কিছু স্বার্থ নাই!

কালাচাঁদ। আঃ,—কি তোমার কথা আছে, সোজা-সুজি বল্‌বে ত বল!—নহিলে আমি এখনি উঠে চল্লেম, ধান্‌ভান্‌তে আমি এত শিবের গীত শুন্‌তে পারি না।

পতিত। তা, পতিতের কথা এখন শিবের গীত হবে বৈ কি? পতিতকে এখন বেঙেও লাথি মেরে যায়! কিন্তু পতিত যা বলে, তাই ফলে। পতিত ব'লেছিল, বাঁড়ুয্যেদের নারকেল গাছে বাজ্ পড়্‌বে, তা, এক মাস সইলো না, গাছে বাজ্ পড়্‌লো!

কালাচাঁদ মনে মনে হাসিলেন। বাহ্যিক গম্ভীরভাব দেখাইয়া, মিষ্ট বাক্যে কহিলেন,—"বন্ধু! তুমি রাগ কর কেন? আমি তোমার কোন্ কথা শুনি নাই?—তুমি কোন একটা কথা বলিলে, তাহা কি আমি না শুনিতে পারি?"

পতিতের মন একটু প্রসন্ন হইল। বলিল,—"তোমাকে আমি পর ভাবি না। বন্ধু! তোমার উপর কেমন যে একটা ঝোঁক্ পড়েচে, তা, তোমার 'ভালই' আমাকে আট-পহরই ভাব্‌তে হয়। এই হুগলী-সহরটী এক পক্ষে বেশ ভাল হ'লেও, অন্য পক্ষে বড় খারাপ! বন্ধু! দেখ্‌চো না, এখানে অধিকাংশ লোকেরই পায়ে গোদ, গলায় গরগণ্ড, হাতে ফুলো! কেন এমন হয়?—এখানকার জলে একটা দোষ আছে।"

কালাচাঁদ। জলে দোষ থাকলে ত, আমার এতদিন গোদ, গরগণ্ড—সবই হ'তো। বন্ধু! তুমি জানো ত,—দু-ঘণ্টার কম আমার স্নান হয় না—অন্ততঃ এক-শ ডুবের কম আমার তৃপ্তি হয় না,—ডুব-সাঁতার-কেটে অন্ততঃ একবার মাঝ-গঙ্গায় না গেলে আমার পূর্ণ-স্নান হয় না'—এ সবই ত তুমি জানো;—তবে কেন তুমি বলচো,—এখানকার জলে দোষ আছে? জলে যদি কোন দোষ থাকতো, তা হ'লে আমি আর এতদিন বাঁচতাম না।

পতিতপাবন এইবার তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের ন্যায় ওস্তাদিধরণে খুব

খানিক হাসিয়া বলিল,—“বন্ধু! তুমি এতদিন ভাল ছিলে বটে, কিন্তু এখন তুমি আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছ।”

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) আমার ঘরে কুড়ুলই নাই,—তা, আবার পায়ে চোটাব কেমন ক’রে?

পণ্ডিত। বন্ধু! আমি তোমাকে তামাসা কর্‌চি না,—

কালাচাঁদ। তা, আমি কি দোষটা করেছি,—চোক-কাণ বুজে বুজে তাই ব’লেই ফেল না কেন?

পণ্ডিত। আচ্ছা, একটা কথা আগে তুমি বল;—এ দুদিন তোমার খিদে হচ্চে কেমন? প্রাতে চোঁয়া ঢেঁকুর মারে কি না? সন্ধ্যার পর হাই উঠে কিনা? শরীরটা কেমন ঝিম্‌-ঝিম্‌ করে কিনা?

কালাচাঁদ এইবার পণ্ডিতের মনোগত অভিপ্রায় বুঝিয়া, মনে-মনে অনন্ত-হাসি হাসিয়া, উদর পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। খানিক হাসি, উদর উপ্‌ছাইয়া, মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

কালাচাঁদ উত্তর দিলেন, “এ দুদিন ক্ষুধা কম হওয়া দূরে যাউক, বরং বৃদ্ধিই রাখিয়াছে। বেলা দুইপ্রহরে ভাত খাইলাম,—আবার দুইটা না-বাজিতে-বাজিতেই ক্ষুধার আরম্ভ। শেষ-রাত্রে উঠিয়া আবার ক্ষুধা। “হাই”—কখন্‌ উঠে তা’ত কিছুই জানি না।—

পণ্ডিত। পিদিমটা নিবিবার পূর্ব্বে একবার খুব জ্বলে উঠে বটে!—ওটা খিদে নয়—দৃষ্টি-খিদে!—আর দু-চার দিন বাদে, বন্ধু! তুমি আমার কথা জান্‌তে পার্‌বে!

কালাচাঁদ। দু-চারি দিন পরে আমার কি রোগ হবে,—তা, আমি এখন থেকে কেমন ক’রে জান্‌বো—

পতিত। জান্‌তে হয়!—সংসারে থাক্‌তে হ'লেই, জান্‌তে হয়;—

কালাচাঁদ। আমিত কিছু জান্‌তে-টান্‌তে পার্‌চি না,—তুমি কিছু জেনে থাক,—বলে দাও।

পতিত। বলাবলিই আর কি আছে?—তুমি ত কারু কথা শুন্‌বে না—বলেই বা কি ফল আছে? তবে তোমার কষ্ট দেখ্‌তে পারি না—তাই ব'ল্‌তে হয়।

দুঃখমিশ্রিত ক্রোধভরে পতিতপাবনের অবস্থান।

কালাচাঁদ। বন্ধু! তুমি বলো,—বলো!

পতিত। এই, ওরুণ্ড থেকে তুমি একেবারে তামাক খাওয়াটা উঠিয়ে দিলে!—তা, আমি একজন ঘরে রয়েচি আমাকে ত একবার জিজ্ঞেস্ কর্‌লেও হতো! আমি দেখ্‌চি;—তুমি আপন মনে কাজ কর্‌চো—আমি সে সময় বাধা দিব কেন?—আমি মজা দেখ্‌চি,—এখন ও কর্‌চে করুক;—এই দু-দিন পরে, শেষে আমার কাছে গুঁড়িয়ে আস্‌তে হ'বে। তখন পতিতকে না-হলে কারু চল্‌বে না! তবে কি না,—বন্ধু! তোমার সঙ্গে আমার বড়ই ভালবাসাটা হয়েচে,—তাই এ কথা আজ না ব'লে থাক্‌তে পার্‌লাম না।

হাস্যরস-ময় কালাচাঁদ দেশ-কাল-পাত্র বুঝিয়া বলিলেন,—"বন্ধু! আমি কি সাধ ক'রে 'বড়-তামাক্‌'টা একবারে ছেড়ে দিয়েচি? এর ভিতর অনেক গোপনীয় কথা আছে। আমার বিছানার উপ'র একদিন একটা জবাফুল পড়েছিল, তাহা কি তুমি দেখেছিলে?"

পতিত। দেখি নাই,—ঝীয়ের মুখে শুনেছিলাম বটে।

কালাচাঁদ তখন কথার সুর নরম করিলেন,—বলিলেন, "সে'ত ফুল নয়,—মা কালীর অনুগ্রহ।"

কালাচাঁদ আর কথা না কহিয়া, পতিতের কাণে কাণে কি কথা বলিলেন।

পতিত শিহরিয়া উঠিল। তাহার নয়নদ্বয় বিস্তৃত হইল। মুখটা 'হাঁ' হইয়া গেল। পতিত বলিল, "বল কি বন্ধু! বল কি?"

কালাচাঁদ। এর সবটাই সত্য। তাই 'তামাক' ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম!

পতিত প্রকৃতিস্থ হইয়া, খানিক ভাবিয়া বলিল, "মা-কালীর আজ্ঞে, অবিশ্যি লঙ্ঘন করিতে নেই;—কিন্তু কথক-ঠাকুর সে-দিন বলেছিলেন, শরীরটে আগে, ধর্ম্মটা পরে।"

কালাচাঁদ। কি করবো বল, বন্ধু!—শরীর রক্ষা করিতে গেলে, মা-কালীর আজ্ঞে লঙ্ঘন করিতে হয়। কাজেই তামাকটা ত্যাগ করিতে হইল।

পতিত আর কোন কথা কহিল না। ত্বরায় তথা হইতে উঠিয়া গেল। ঘরেও আর তিষ্টিল না! 'ভাঁড়' বগলে করিয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়িল। আপন-মনে যদৃচ্ছাক্রমে যাইতে যাইতে বোধ হয় এই ভাবিল,—"কালাচাঁদ ত গাঁজাটা ছাড়িয়া দিল। এর পর যদি মাছটা ছাড়িয়া দেয়, তাহা হইলে এ সংসারে থাকাই বৃথা!"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

রমণী এবং গঞ্জিকা উভয়ই কালাচাঁদ-কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল,—তথাচ পতিপাবন ক্ষান্ত নাই। কালাচাঁদ কিসে মদিরা-সুধায় আসক্ত হন,—তাহাই তখন তাহার ভাবনার বিষয় হইল। কালাচাঁদের যদি কোন দিন সর্দ্দি করে, পতিত উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" গ্রীষ্মে যদি কালাচাঁদের ঘাম ঝরে পতিত উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" বসন্তে যদি মলয়বায়ু বহে, পতিত উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও" যে দিন আমোদ-প্রমোদ সঙ্গীত হয়, সে দিন পতিত উপদেশ দেয়, "বন্ধু! একটু মদ খাও।" যে দিন কোন কারণে শোক-দুঃখ ঘটে, সে দিনও পতিত উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" যে দিন বর্ষা-বাদলে বাটীতে চাল কড়াই-ভাজা হয়, পতিত সে দিনও উপদেশ দেয়,—"বন্ধু! একটু মদ খাও।" কালাচাঁদ কিন্তু কিছুতেই মদ খাইলেন না।

পতিত এক এক দিন, কালাচাঁদের সম্মুখে, অন্যের সহিত, সুরা-বিষয়ে বিচার করিতে বসিত। পতিত বলিত,—"মদে কোন দোষ নাই, তবে অধিক মাত্রায় খাইলেই দোষ। মদ মহৌষধ-স্বরূপ। জ্বর-বিকার হইয়াছে,—ঔষধ মদ। পাঁচক্রোশ পথ চলিয়া পা-দুটী অসাড় হইয়াছে;—ঔষধ মদ। কেহ পড়িয়া গিয়া হাত ভাঙ্গিয়াছে,—ঔষধ মদ। মদ অতি মূল্যবান্ সামগ্রী,—উহা যেরূপ উচ্চ-অঙ্গের জিনিস, তাহাতে উহার দাম আরও অধিক হওয়া উচিত। তবে মাত্রা অধিক হইলে, মদে দোষ ঘটে। তা,

মাত্রা অধিক হইলে, কোন্ জিনিসটায় দোষ না ঘটে? সন্দেশ অতি উপাদেয় বস্তু। খুব বেশী খাও, পেট কাঁপিবে,—আরও খুব বেশী খাও, পেট ফাটিয়া যাইবে। সেইরূপ মদে কোন দোষ নাই, মাত্রায় কেবল দোষ আছে। মদে কোন দোষ নাইই, অধিকন্তু মদ সুপবিত্র। মদ দেবতার ভোগে লাগে। মদ মা-কালীর প্রসাদ! মদ যদি অপবিত্র অশুদ্ধ, হেয় দ্রব্য হইত, তাহা হইলে মা-কালী উহা তাঁহার পানীয় বলিয়া গ্রহণ করিবেন কেন? সুতরাং যে দিক্ দিয়াই দেখ, মদে কোন দোষ নাই।"

এত বিচার-বিতর্ক শুনিয়াও, কালাচাঁদ মদ ধরিলেন না। পতিতের দুর্ভাবনার সীমা রহিল না। পতিতের ইচ্ছা হইল, কালাচাঁদের যদি একবার জ্বর-বিকার হয়, তাহা হইলে উহাকে মনের সাধে মদ খাওয়াই। কিন্তু জ্বর-বিকারত কাহারও হাত-ধরা নয়! পতিত ভাবিল, কালাচাঁদ যদি একবার দড়াম্ করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া যায়,—হাতে-পায়ে-গায়ে খুব ব্যথা লাগে,—তাহা হইলে বন্ধুকে মদ খাওয়াইবার খুব সুবিধা হইবে। তখন আর কাহারও কথা শুনিব না,—একেবারে জোর করিয়া মুখে মদ ঢালিয়া দিব। কিন্তু কালাচাঁদ পড়েন কিরূপে?

ভাবিতে ভাবিতে পতিতের মনোমধ্যে এক সুযুক্তির কথা উদিত হইল।—"কালাচাঁদ খুব ভোরে উঠিয়া বেড়াইতে যায়। আমি খানিক তেল ফেলিয়া পৈঁঠা পিছল করিয়া রাখি। যাই সে, পৈঁঠায় পা-টী বাড়াইয়া দিবে, অমনি চীৎপাত হইয়া পড়িয়া যাইবে।"

এইরূপ কল্পনা করিয়া, পতিত একসের সরিষার তৈল কিনিয়া আনিল। রাত্রি তৃতীয় প্রহরে উঠিয়া পৈঁঠায় আচ্ছা করিয়া তেল

ঢালিয়া দিল। স্বয়ং পণ্ডিত, কালাচাঁদের পতন দেখিবার জন্য, জানেলায় মুখটী দিয়া, জাগিয়া বসিয়া রহিল।

কালাচাঁদ প্রভাতে যথানিয়মে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। যথানিয়মে দুপ্ করিয়া দোয়ার হইতে উঠানে লাফাইয়া পড়িলেন। কালাচাঁদ প্রাতে অন্যের অগোচরে, প্রায়ই লাফ মারিয়াই ভূমিতে অবতরণ করেন। এ সংবাদ পণ্ডিত জানিত না। তাই সে, পৈঁঠায় ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু কালাচাঁদের লম্ফে, "দুপ্" ইত্যাকার শব্দ হওয়ায়, পণ্ডিত নিশ্চয় করিল, বন্ধু অবশ্যই পড়িয়াছে।

তখন পণ্ডিত আস্তে-ব্যস্তে এইরূপ হাঁকাহাঁকি করিতে করিতে দৌড়িল,—"কি হে বন্ধু! কি হে বন্ধু—প'ড়ে গেলে না-কি? আহা-হাঃ—ভারি লেগেচে, ভারি লেগেচে!"

পণ্ডিতের অদ্য হঠাৎ এই কাণ্ড দেখিয়া কালাচাঁদ কিছু চমকিত হইলেন। প্রথমত তিনি কোন কথা কহিলেন না।

পণ্ডিত স্থির করিলেন,—বন্ধু তবে পড়িয়া মূর্চ্ছা গিয়াছে;—তাই কথা কহিতেছে না।

পণ্ডিত উচ্চরবে মূর্চ্ছিত বন্ধুকে সম্বোধন করিয়া আপ্যায়িত করিলেন,—"যাচ্চি, বন্ধু!—যাচ্চি!—কোন ভয় নেই। আমি একেবারে বড় ঔষধের যোগাড় ক'রে নিয়ে যাচ্চি। একটু থামো,—বন্ধু! এই তাকে একপোয়া মায়ের প্রসাদ আছে,—তাই নিয়ে যেয়ে খাওয়ালে, তবে তোমার মূর্চ্ছা ভাঙ্গবে!"

এখনও কালাচাঁদের কথা নাই। তিনি স্থির-বুদ্ধিতে ভাবিতে লাগিলেন,—"আজিকার কাণ্ডখানা কি? প্রিয় বন্ধুটী আজ এমন করে কেন?" কালীমায়ের প্রসাদের কথা শুনিয়া তাঁহার কতক

চমক ভাঙ্গিল। "তবে কি পতিত আজ রাত্রি জাগিয়া আমার পতন প্রতীক্ষা করিতেছিল? 'পড়িলেই গায়ে ব্যথা!—অতএব মদ খাও!—বন্ধু ত এইরূপ কৌশল-জাল পাতে নাই। আমার পড়িবার জন্য পতিত ত কোনরূপ কল-কৌশল করে নাই?—ঐ পৈঁঠায় জল কেন? প'কা কলার ছোবা কেন? কলাপাতার নীচে মটরকলা কেন? উহা ত জল নয়!—তেল যে!"

কালাচাঁদের মুখে আর হাসি ধরে না। পতিত যখন তক্তু হইতে মায়ের প্রসাদ গ্রহণ-কার্য্যে ব্যস্ত ছিল,—কালাচাঁদ তখন—সেই অবকাশে,—নিঃশব্দে দীর্ঘ-দীর্ঘ পা ফেলিয়া, বাটীর বাহির হইয়া পড়িলেন। দ্রুতপদে একেবারে পাড়া ছাড়াইয়া, গঙ্গার ধার ধরিয়া, চুঁচুড়ায় গিয়া উপনীত হইলেন।

এ দিকে পতিত-পাবন ঔষধ-পত্র লইয়া আসিয়া দেখে,—রোগী নাই। পতিত ত চিন্তাযুক্ত হইল। রোগী পলাইল কোথা? এই ভোরবেলা মূর্চ্ছিত কালাচাঁদকে 'নিশিতে' ডাকিয়া লইয়া যায় নাই ত? ঘরে বসিয়া থাকা উচিত নহে,—বন্ধুকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। পতিতও চাদর কাঁধে ফেলিয়া, বগলে গামছা-ঢাকা মহৌষধ লইয়া, বন্ধু-অন্বেষণে বহির্গত হইল। পথে যাহাকে পায়, তাহাকেই জিজ্ঞাসে,—"কেহ কি আমার বন্ধুকে দেখেচো।" অনেকে বলিল, "কালাচাঁদকে এই পথেই যাইতে দেখিয়াছি!" বেলা নয়টা পর্য্যন্ত পতিত সমস্ত হুগলীসহরটা ঘুরিয়া-ঘুরিয়া, বন্ধুকে না পাইয়া, শুষ্কমুখে ঘরে ফিরিয়া আসিল। আসিয়াই দেখিল, কালাচাঁদ স্বয়ং একটা দশসের রুইমাছ কুটিতেছেন। পতিত দেখিয়াই, চমকিয়া উঠিয়া ভাবিল,—"ভূত নাকি?"

কালাচাঁদ ফূর্ত্তির সহিত হাস্যমুখে পতিতকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বন্ধু! আজ কালিয়ে-পোলাও হবে! পূজারি-ঠাকুর এসে রাঁধবেন ব'লেচেন। আজ দেখবো,—তুমি কত খেতে পারো!"

কালাচাঁদকে ব্যথা-শূন্য এবং অক্ষতদেহ দেখিয়া,—প্রফুল্লমনে মৎস্য-কর্ত্তন-কার্য্যে ব্যাপৃত দেখিয়া পতিতের প্রকৃতই রাগ হইল। বলিল,—"আমাকে না ব'লে, না কয়ে,—আজই তুমি এত বড় মাছটা কিনলে কেন? আজ রবিবার—আজ কি মাছ খেতে আছে?"

কালাচাঁদ। আজ রবি নয়,—সোমবার।

পতিত। আচ্ছা, না হয় সোমবারই হলো! আমি যদি বাবা তারকনাথের 'সোমবার' আজ থেকেই কত্তে আরম্ভ করি,—তা' হলে ত সব নষ্ট হবে! আমাকে আগে জিজ্ঞেস্ ক'রে—তবে এ সব কাজ আরম্ভ কত্তে হয়!

কালাচাঁদ। জিজ্ঞাসা করিবার সময় পাইলাম কৈ? কাল রাত্রে স্বপ্নে দেখিলাম, কে যেন এক কেঁড়ে তেল কিনে এনে পৈঁঠেয় মাখিয়ে রেখেচে। আমি না জেনে, পৈঁঠে দিয়ে নাব্‌তে গেছি। অমনি পা পিছলে প'ড়ে হাড়গোড় ভেঙ্গে গেল। বাঁচবার আর উপায় ছিল না। স্বপ্নে কালী মা বল্লেন,—তুই পাড়ার সমস্ত লোককে যদি কালিয়া-পোলাও খাওয়াস, তবে তোর এই ব্যথা আরাম হবে। এমন সময় আমার ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। দেখিলাম, ভোর হইয়াছে। অমনি দুপ্ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া দৌড়িয়া গিয়া, মল্লিক কাসেমের হাট হইতে এই মাছটী কিনে এনেচি। বন্ধু! এতে আর আমার অপরাধ কি?

পতিত। তবে কি তেল আমি ফেলেচি না কি? যে তেল ফেলেচে, তার সর্ব্বনাশ হোক! তিনদিন পেরুবে না—সে মরুক্! তার মুখের গ্রাস উড়ে যাক্।

কালাচাঁদ। বন্ধু! তুমি অমন কর্‌চো কেন?—তোমাকে ত আমি কিছুই বলি নাই!

পতিত। বল্‌তে আর বাকি কি রহিল? এ যে ঝীকে মেরে বৌকে শেখান হ'লো,—এ কি কেউ আর বুঝ্‌তে পারে না? পতিত জানে সব, বুঝে সব,—তবে পতিত 'মরেচে, কথা কইতে নেই,'—এই যা পতিতের দোষ। যত দোষ, নন্দঘোষ। যে যা করুক্, দোষ হবে পতিতের। পতিত আর বেশীদিন সংসারে থাকবে না,—শীঘ্রই বিবাগী হয়ে, কাশী-বিন্দাবন চ'লে যাবে! আর এ দেশে আসবে না। বন্ধু! এ বাড়ীত তোমাকেই দান করেচি,—তুমিই ইহা ভোগ-দখল ক'রো।

কালাচাঁদ তখন কার্য্যগতি বুঝিয়া, হাসিয়া উঠিয়া, পতিতের হাত ধরিলেন। বলিলেন, "বন্ধু! আমার উপর কি তোমার রাগ করিতে আছে? এস,—ব'স।"

পতিত বসিলে, কালাচাঁদ তাহাকে স্বয়ং সাজিয়া এক ছিলিম গয়ার তামাক খাওয়াইলেন। তাম্রকূটধূমে দেহ পরিশুদ্ধ এবং প্রফুল্লিত হইলে, কালাচাঁদ পতিতের হাতে ৪৲ চারিটী টাকা দিয়া বলিলেন, "বন্ধু! পোলাওয়ের জন্য চাল, ঘি, মসলা কিনে নিয়ে আসতে হবে।"

পতিত টাকা চারিটী লইয়া ট্যাঁকে রাখিল। মনে মনে সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু মুখে একটু কৃত্রিম কোপ দেখাইয়া বলিল,—"পতিত এখন বাজার কত্তে প'লে হয়! হুঁ—হুঁ!—বন্ধু! তুমি এই যে, মাছটী নিজে কিনে নিয়ে এসেচো, এটী যদি আমার হাত

দিয়ে কিন্‌তে, তা'হলে নিশ্চয়ই ১৲ এক টাকা সস্তা হ'তো। পাঁচ গণ্ডা পয়সা—দস্তুরিও কেটে নিতেম! আর তুমি কি মাছ চেনো? এ যে পশ্চিমে মাছ! এর যে ভাল সোয়াদ হবে না! ভারি ঠকিয়েচে! হাঃ হাঃ!—তোমার পয়সা সস্তা,—যা-ইচ্ছা তাই কর;—তবে নিতান্ত অন্যায়-গুলা দেখ্‌তে পারি না, তাই দু-কথা বলি! আমার চুপই আচ্ছা! কি জান, বন্ধু! পুকুরের দিশি-মাছ কেন্‌বার দরকার হ'লে, হাটে-বাজারে যেতে নেই! আগে জেলেবাড়ী যেতে হয়। গিয়ে জেলেনীর সঙ্গে পরামোশ কত্তে হয়। সেই জেলের মেয়েকে মিষ্টি ক'রে দু-কথা বুঝিয়ে বল্লে, মাছ-টাও ভাল হয়, দু-পয়সা সস্তায়ও পাওয়া যায়।—"

কালাচাঁদ। এই হুগলী সহরে যারই মাছের দরকার হচ্চে, সে-ই কি অমনি জেলেবাড়ী যেয়ে জেলেনীর সঙ্গে মিষ্টি কথা কচ্চে?

পণ্ডিত। বন্ধু! তোমাকে কথায় কেউ পার্‌বে না!

এই কথা কহিয়া পণ্ডিত বাহুনাড়া দিয়া বাজার করিতে চলিল। বহু-বিলম্বে বাজার হইতে ফিরিল। জিনিস-পত্র রাখিয়া, কালা-চাঁদকে বলিতে লাগিল,—"গেলাম, মো'লাম,—উঃ, আর বাঁচিনা; বেলা তিতীয় পহর হইল, মুখে জল দিই নাই! বন্ধু! তোমার জন্য খেটে খেটে গেলাম।"

বাজার করায় যতই কষ্ট হউক, সে দিন পণ্ডিত পরিতোষরূপে আহার, অর্থ এবং আনন্দ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু সে আনন্দ ক্ষণ-প্রভাবৎ ক্ষণিক! শুষ্ক-মূল ছাড়িয়া পাতায় জল সেচনে ফল কি?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পতিতপাবন সর্ব্বপ্রকারে বিফলমনোরথ হইল। অবশেষে অগত্যা কালাচাঁদকে একরকম ছাড়িয়াই দিল। মনে মনে ভাবিল, "কালাচাঁদকে সংশোধন করিবার আর উপায় দেখি না। লোকটা একবারে খারাপ হইয়া, বহিয়া গিয়াছে। নূতন ব্যক্তিকে লওয়ান সহজ; কিন্তু কালাচাঁদ বকেয়া-ঘাগী—উহাকে বশ করা বড়ই বিষম। কালাচাঁদ পুরাণ-পাপী,—ভুক্তভোগী—সিদ্ধ-পুরুষ। বাঁশ পাকিয়া ঝনুঝনে হইয়াছে,—উহাকে কি আর এখন নোয়ান যায়?"

পতিত, কালাচাঁদ সম্বন্ধে নির্ভরসা হইল বটে, কিন্তু আশা ছাড়িতে পারিল না। আশা,—বড়ই দুষ্টা,—মায়াবিনী। এই, এবেলা ছাড়িয়া দেয়, আবার ওবেলা গ্রহণ করে। পতিত ভাবে, "এত লোকের বড় বড় রোগ আরাম হইল,—কালাচাঁদের কি এ রোগ আরাম হইবে না? এত ভাল ভাল ঔষধ দিলাম, কিন্তু কিছুতেই ত ফল হইল না। দোষটা ঔষধের কি?"

পতিত এইরূপ ভাবে, আর থাকে। কালাচাঁদও অনুরূপ ভাবেন, আর, পতিতের গৃহে অবস্থিতি করেন।

কালাচাঁদ কারাগার হইতে যে টাকাগুলি আনিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশ ফুরাইতে লাগিল। আয় নাই, কেবল ব্যয়;—সঞ্চিত অর্থ কতক্ষণ টিকে? এক কলসী-জল,—গড়াইতে-গড়াইতে কতক্ষণ থাকে? আমদানি নাই কেবল রপ্তানি,—রাজার ভাণ্ডার টুটিয়া যায়,—কালাচাঁদের ভাণ্ডার ত কোন্ ক্ষুদ্র,—ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র!

টাকা ফুরায় আর কালাচাঁদ ভাবেন—'কুচ পরোয়া নেহি'; আমি এখন সৎ, সাধু, নিষ্পাপ,—সুতরাং আমার কষ্ট কিছুতেই ঘটিবে না। ভগবান্ নির্দ্দোষ, নিষ্কলঙ্ক ব্যক্তিকে কষ্ট দিবেন কেন? আমার নিজের ভাবনা আমি কিছুই ভাবি না; আমার একটা পেট পূর্ণ করিতে কতক্ষণ? একবেলা মুটেগিরি করিয়া আসিলেও আমার উদর পরিপূর্ণ হইবে। এর জন্য আর চিন্তা কি?

আচ্ছা, কোন কাজ-কর্ম্ম করিলে ক্ষতি কি? অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিলে সর্ব্ব-দিকেই সুবিধা। হাতে অর্থ থাকিলে দরিদ্রের দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ হইব।

কৃপণ ব্যক্তি 'যখের' ধন আগুলিয়া রাখে; নিজেও খায় না, অপরকেও খাইতে দেয় না। কত কাঙ্গালী কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া যায়; তবু কৃপণ ব্যক্তি তাহাকে একটী পয়সাও দেয় না। দেশের সমস্ত টাকা যদি প্রত্যেক ব্যক্তির হাতে সমভাগে থাকে, তাহা হইলে কাহারও কোন কষ্ট হয় না। কোন ব্যক্তি টাকার উচ্চ পাঁজা সাজাইয়া, তাহার উপর রত্ন-সিংহাসনে বসিয়া আছেন; কেহ বা ভূতলে, কণ্টকাকীর্ণ গর্ত্তের নীচে দাঁড়াইবার স্থান পাইতেছে না। কেন এমন হয়? ভগবান্ কি একচক্ষু, দয়ামায়া-হীন? কাহারও খাইয়া খাইয়া পেট ফুলিয়া উঠিয়া, ফাটিয়া যাইতেছে; কাহারও না-খাইতে পাইয়া, আঁত মরিয়া গিয়া, পেটের চামড়া পিঠে ঠেকিতেছে! ঈশ্বর এমন বিসদৃশ নিয়ম কেন করিলেন?

যাই-হউক, আমার অর্থ হইলে, দুঃখী দরিদ্রকে দান করিয়া তাহার সাহায্য করিব। একটা চাকুরীর চেষ্টা দেখাই ভাল। না, —ব্যবসা করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট! ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে মূলধন

কোথা পাইব? আমার ত সঙ্গতি কিছুই নাই,—কেমন করিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিব? প্রথম চাকুরীই করিব। কিছু মূলধন জমিলে শেষে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিব।

কিন্তু চাকুরির জন্য যাই কোথা? কাকে গিয়া বলি? কেইবা আমার দুঃখে দুঃখী হইয়া, আমার চাকুরি করিয়া দিবে?

আমার ঠাকুরদাদার হুগলীসহরে প্রবল প্রতাপ। তিনি প্রভূত ধনশালীও বটেন। বহু-ব্যক্তি তাঁহার কথার বশ। তিনি মনে করিলে, একদিনেই—এক দণ্ডেই আমার একটা চাকুরি করিয়া দিতে পারেন। বিশেষ, তাঁহার অপেক্ষা এ সংসারে আমার আত্মীয় আর কেহই নাই। আমার মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই,—কেহই নাই;—আপনার বলিতে আছেন কেবল,—ঐ একমাত্র ঠাকুরদাদা। তাঁহার কাছে যাই, তাঁহার পায়ে ধরি, কাঁদি,—বলি,—'আমি বড় হতভাগা। আমাকে ক্ষমা করুন। আপনি না রাখিলে, আর কে স্থান দিবে? আপনিই আমার সব। আপনি ভিন্ন আর আমার কে আছে? আপনার চরণে শরণ লইতেছি,—আমাকে পায়ে ঠেলিবেন না।' ঠাকুরদাদাকে একথা বলিতে ত কোন দোষ নাই। কল্য তাহাই গিয়া বলিব।

কিন্তু ঠাকুরদাদা আমায় চরণে স্থান দিবেন কি? শুনিতে পাই, তিনি আমার উপর খড়্গহস্ত। শুনিতে পাই, আমার নামে তিনি ঘৃণায় নাসিকা সঙ্কুচিত করেন। শুনিতে পাই, আমার ছায়ায় তিনি লাথী মারেন। শুনিতে পাই, আমাকে নাতী বলিয়া পরিচয় দিতেই তিনি লজ্জিত হন। যদি কেহ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরে, তাহা হইলে বলেন,—'কেলে-ছোঁড়া আমার জ্ঞাতির জ্ঞাতি, তস্য জ্ঞাতি,—গ্রামসম্পর্কে নাতী হইলেও হইতে পারে।' বিধা-

তার কেন যে এই বিড়ম্বনা, তাহা'ত বুঝিতে পারি না। ইহজন্মে আমি তাঁহার কখন মন্দ করি নাই, মন্দ ভাবিও নাই,—তথাচ কেন যে তিনি আমার উপর এরূপ বিদ্বেষভাবাপন্ন,—ইহার গূঢ়রহস্য ভেদ করিতে কিছুতেই সক্ষম নহি।

যখন বর্দ্ধমানে আমি দায়রা-সোপরদ্দ হই, তখন শুনিয়াছিলাম, ঠাকুরদাদা আমাকে জেলে পুরিবার জন্য, আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমার তদ্বির করিতেছেন। প্রকৃত কথা বলিতে কি ;—আমি এ-কথা তখন তিলার্দ্ধও বিশ্বাস করি নাই। কোথা হুগলী, আর কোথা বর্দ্ধমান,—মধ্যে বিশ ক্রোশ পথ ব্যবধান। এতদূরে, হুগলীতে অবস্থিতি করিয়া, ঠাকুরদাদা আমাকে যে নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বর্দ্ধমানে লোক পাঠাইয়া ষড়যন্ত্র করিবেন,—এ কথা কাহার মনে স্থান পায় ? বিশেষ, আমি ঠাকুরদাদার আপনার-লোক—স্নেহের পাত্র,—আর, কোন কালে তাঁহার সহিত বিবাদ নাই, বচসা নাই, —কেনই বা তিনি আমার অনিষ্ট অনুসন্ধানের চেষ্টা করিবেন ? কাজেই তখন আমি ঠাকুরদাদার তদ্বিরের কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই ; হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এখন যেমন শুনিতেছি, বুঝিতেছি,—তাহাতে আমার স্থির-বিশ্বাস,—ঠাকুরদাদা বর্দ্ধমানে আমার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই তদ্বির করিয়াছিলেন ! তাই ভাবি, —কেন এমন হইল ?

আচ্ছা, ঠাকুরদাদা প্রকৃতই আমার উপর বিরূপ কি না,— তাহা'ত একবার স্বয়ং সশরীরে বুঝিয়া আসা ভাল। কেবল শুনা-কথায় ঠাকুরদাদার উপর এরূপ অভিযোগ আনা ত উচিত নহে। একবার তাঁহার কাছে যাই না কেন ? যাইয়া স্বচক্ষে একবার দেখা ভাল। তিনি ত বাঘ নন যে, আমাকে দেখিলেই

অমনি গিলিয়া ফেলিবেন। আর, আমাকে গ্রাস করেই বা কে?

যাওয়া উচিত। যাইব। কল্যই যাইব। কালবিলম্বে ফল নাই।

এইরূপ চিন্তা করিয়া, কালচাঁদ বন্ধু-পতিতপাবনকে কহিলেন, "বন্ধু! আমি এক জায়গায় বেড়াতে যাচ্চি। তুমি যাবে কি?"

পতিত। কোথা?

কালাচাঁদ। ঠাকুরদাদার বাসায়।

পতিত পূর্ব্বমুখ হইল। উর্দ্ধপানে চাহিল। চাহিয়া, যুক্তকরে, প্রণাম করিতে লাগিল। বলিল,—"দণ্ডবৎ! দণ্ডবৎ! ঈস্! সকালে উঠেই ঐ নাম! আজ অন্ন হবে না।"

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) কেন? কেন?—তাঁর কি এতই অপরাধ?

পতিত। বন্ধু! তুমি জান না। মাছ সম্বরবে, তা তেল দেবে না। ঠিক্ যেন মড়াপোড়ার গন্ধ উঠে। আলু-ভাতে খাবে, তা নুন দেবে না। ঐ পাকা বুড়ো পিঁপ্ড়ের গা-টিপে গুড় বা'র করে;—ওর কি মুখ দেখ্তে আছে?

কালাচাঁদ। বন্ধু! ঠাকুরদাদার উপর তুমি অত চট্‌লে কেন?

পতিত। আমিই না হয় চটেচি! তোমারই বা আজ অত ভক্তি উথ্‌লে উঠ্‌লো কেন? নাতীকে বাগে পেলে ঠাকুদ্দা এখনি ঘাড়ের রক্ত চুষে খান!—সে নাতীর আজ আর আদর দেখে বাঁচি না।

কালাচাঁদ। আমি যা বল্‌বো,—বন্ধু তার ঠিক উল্টোটী বল্‌বে! বন্ধুর সঙ্গে কোন পরামর্শ ক'রে,—সুখ হয় না। যাহোক

আর কোন কথায় কাজ নেই,—চল, বন্ধু! আমার সঙ্গে ঠাকুদ্দার বাসায় চল।

পতিত। আমি ত যাবোই না; তোমাকেও সে কুস্থানে যেতে দিব না। সে লোকটা খুনে। আমাদিগে দেখ্লেই, মেরে-ধরে হাড়-গোড় ভেঙ্গে চূর্ণ ক'রে দিবে। বাপ্‌! সেখানে কি আমি কাঁচা-মাথাটা দিতে যাবো?

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) সে ভয় তোমার নাই! আমাকে মারে কে? আমাকে খুন করিতে অন্তত পাঁচ-শ লোক চাই। ঠাকুদ্দার ঘরে পাঁচজন দরোয়ান আছে বৈত নয়! এক-এক কীলে আমি পাঁচজনকে পাঁচ দিকে শুইয়ে রেখে আস্‌বো। তোমাকে সে সব কিছু চিন্তা কর্‌তে হবে না। যদি তেমন তেমন বাধে,—

পতিত। (সভয়ে) না বন্ধু! আমি যাবো না,—আমাকে ক্ষমা কর!

আজ প্রায় দেড় বৎসর হইল, পতিত ঠাকুরদাদার গৃহে জুতা খাইয়াছিল। সেই চর্ম্ম পাদুকা-প্রহার-রূপ-ভীতি পতিতের হৃদয়ে এখনও অষ্ট-প্রহরই উদিত হয়। কাজেই সে, ঠাকুরদাদার নিকট যাইতে একান্ত অসম্মত।

কালাচাঁদ কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি মনে মনে হাসিয়া বলিলেন, "বন্ধু! তা হবে না। তোমাকে আমার সঙ্গে যেতেই হবে! তোমাকেই সেখানে দরকার। আমি একা গেলে যদি হ'তো, তা'হলে এতক্ষণ আমি চলে যেতাম।"

পতিত ভয়ে কাঁপিয়াই আকুল। কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিল "হেঁই বন্ধু! তোমার পায়ে পড়ি। তুমি আমাকে সেখানে নিয়ে যেয়ো না। আমি গেলেই খুন হবো।"

পতিতের একটী গাভী ছিল। পতিত বলিত, গাভীটী সুরভী-জাতীয়। জাতিতে যাহাই হউক, পতিত প্রাণ-খুলিয়া গরুটীর সেবাযত্ন করিত,—যেখানে যা-কিছু পাইত, গাইকে আনিয়া খাওয়াইত। কোঁচার খুঁট দিয়া গোরুর গা মুছাইয়া দিত। লোকের নিকট প্রকাশ করিত,—"গাভী মা-ভগবতী। যে ঘরে গোরু নাই, সে ঘর শ্মশান। আমি যে এই গাইটিকে এত ভক্তি করি, তাহা দুধের জন্য নহে;—মায়ের সেবার জন্য—পরকালের জন্য।" দুগ্ধের জন্য গো-সেবা না করিলেও, গাভীটী খুব দুধ দিত। খুব ভক্ত হইলেও, পতিত মা-ভগবতীর সেই দুধ বাজারে বেচিত।

পরম ভক্ত পতিতপাবন, শণ কিনিয়া, ঢেরায় দড়ী কাটিয়া, সম্প্রতি স্বয়ং স্বহস্তে গোরুর জন্য একগাছি দড়া ভাঙ্গিয়াছিল। প্রকৃতই সেই দড়া গাছটী মোটা এবং শক্ত। গত কল্য, সে দড়া পতিত, বন্ধুবান্ধবগণকে দেখায়;—বলে;—"ইহাতে পাকের এরূপ কৌশল আছে যে, ইহা একবারে বজ্র হইয়াছে। দুটা হাতী একত্র হইয়া টানিলেও, এ দড়া ছিঁড়িবে না। তোমাদের মধ্যে যদি কেহ ইহা ছিঁড়িতে পার, তাহা হইলে আমি তাহাকে পাঁচ টাকা দিব।"

একে একে সকল বন্ধু দড়া পরীক্ষা করিল। দড়া ছিঁড়িতে না পারিয়া সকলেই পতিতের নির্ম্মাণ কৌশলের প্রশংসা করিতে লাগিল। শেষে পতিত, কালাচাঁদকে বলিল,—"বন্ধু! তুমিত লোহার শিকল ছিঁড়িয়া থাক,—এই দড়াগাছটী একবার ছেঁড় দেখি—দেখি, কেমন তোমার শক্তি! এ দড়া স্বয়ং পতিতের বুড়ো-আঙ্গুলের টীপুনি দিয়ে ভাঙ্গা—কার সাধ্য ছেঁড়ে?"

কালাচাঁদ হাসিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "পতিত অর্দ্ধ-

পাগল। ও মনে করে, কেবল গায়ের জোরেই শিকল ছেঁড়া যায়, দড়া ছেঁড়া যায়, কবাট ভাঙ্গা যায়, ত্রিতল গৃহ হইতে লাফাইয়া পড়া যায়। কিন্তু তাহাত নয়। অবশ্য গায়ের জোর কিছু চাই বৈকি?—কিন্তু গায়ের জোর ছাড়া আর একটা জোর আছে, যাহার দ্বারা সকল কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। সেই জোরের নাম কৌশল-বোধ, হিসাব-জ্ঞান, তুকতাক এবং অভ্যাস। আমি মনে করিলে, অনায়াসেই এ দড়া ছিঁড়িতে পারি, কিন্তু এত লোকের সাক্ষাতে সে বাহাদুরি দেখাইয়া ফল কি? লাভের মধ্যে পতিতের এত সাধের দড়াগাছটী নষ্ট হইবে।”

এইরূপ ভাবিয়া কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন,—“না বন্ধু!—এ দড়া কি আমি ছিঁড়তে পারি?—আমার মত এক-শ লোক এলেও পারবে না।”

পতিত। তবে তোমার কিসের শক্তি?

গতকল্য এইরূপই কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। অদ্য যখন পতিত, ঠাকুরদাদার বাসায় যাইতে ভীত হইল তখন কালাচাঁদ নিজ পরাক্রম দেখাইয়া পতিতের সাহস-বৃদ্ধির জন্য, দোয়ার হইতে সেই দড়াগাছটী লইয়া, এক হেঁচকাটানে ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। পতিত অবাক্। এত পরিশ্রম-লব্ধ, প্রাণসম দড়াগাছটীকে ছিন্ন হইতে দেখিয়া, সত্যসত্যই পতিতের চক্ষে জল আসিল। একে সে, ভয়ে অস্থির, তার উপর দড়ার শোক! শোক বলিয়া শোক!—মহাশোক! দেহ হইতে দক্ষিণ বাহু বিচ্ছিন্ন হইলেও, পতিতের এত শোক হইত না!

সুখের মধ্যে এই যে, শোক-সামগ্রীটী অধিকক্ষণ পূর্ণমাত্রায় তিষ্ঠে না। একটু সুস্থ হইয়া পতিত ভাবিল, “কালাচাঁদ ভীম,

না, ভগদত্ত? এমন আশ্চর্য্য শক্তি ত আমি কোথাও দেখি নাই।"

কালাচাঁদ দড়া ছিড়িয়া হাসি হাসি মুখে বলিলেন, "বন্ধু! দেখলে ত আমার গায়ে জোর কত! এখনও কি আমার সঙ্গে ঠাকুদ্দার বাসায় যেতে তোমার ভয় হয়? যদি ভয় হয়, তবে খুলে বল;—আরও একটা শক্তির পরিচয় না-হয় দেখাই!"

পতিত কিংকর্ত্তব্যজ্ঞানহীন। হৃদয়-কমল আন্দোলিত। সে, এইভাবে ভাবিতে লাগিল,—"অদ্যকার কালরাত্রি কি আমারই জন্ত পোহাইয়াছিল? যদি আজিকার দিন বাঁচি, তাহা হইলে পতিত বোধ হয় এক-শ কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে। বন্ধুকে যদি বলি, আমার এখনও ভয় আছে, তাহা হইলে বন্ধু হয় ত এখনি আর একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড করিয়া ফেলিবেন। হয় ত বাই-ঠুকিয়া আমার বড় ঘরের দেওয়ালটা ভাঙ্গিয়া দিবেন। হয় ত আমার এই দো-ফলা আমগাছটা সজোরে উপড়াইয়া ফেলিবেন। হয় ত জোর দেখাইবার জন্য, আমাকেই উর্দ্ধে এক-শ হাত উচ্চে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, লুফিয়া লইবেন। আমাকে রামে মেলেও মেরেচে, রাবণে মেলেও মেরেচে। বন্ধু এখন যা বলেন, সেই কথাই শোনা ভাল।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রকাশ্যে পতিত বলিল,—"বন্ধু! তোমার সঙ্গে তবে আমি যাবো;—কিন্তু দেখো বন্ধু! শেষে যেন প্রাণে মরি না।"

কালাচাঁদ কহিলেন,—"ভয় নাই।"

পতিতের সঙ্গ ব্যতীত কালাচাঁদ যে, ঠাকুরদাদার গৃহে যাইতে অক্ষম, তাহা নহে। পতিতকে সঙ্গে লইবার বিশেষ যে, কোন

কারণ ছিল, তাহাও নহে। তবে কালাচাদ এত জেদ ধরিলেন কেন?—কেবল মজা করা ভিন্ন অন্য কোনও কারণ ত দেখি না। পতিত ভয়ে ভীত হইয়া বলিল, 'যাইব না,'—কালাচাঁদের মজা হইল। ভীত ব্যক্তি দেখিলে, কালাচাঁদের আনন্দ হইত। পতিত ভীত হইয়াছে; অতএব পতিতকে সেই ভয়সঙ্কুল স্থানে লইয়া যাইতে হইবে;—ইহাই হইল,—কালাচাঁদের রঙ্গরস, রসিকতা, রস-চাতুরি!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাদ, পতিতের সমভিব্যাহারে, ঠাকুরদাদার বাসায় গেলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তথায় আদৌ আদর-অভ্যর্থনা পাইলেন না। ঠাকুরদাদা, নাতীকে দেখিয়া মহা বিরক্ত হন; মুখ বাঁকাইয়া বসিয়া থাকেন; যে দু-একটী কথা কন, তাহাতে বিরক্তি এবং ব্যঙ্গের ভাবই প্রকাশিত হয়। কালাচাদ শুষ্কমুখে প্রত্যাগত হইলেন। পতিত বলিল, "বন্ধু! দেখ্‌লে,—আমি যা বলেছিনু, তাই ঠিক্ হ'লো! আমি মর্‌বো কবে, তাই জানি না,—নহিলে, পতিত জানেনা কি?"

কালাচাদ। তুমি যা বলেছিলে, ঠিক্ তার উল্টা হলো।

পতিত। উল্টা হবে কেন?—ঠিক্ই হয়েচে।

কালাচাঁদ। তুমি বলেছিলে, ঠাকুদ্দা দুজনকেই খুন ক'রে ল্‌বেন; না হয় মেরে পিঠ ছিঁড়ে দিবেন।

পণ্ডিত। খুন কে কাকে করে? এ কোম্পানার মুলুকে খুন আর কাকেও কত্তে হয় না! কথায় কথা একবার বলে-ছিলেম ব'লেই কি, ঠাকুদ্দা অমনি দুইটা জেয়ান্ত মানুষকে খুন কত্তে পারেন! বন্ধু! তুমি কি তামাসা বুঝ না?

কালাচাঁদ। তা, আর কৈ বুঝিতে পারিলাম!

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে দুই বন্ধুতে বাসায় প্রত্যাগত হইলেন। সন্ধ্যার পর আবার পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া, কালাচাঁদ অন্যান্য আত্মীয়, গ্রামস্থ ব্যক্তির বাসায় গেলেন। তিনি যেখানে যান, সেইখানেই উপেক্ষিত এবং উপহসিত হন। কোথাও কালা-চাঁদ স্নেহ, ভালবাসা,—অধিক কি, মৌখিক মিষ্ট কথা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হইলেন না। তাঁহার ভগ্নমন আরও ভাঙ্গিল।

কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন, "আমি এখন সচ্চরিত্র, সাধু, সত্যবাদী হইয়াছি,—তথাচ লোকে আমাকে এত ঘৃণা করে কেন? এরূপ উপহাসই বা করে কেন? লোকগুলা বড়ই বদ্। লোকগুলা চোর, প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক।"

লোকগুলা মন্দ হয়, হউক;—আমি কিন্তু সৎপথ কখন ছাড়িব না। সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর, আমাকে সৎপথাবলম্বী দেখিলে, অবশ্যই সন্তুষ্ট হইবেন। ভগবানের কৃপাদৃষ্টি থাকিলে, অনলে, জলে, শৈলে, রণে, বনে, ভবনে,—কোথাও আমি কষ্টে বা সঙ্কটে পতিত হইব না। আমি মানুষের ভালবাসা চাই না। ভগবানই আমার ভরসা। ভগবান্ আমাকে ভালবাসুন। হে ভগবন্! আমি তোমার ক্ষুদ্র দাস;—চরণাশ্রিত, সেবক। তুমি অসীম, অনন্ত, অক্ষয়। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোমার উদরে অধিষ্ঠিত। তুমি স্নেহময়ী যশোদাকে, লীলাচ্ছলে, তোমার মুখাভ্যন্তরে সমুদায় সংসার দেখাইয়াছিলে।

তুমি ভক্তের অধীন, তুমি ভক্তের বৎসল। প্রাণ-সঙ্কটে তুমি ধ্রুব-প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছ। হে শ্রীমধুসূদন! কুরুসভায়, তুমিই দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছ! হে দীনবন্ধু! সুধন্বাকে তপ্ততৈল হইতে রক্ষার তুমিই কারণ। হে প্রভু! আমার বাপ নাই, তুমিই আমার পিতা; আমার মা নাই, তুমিই আমার জননী; আমার বন্ধু-বান্ধব কেহই নাই, তুমিই আমার সুহৃদ্! প্রভু! তোমার চরণে আমার এই প্রার্থনা, যেন মন্দকর্ম্ম করিতে আর মন না যায়। আমি পাপী, দুরাচার, অকৃতী, অধম, তুমি মুখ তুলিয়া না চাহিলে, আমার আর উপায় নাই। প্রভু! আমার কেবল এই মিনতি,—তোমার চরণযুগলে স্থান দিও।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কালাচাঁদের হৃদয় কতকটা সুস্থ হইল! মন ঠাণ্ডা হইলে, তিনি গো-সেবায় তৎপর, পতিতপাবনকে বলিলেন, "বন্ধু! তুমি আজ কি খাবে বল? লুচি বল, খিচুড়ি বল, সরুচাকুলি বল,—এ তিনের মধ্যে, তুমি যা'বল, তাই খাওয়াইব।"

বন্ধু তখন খুব কুঁচি কুঁচি করিয়া গোরুর জাব কাটিতেছিল। আহারের নামে অর্দ্ধ-কর্ত্তিত বড়-আটিটী ফেলিয়া উঠিয়া পড়িল, ঝটিতি কালাচাঁদের নিকট আসিয়া বলিল,—"বন্ধু! তুমি আমার খাবার কথা ব'লচো বটে—কিন্তু আমার মুখে কোন জিনিস্ আর রোচে না! ভাত খাওয়াত উঠে গেছে! এই, আধপো চেলের অন্ন রাঁধি,—তারই বার-আনা-ভাগ পাতে পড়ে থাকে। তবে একটু দুধ খেয়ে থাকি। দুধই হ'লো আমার এখন জীবন। তা, আমাকে লুচি, খিচুড়ি খাবার কথা বলা বৃথা। তবে তুমি বল্লে'ত কথা এড়াতে পারি না—"

কালাচাঁদ। ওসব কথা যাক্। এখন বল,—ঐ তিনটা জিনিসের মধ্যে কোন্‌টা খাবে?

পণ্ডিত এইবার বড় বিপদে পড়িল। সরুচাকুলিটে তাহার বড়ই প্রিয়তম। সরুচাকুলির নামে তাহার রসনা লহ-লহ করে। কিন্তু এদিকে লুচি, ওদিকে খিচুড়ি। এ দুইটার মধ্যে কোনটাইত মন্দ জিনিস নহে, লুচি হইলে, দই, তরকারি সন্দেস থাকিবে। কিন্তু খিচুড়ি হইলে মাছভাজা, মাছের কালিয়ে থাকিতে পারে। দই ত হইবেই। খিচুড়িতে দই না খাইলে গরম হয়। আর, শেষে মিষ্টিমুখ করিবার জন্য অবশ্যই সন্দেশ থাকা চাই। তবে লুচি-খিচুড়ির মধ্যে খিচুড়িটেই ভাল। কিন্তু লুচি-সামগ্রীটা সর্ব্বমনোহর! আচ্ছা করিয়া ময়ান দিয়া, একটু খর-খর করিয়া ভাজিয়া, অল্প গরম গরম থাকিতে থাকিতে খাইতে পাইলে,—খিচুড়ি কোথায় লাগে? কিন্তু আমি যে, সরুচাকুলিটা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসি—তাহার কি? খাটি দুধের পরমান্নের সহিত সরুচাকুলি মাখিয়া খাইবার সময় যে কিরূপ আরাম, সোয়াস্তি হয়—তাহা আর বলিবার নহে। আ—আঃ—আহা,—গরাসে গরাসে যেন চাঁদ নিঙড়িয়া সুধা খাইতেছি বলিয়া মনে হয়! কিন্তু সরুচাকুলি খাইলে বড় মাছের মুড়ার কালিয়ে পাইব না। বন্ধু বলিবে—সরুচাকুলির সঙ্গে আবার মাছ খাওয়া কি? সুতরাং আমি বলি কি? কোন্ জিনিস্‌টা খাই?—এ-যে দেখিতেছি,—আমার পক্ষে সবই সমান হইয়া দাঁড়াইল!

কালাচাঁদ। বন্ধু! এত ভাব্‌চো কি? বল না কি খাবে?

পণ্ডিত মাথা চুলকাইতে লাগিল; কিছুই ঠিক করিতে পারিল না। ভাবিল, অদ্যকার বড়ই গুরুতর সমস্যা। বিশেষ না ভাবিয়া,

না বুঝিয়া, হঠাৎ এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইবে না। রাত্রে শুইয়া-শুইয়া, সমস্তক্ষণ জাগিয়া জাগিয়া, ভাবিয়া ভাবিয়া, একটা যা-হয়, ঠিক করিয়া, বন্ধুকে কল্যপ্রাতে ইহার উত্তর দিব।"

এইরূপ চিন্তা করিয়া, একটু বুদ্ধিব্যয়পূর্ব্বক পণ্ডিত বলিল,—"বন্ধু! ক্ষুধাটা মন্দা আছে;—আজ না হয় থাক্—কাল খাওয়ান হবে।"

কালাচাঁদ। তাও কি কখন হয়? পূজারি-ঠাকুরকে ব'লে এসেচি,—তিনি এসে রাঁধবেন।

পণ্ডিত জানে,—কালাচাঁদ যাহা ধরে, তাহা সহজে ছাড়ে না! নিরুপায় হইয়া বলিল, "আচ্ছা, বন্ধু। সরুচাকলি হ'লেত পায়েস নিশ্চয়ই হচ্চে—

কালাচাঁদ। তা, অবশ্য হবে।

পণ্ডিত। আমি সে কথা বলচি না—পায়েস ত হবেই। আমি বলচি কি,—বড় মাছের কালিয়ে হবে না কি?

কালাচাঁদ। আচ্ছা,—তুমি বল ত,—তাও হবে।

পণ্ডিত। আমার কোন বলাবলি নাই,—তোমার ইচ্ছা হয়—হোক; না ইচ্ছা হয়........., কি জান্‌লে, বন্ধু! বড় মাছের মুড়া জিনিসটা ভাল।

কালাচাঁদ। আচ্ছা, মাছের কালিয়াও করা যাবে।

পণ্ডিত। বন্ধু! একসের ময়দায় আদসের ঘিয়ের ময়ান দিয়ে, তুমি কখন কি লুচি খেয়েছ?

কালাচাঁদ। না।

পণ্ডিত। আমি খেয়েচি। তোমার ঠাকুদ্দার কাছ থেকে আইবুড়ো-ভাতের তত্ত্ব নিয়ে আমি একবার রাজবাড়ীতে যাই।

রাজা অনেকদিন মরে গেছেন,—রাণীই কর্ত্তা। রাণী আমাকে একটা লিখে দিলেন,—আধমণ চাল, দশসের ময়দা, পাঁচসের ঘি, পাঁচসের একটা মাছ,—আরও যে কত-কি লিখেতে ছিল, তা আর কি বল্‌বো। লিখে দেখেই ত আমার আত্মাপুরুষ উড়ে গেল। ভাবলেম—এত লিখে নিয়েইবা আমি কি কর্‌বো? তখন মনে হলো, একসের ময়দায় আধসের ঘিয়ের ময়ান দিয়ে লুচি তৈয়ের করা যা'ক্!—দেখি-না কেমন হয়! তাহাই করিলাম। বন্ধু! লুচি যা তৈয়ের হলো, তা আর তোমাকে কি বল্‌বো? মুখে দি,—আর মিলিয়ে যায়! সে লুচি ঠোঁটের কাছে ঠেকাই,—আর নাই! ঠোঁটের কাছে ঠেকাই,—আর নাই! বুকের কল্‌জেটা-সুদ্ধ একেবারে সাফ হয়ে গেল। সে রকম লুচি সেই একবার কোন্-কালে খেয়েছিলেম,—আর খাই নাই। বন্ধু! আমার ইচ্ছে যে, তোমাকে একদিন সে-রকম লুচি খাওয়াই! যদি বল, তবে আজই সন্ধ্যাকৃলি তৈয়েরির সময় পুজারি-ঠাকুরকে দিয়ে, সেরখানেক ময়দার সে-রকম লুচি ভাজাই।

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) একসের ময়দায় আধসের ঘি ময়ান দিলে যে, লুচি গুঁড়ো হয়ে যাবে—খোলায় ভাজা হবে কেন? ঘিটেও নষ্ট হবে, লুচিও কেউ খেতে পাবে না।

পণ্ডিত। আমি বল্‌চি, হবে; যদি না হয়, তবে তার দায়ী আমি আছি।

কালাচাঁদ। তাই হোক,—আমার আপত্তি নাই।

পণ্ডিত। বন্ধু! আমি নিজের খাবার জন্য বলি নাই;—তোমাকে খাওয়াব, এই আমার সাধ। তুমি খেলেই আমার তৃপ্তি।

কালাচাঁদ (হাসিয়া) তবে আর খিচুড়ীটে বাকী থাকে কেন? —খিচুড়ীও হোক!

পতিত। (হাঁ—হাঁ রবে) তা হবে না, তা হবে না,—এত জিনিস খাবে কে? পয়সা নষ্ট করা তোমার একটা রোগ বৈত নয়। (একটু থামিয়া) তবে বন্ধু! তোমার যদি ইচ্ছা হয়ে থাকে, তা'হলে ভুনিখিচুড়ীই না-হয় হোক! তোমার কোন কাজে আমি বাধা দিতে পারি না!

সে রাত্রি সরুচাকুলি, লুচি, খিচুড়ি তিন রকমই হইল। পতিতের অন্তরের আশা পূর্ণ হইল। এমনটা শুনা গিয়াছে, আহারের পর তিনদিন পতিত কোন কাজকর্ম্মে বাহির হইতে পারে নাই। পতিত বলিত,—"পায়ে গেঁটে-বাত হইয়াছে।" বন্ধুবান্ধবগণ বলিত, "আহারের রাত্রি—অর্থাৎ ভোর বেলা—হইতে পতিতের এমন একটী ব্যারাম হইয়াছে, যাহার নাম করিলেই পতিত রাগিয়া উঠে।"

পতিতের নামে কালাচাঁদ এইরূপ আহারাদির উদ্যোগ করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল। প্রতিবেশিগণের মধ্যে যাহারা দীনদরিদ্র, যাহারা উদর পূর্ণ করিয়া কখন খাইতে পায় না, কালাচাঁদ তাহাদিগকে ধরিয়া-ধারয়া আনিয়া ভোজন করাইতেন। গৃহস্থ-ঘরের যে সকল দুঃখিনী রমণী, কালাচাঁদের বাসায় আসিয়া খাইতে সম্মত হইত না, পূজারি-ঠাকুরের দ্বারা কালাচাঁদ, তাহাদের লুচি সন্দেশ পাঠাইয়া দিতেন। বন্ধু পতিতপাবন, এ সব কার্য্যে বড়ই প্রতিবাদ করিত; বলিত,—"তোমার পয়সা রাখ্‌বার ত যায়গা নেই,—খাওয়াচ্চ কি না ভূতগুলাকে, আর পেতনীগুলাকে।" কালাচাঁদ বলিত,—"বন্ধু! এরা কখন লুচি সন্দেশ খেতে পায় না—এক দিন খাক্।"

বলা বাহুল্য, এরূপ দরিদ্র-ভোজনে কালাচাঁদের কোনও আড়ম্বর ছিল না। এদিকে পূজারি-ঠাকুর রন্ধনকার্য্য আরম্ভ করিলেন, ওদিকে কালাচাঁদ সন্ধ্যার পর ধীরে ধীরে বাহির হইলেন। গয়ারামের বাটী গিয়া দেখিলেন, চাঁদের আলোকে গয়ারাম বিচালির বড় পাকাইতেছে। অমনি আস্তে-আস্তে গিয়া, পশ্চাৎ হইতে গয়ারামের পিঠে দুই কীল। গয়ারাম ভয়ে চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, পশ্চাতে কালাচাঁদ। সে তখন আর কোন কথা কহিল না। নমস্কার করিয়া যোড়হাতে দাঁড়াইল।

কালাচাঁদ কহিলেন, "তুই এখনও ব'সে আছিস্—যা,—আমার ওখানে যা। বুঝেচিস্,—ছেলেপিলেকে নিয়ে যাস্।"

গয়ারাম যোড়হাতে প্রণাম করিয়া বলিল,—"যাচ্চি।"

বৃদ্ধ হলধর তাঁতির চিরদিনই অন্নকষ্ট। কালাচাঁদ গিয়া, তাহার চোখ টিপিয়া ধরিলেন। বুড়া ভয়ে "আঁউ মাঁউ', করিয়া উঠিল।

কালাচাঁদ। আমি কে, বল,—তবে চোখ্ খুলে দিচ্চি!

হলধর। আমি বুঝ্‌তে পাচ্চি না,—আপনি যে হও,—পায়ে পড়ি, চোখটা খুলে দাও—হাঁপিয়ে মরে গেনু—

কালাচাঁদ। সন্দেশ খাবি? ক গণ্ডা খাবি বল্?

হলধর। বুঝেচি—বুঝেচি—তুমি ঠাকুদ্দা—

কালাচাঁদ তখন হাসিয়া চোখ খুলিয়া দিলেন। বলিলেন,—এখনি যা—দৌড়ে যা—আমার বাসায় আজ ভারি মজা।

কালাচাঁদের নিমন্ত্রণ-প্রথা এইরূপই ছিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ একদিন তাঁহার তহবিল গণিলেন। দেখিলেন, আর ৫১ একান্নটী মাত্র টাকা মজুদ আছে। ভাবিলেন,—"ফুরাইয়া ত আসিল। ৫১ টাকায় আর কদিন চলিবে? হদ্দ—বড় জোর এক মাস। তার পর কি? অর্থ কোথা পাই? খাই কি?—খাওয়াই কি?

চাকুরি!—তা, যার কাছে যাই, সে-ই আমাকে দেখিয়া উপহাস করে। যে ব্যক্তি উপহাসের পাত্র, সে চাকুরির প্রস্তাব করিবে কেমন করিয়া? চাকুরির জন্য ত পাঁচ সাত স্থানে গমন করিলাম,—কিন্তু সর্ব্বস্থানেই যে, অবমানিত হইলাম।

পুনরায় তাঁহাদের নিকট যাই-না কেন? তোষামোদ করিয়া বলি,—আমাকে একটী চাকুরি দাও। তাঁহাদের পায়ে ধরিয়া পীড়াপীড়ি করি-না কেন?

পায়ে ধরিতে কোন ক্ষতি নাই,—কিন্তু ধরি কার? পায়ে ধরিবার উপযুক্ত পাত্র কৈ? যে কয়জন লোকের নিকট চাকুরীর উমেদারীতে গিয়াছিলাম,—তাঁহাদের সকলেই ভাগ্যবান্, ক্ষমতাবান, অর্থবান্ বটেন,—কিন্তু কেহই ত সৎস্বভাব-সম্পন্ন নহেন। মাথামুণ্ড কি আর বলিব,—সকল বেটাই চোর। ইহাঁদের মধ্যে কেহ হইলেন, লম্পটকুলচূড়ামণি; কেহ হইলেন, জালিয়াৎ-কুলতিলক; কেহ হইলেন, দস্যুবংশাবতংস; কেহবা সর্ব্বগুণধর;—তিনি হইলেন, লম্পটকুল-চূড়ামণি—জালিয়াৎকুলতিলক—দস্যুবংশাবতংস। এই সমস্ত পাপী পাষণ্ড ব্যক্তির সেবা করিতে আমি কিছুতেই

সক্ষম হইব না। এক পয়সা অর্থ উপার্জ্জন করিতে না পারি, তাও স্বীকার,—খাইতে না পাই, তাও স্বীকার,—ভিক্ষা করিতে হয়, তাও স্বীকার,—তথাচ আমি মূর্ত্তিমান্ মল-মূত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিতে সক্ষম হইব না।

আমি এখন সাধু, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়,—এই কয়মাস আমার চরিত্রে কলঙ্ক-কালিমা তিলমাত্রও স্পর্শ করে নাই,—আমি খাইতে-মাখিতে পাইব না; আর, এই ঠক-ঠেঁটা, লম্পট-শঠ লোকগুলা চিরদিনই পরমভোগে পরিতৃপ্ত হইতে থাকিবে,—ইহা কি কখন সম্ভবপর কথা? মাথার উপর ভগবান্ আছেন,—তিনি কি এসব দেখিতে পাইতেছেন না?

অবশ্যই ভগবান্ ইহার বিচার করিবেন। অবশ্যই আমি খাইতে পাইব।"

কালাচাঁদ আরও ভাবিতে লাগিলেন,—"এখন মোট মজুদ ৫১৲ টাকা। এইটীই এখন জীবন। এইটী ফুরাইলেই, ভগবান্ ভরসা।

একান্ন টাকায় একমাসের অধিক চলিবে না। ত্রিশদিন পরেই কি আমাকে "হা অন্ন! হা অন্ন"—বলিয়া, ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ফেলিয়া, লোকের দ্বারে দ্বারে বেড়াইতে হইবে? আচ্ছা, একটু কৃপণ হইনা কেন? অন্যান্য খরচ সমস্তই একেবারে বন্ধ করিয়া, কেবল নিজের উদর পূর্ণ করিনা কেন? তাহাতে আর কত খরচ লাগিবে? মাসিক চারি টাকা হইলেই ভাসিয়া যাইবে। এরূপ করিলে, এক বৎসরেরও অধিককাল নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি। কিন্তু তাহাতেই বা কি লাভ? এক বৎসর পরে ত আবার ঠিক সেই দশা!—সেই ভিখারীর ভাব—সেই ঝুলি—সেই হা-অন্ন—হা-অন্ন!

যদি অন্নের জন্য প্রকৃতই আমাকে ভিক্ষার ঝুলি বহন করিতে হয়, তবে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি? শুভস্য শীঘ্রং। একমাসের স্থানে আমি একবৎসর বৃথা অতিবাহিত করিব কেন?

কিন্তু সৎপথে থাকিলে, অর্দ্ধরাত্রে অন্ন হয়,—পণ্ডিতগণের মুখে কতবার এই কথা শুনিয়াছি। আমি কখনই নিরন্ন হইব না,—ইহাই আমার ধ্রুব বিশ্বাস।"

দেখিতে দেখিতে একমাসের মধ্যে কালাচাঁদের ৩৮৲ আটত্রিশ টাকা খরচ হইল। সংক্রান্তির দিন হাতে নগদ ১৩৲ তেরটী টাকা রহিল। সেই দিন কালাচাঁদ কাঙ্গালী-ভোজন করাইলেন। মোটাচেলের ভাত, কড়ায়ের ডাল, কুমড়ার তরকারি, এবং মাছের অম্বল,—বন্দোবস্ত হইল। দুইশত কাঙ্গালী বসিয়া খাইল। পূর্ণ-মাত্রায় আহার করিয়া, পরম-পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া, কাঙ্গালিগণ কালাচাঁদের জয় গাহিতে-গাহিতে প্রস্থান করিল। সকলে চলিয়া গেলে, কালাচাঁদ, পণ্ডিতকে বলিলেন, "বন্ধু! তুমি একবার উঠানের মধ্যস্থলে দাঁড়াও।"

পণ্ডিত। কেন, কেন? কি হয়েচে?

কালাচাঁদ। একবার দাঁড়াওই-না ছাই?—

পণ্ডিত দাঁড়াইল।

কালাচাঁদ অমনি এক বকুনা কড়ায়ের ডাল আনিয়া পণ্ডিতের মাথায় ঢালিয়া দিল।

পণ্ডিত। কর্‌চো কি বন্ধু! কর্‌চো কি?

কালাচাঁদ। বন্ধু! কেমন শোভা হইয়াছে, দেখ দেখি?

পার্শ্বস্থগণ উচ্চ-হাসি হাসিল। কালাচাঁদ কিন্তু হাসিলেন না। পণ্ডিত একটু রাগ করিয়া উঠিল। বলিল,—সন্ধ্যাবেলা আবার

নাইতে হবে,—দেখ্‌চি। এমন কাজও করে কি? সর্দ্দি হ'য়ে মারা পড়ুবো আর কি।

কালাচাঁদ। বন্ধু! রাগ ক'রো না।—আজই শেষ। আর কখন এমন দিন হবে না। আজ এ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি হ'লো।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ যে, অদ্য কপর্দ্দক-শূন্য হইলেন, পতিত তাহা জানিত না। একা পতিত কেন, এ সংবাদ কেহই অবগত ছিলেন না। তখনও লোকের ধারণা ছিল,—কালাচাঁদের হাতে অনেক টাকা আছে।

কালাচাঁদ ঠিক এক ভাবেই আছেন। অর্থযুক্তকালে, যে ভাব,—এখন, অর্থহীনকালেও তাঁহার সেই ভাব! কিছুতেই দৃক্‌পাত নাই।

সংক্রান্তির দিন হইতেই মুদির দোকানে ধার আরম্ভ হয়। ক্রমে ধারেই সংসার চলিতে লাগিল। এক মাস কাল ধারে উঠনা দিয়া, পর মাসের প্রথম দিবসেই মুদি, কালাচাঁদের কাছে তাগাদায় আসিল।

কালাচাঁদ কহিলেন,—"আমার হাতে এখন কিছু নাই।"

মুদি। তা, থাক্—তা, আজ থাক্—যে দিন আপনার সুবিধা হবে, সেই দিনই দিবেন। টাকার জন্য, এসে যাচ্ছে কি? আপনি অতি মহাশয় ব্যক্তি।

মুদি চলিয়া গেল। আবার দশ দিন পরে তাগাদায় আসিল। বলিল,—"আজ কিছু কি অনুগ্রহো ক'রবেন? পাইকেরের কাছ থেকে গুড় কিনেচি,—সব টাকা জোটাতে পারি নি—পাইকেরকে দোকানে বসিয়ে রেখে, আপনার কাছে এসেচি।"

কালাচাঁদ। টাকা কড়ি, বাপু! আমার হাতে কিছুই নাই।

মুদি। কিছু দিন্‌না,—নিদেন পাঁচটা টাকাও দিন্‌না? বাকী টাকা দশ দিন পরে দিলেই হবে। তা' আপনার কাছে ত আমার টাকার ভাবনা নেই।

কালাচাঁদ। ৫৲ টাকা দূরে যাউক, পাঁচটী পয়সা আমার হাতে নাই।

মুদি। তবে আমি টাকার জন্ত কবে আস্‌বো?

কালাচাঁদ। তাইবা ঠিক কেমন ক'রে বল্‌বো? তোমাকে আর আস্‌তে হবে না। টাকা হাতে এলেই, তোমাকে আমি পাঠিয়ে দিব—

মুদি। কি জানেন,—আমরা গরীব মানুষ,—পুঁজি-পাটা কম। এতটাকা আপনি যদি ফেলে রাখেন, তবে আমি দোকান চালাই কেমন করে? আমরা নগদ আনি, নগদ বেচি। আপনাদের দোয়ার থেকে দু-পয়সা নিয়ে গুজরান করি। তা, আজ কিছু না-হয় টাকা দিন্‌,—

কালাচাঁদ। বাপু! আজ একটী পয়সা থাকিলেও তোমাকে দিতাম,—

মুদি। আপনি যদি এমন করেন, তবে আর কোথা থেকে উঠনো যোগাব?

কালাচাঁদ। ইচ্ছা না হয়,—আর যোগাইও-না।

মুদি। আমি তা বল্‌চি না,—আমি আর পাবো কোথা,—তাই বল্‌চি।

কালাচাঁদ। সেই কথাত আমিও বল্‌চি—

মুদি। আমি, মোশাই! পরশু তারিখে আস্‌বো—কিছু আমাকে যোগাড় ক'রে দিবেন। আমি আপনার উঠ্‌নো বন্ধ কর্‌বো না—

কালাচাঁদ। তুমি উঠ্‌নো বন্ধই কর আমি এ কথা রাগ ক'রে বল্‌চি না—

মুদি। আমি যদি উঠ্‌নো বন্ধ করি,—তবে আপনাকে ত নগদ চাল-ডাল কিনে আন্‌তে হবে।

কালাচাঁদ। পয়সা না থাকিলে, নগদ কিনিব কেমন করিয়া?

মুদি। আপনার সঙ্গে অনেক দিন থেকে লেন্‌-দেন, আলাপ-পরিচয়, তাই আমি ধারে দিতে পার্‌বো। অন্য কেহ ত ধারে দিবে না।

কালাচাঁদ। নাইবা দিলে?

মুদি। তখন ত নগদ পয়সা বা'র কত্তে হবে।

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) তোমার ত বড় আশ্চর্য্য কথা শুনচি। মোটেই পয়সা না থাক্‌লে, কোথা থেকে নগদ পয়সা বার্ কর্‌বো?

মুদি। তবে, চাল-ডাল কোথা থেকে আস্‌বে—বলুন।

কালাচাঁদ। কোথাও থেকে আস্‌বে না—

মুদি। তার পর!—

কালাচাঁদ। তার পর আবার কি?—

মুদি। খাওয়া-দাওয়া চল্‌বে কোথা থেকে?

কালাচাঁদ। কেথাও থেকে চল্‌বে না। আমি উপ'স করে থাক্‌বো।

মুদি। সে কি কথা?

কালাচাঁদ। আমার কথায় দোষ কি হইল?

মুদি। না খেলে মানুষ বাঁচে কি?

কালাচাঁদ। না,—বাঁচে না।

মুদি। তবে?—

কালাচাঁদ। আমি বাঁচিব না।

মুদি। হাসিল।

কালাচাঁদও হাসিলেন।

যাত্রাকালে মুদি বলিল, "পরশু দিন আমি আস্‌চি,—সে দিন কিছু টাহা যোগাড় ক'রে আমাকে দিবেন। সেদিন আর ফির্‌বো না।"

কালাচাঁদ মনে মনে কেবল হাসিলেন; কোন কথা কহিলেন না।

মুদি কালাচাঁদের উঠ্‌না বন্ধ করিল না,—পর দিন যথানিয়মে সামগ্রী-পত্র পাঠাইয়া দিল। বরং অন্যদিন অপেক্ষা উত্তম উত্তম সামগ্রী পাঠাইল। অদ্যকার ওজন কম'ত নহে-ই, বরং খর-খর।

পরশ্ব দিন শীঘ্রই আসিল। মুদিও আসিয়া সমুপস্থিত হইল। কালাচাঁদ শুইয়া ছিলেন; মুদীকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। হাসি-হাসি মুখে মুদীকে বলিলেন,—"এস, এস—ভাল হয়ে ব'সো।"

সমাদর দেখিয়া মুদী ভাবিল,—আজ নগদ টাকা।

কালাচাঁদ মুদীকে আপ্যায়িত করিয়া, জিজ্ঞাসিলেন,—"আমি যদি আজ টাকা না দি, তা'হইলে তুমি কি কর?

মুদি একটু হাসিল। ভাবিল, "সে দিন কিছু কড়া তাগাদা হয়েছিল কি না,—তাই বাবু আজ টাকা মজুদ রে'খে, আমার সঙ্গে তামাসা কচ্চেন।" মুদি প্রকাশ্যে বলিল,—"আপনারা ভদ্দর লোক; আপনারা যদি টাকা দিতে দেরী করেন, তা'হলে আপনাদিগে কি আর বল্‌বো?—আর, আমি আপনাদের কয়্‌বোই বা কি? নিতান্ত চলে না ব'লেই,—তাগাদায় আস্‌তে হয়।

কালাচাঁদ। কিছুই ব'লবে না!

মুদি। আজ্ঞে, তা কি কিছু ব'ল্‌তে পারি?

কালাচাঁদ। বাপু! আমি একটী পয়সাও দিতে পারবো না। আজও আমার একটী পয়সাও যুটে নাই।

মুদি। (বিস্ময়ে) বলেন কি মোশাই?

কালাচাঁদ। তুমি আর কেন কথা ক'চ্চ বাপু!—তুমি কেন চুপ ক'রে উঠে চলে যাও না?

মুদি। তা'হ'লে যে, মোশাই! আমার সর্ব্বনাশ হবে! দোকান বন্ধ হয়ে যাবে।

কালাচাঁদ। আবার কথা ক'চ্চ! তুমি এই মাত্র ব'লে যে, টাকা না পেলে তুমি কোন কথা কবে না! তবে কেন, বাপু! কথা কও?

মুদি। (ক্রোধভরে) সে কি মোশাই?—আপনারা ভদ্দর লোক। আমরা মুরুক্ষু মানুষ। আমরা কি এত কথার কাটা-কাটি বুঝ্‌তে পারি?—আপনি এখন টাকা দিবেন কি না বলুন?—ভদ্দর লোক হয়ে, এমন ক'রে টাকা ফাঁকি দিতে আছে কি?

কালাচাঁদ। (মিষ্টস্বরে) বাপু! তুমি কি আমাকে কিছু গাল্ দিতে ইচ্ছা করেচো?—তা, দাও, কিছু বল্‌বো না,—মনের সাধে গাল দাও।

মুদি। গাল্ কে দিচ্চে? আমাদের কারবার যত ভদ্দর লোকের সঙ্গে। আমরা গালাগালি জানি না—কখন করিও না। সে-যা'হোক—মোশাই! টাকা দিন্। টাকা না পেলে আজ আমি আর ছাড়্চি না—

কালাচাঁদ। ছাড়িয়া কাজ কি? আমাকে লইয়া কি করিতে হয়,—কর।

মুদি। আমি আপনার সঙ্গে বাক্‌চাতুরী কত্তে আসি নাই। উঠুন্—উঠুন্—টাকা দিন্।

কালাচাঁদ। যদি উঠিলেই টাকা মিলিত, তাহা হইলে, আমি এতক্ষণ দশহাত উর্দ্ধে লাফাইয়া উঠিতাম।

মুদি। আপনি সোজা কথায় দিবেন কি না, বলুন?

কালাচাঁদ। আমি সোজা কথায়ও দিব না,—বাঁকা কথায়ও দিব না। বাপু! টাকা নাই,—কোথা থেকে দিব? তুমি রাগ করো না। টাকা হলেই পাঠিয়ে দিব।

কালাচাঁদ যত নরম সুরে, মিষ্টি করিয়া মুদিকে বুঝাইতেছেন,—মুদি তত চড়িয়া-চড়িয়া উঠিতেছে। চড়িয়া-চড়িয়া ক্রমশ অন্তিমে উঠিয়া, মুদি বলিল,—"ভদ্দরলোক ব'লে তোমাকে এতক্ষণ কিছু বলি নাই। তুমি জানো,—আমার নাম হরিহর মুদি? তুমি আজ টাকা না দিলে, গলায় গামছা দিয়ে টাকা আদায় কর্‌বো—"

মুদি এত শক্ত কথা বলিলেও, কালাচাঁদের রাগ হইল না। কালাচাঁদ অধমর্ণ,—মুদি উত্তমর্ণ। মুদির এখন যা-খুসি-তাই বলিবার অধিকার আছে। ইহাই কালাচাঁদের ধারণা। এইরূপ জ্ঞান ও বিশ্বাসে, তাঁহার কিঞ্চিন্মাত্র ক্রোধের উদয় হইল না। তিনি ধীরভাবে মুদিকে কহিলেন, বাপু! আজ তুমি আমার বুকে

বসিয়া গলায় গামছা বাঁধিলেও আমি কিছু বলিব না। কিন্তু গলায় গামছা দিলেই কি টাকা আদায় হইবে? আমাকে কাটিয়া দ্বিখণ্ড করিলেও, তোমার এক পয়সা আদায় হইবে না। আমার আছে কি?—যদি কিছু পিত্তল-কাঁসার জিনিসও থাকিত, তাহা হইলে, আজ তোমাকে তাহা দিয়া বিদায় করিতাম। মুদি! তোমাকে প্রকৃতই বলিতেছি, আমার কিছুই নাই। বরং তুমি আমার ঘর খুঁজিয়া দেখ—কিছু আছে কি না? আমি এই এক-বস্ত্র পরিয়া আছি আমার দ্বিতীয় বস্ত্র নাই। আর একখানি শতধা-ছিন্ন চাদর আছে। গঙ্গা-স্নানের পর, ঐ চাদরখানি পরিয়া, আমার কাপড় শুখাইতে দি। একটী জল খাবার লোটা মাত্র অবশিষ্ট আছে। ইচ্ছা হয়, তুমি লোটাটী লইয়া যাও। মুদি! আমার ভাত খাইবার থালা-পাথর নাই,—জল খাবার গেলাস-ঘটী নাই, পাতিয়া শুইবার বিছানা পর্য্যন্ত নাই। আছে, এক ছেঁড়া মাদুর, এক পিতলের লোটা, আর এই কাপড় এবং ঐ চাদরখানি। ইহার মধ্যে তুমি কি লইবে বল?"

মুদি "থ" হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তখন কালাচাঁদের কি যেন কথা একটা স্মরণ হইল;—এইরূপ ভাব দেখাইয়া, তিনি দ্রুতগতিছন্দে বলিতে আরম্ভ করিলেন;—"ও হোঃ!—বড় মনে পড়েচে! একখানি তলোয়ার আছে, আমার কাছে। সেই তলোয়ারের নূতন বেলায় দাম ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার কম নহে। ভাল জিনিস। এক চোটে বাঘ বলি দেওয়া যেতে পারে। সেই তলোয়ারখানি পণ্ডিত নিয়ে রান্না-ঘরে, রেখে দিয়েচে। একটু ব'স—ঐ রান্না-ঘরে আছে, শিগ্‌গির আনচি আমি।"

কালাচাঁদ। তৎক্ষণাৎ লম্ফ দিয়া রন্ধনশালায় গেলেন। সেই চক্‌চকে তলোয়ার সবেগে ঘুরাইয়া আসিতে-আসিতে কালাচাঁদ বলিতে লাগিলেন, "মুদি! বড় সরেস্ তলোয়ার! খুব হাল্‌কা।—ইহা বেচে, তুমি—"

কালাচাঁদকে আর অধিক কথা কহিতে হইল না। কালাচাঁদের সেই ভীষণ কৃষ্ণমূর্ত্তি,তীক্ষ্ণধার তরবারির সেই উজ্জ্বলদ্যুতি—দেখিয়া মুদির প্রাণ উড়িয়া গেল। মুদি ভাবিল,—"কালাচাঁদের গলায় আমি গামছা দিব বলিয়াছি;—কালাচাঁদ, সেই রাগে, আমাকে খুন করিবার জন্য, কৌশলে এখানে বসাইয়া রাখিয়া ঐ তলোয়ার আনিতেছে।" কালাচাঁদকে তদবস্থায় তলোয়ার ঘুরাইতে দেখিয়া, মুদি "বাপ্!—বাপ্‌রে!—মেরে ফেল্লেরে!" রবে দৌড়িয়া পলাইল।

সেই তরবারি হস্তে করিয়া কালাচাঁদও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। মুখে উচ্চকণ্ঠে মুদিকে বলিতে লাগিলেন,—"ভয় কি? পালাও কেন?—এ তলোয়ার বেচিলে, অন্তত তোমার পঁচিশ টাকা নিশ্চয় হবে—"

তখন সে কথা আর কে শুনে? মুদি প্রাণভয়ে "বাপ্, বাপ্" ধ্বনিতে দিগন্ত পূর্ণ করিয়া ভীমবেগে দৌড়িল। কালাচাঁদ মুদির পশ্চাৎ পশ্চাৎ খানিক গিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

মুদি নিজ পল্লীমধ্যে রাষ্ট্র করিল, "উঠ্‌নার টাকা চাহিতে যাওয়ায় কালাচাঁদ তাহাকে কাটিতে আসিয়াছিল। তলোয়ার উঁচাইয়া পথ পর্য্যন্ত পেছু পেছু ছুটিয়াছিল।" এই কথায় সেদিন-সেরাত্রি সে পাড়াটি খুব গরম হইয়া রহিল।

অনতিবিলম্বে পতিতপাবনের কর্ণকুহরে এ কথা প্রবেশ করিল। পতিত তখন ঠাকুরদাদার গৃহে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে,—চড়কে তাঁহার নিকট টাকা বক্‌শীশ পাইয়াছে,—ভবিষ্যতে আরও অনেক টাকা পাইবার আশা করিয়া বসিয়া আছে।

কালাচাঁদ যে সম্বল-বিহীন, পতিত এখন তাহাও বুঝিয়াছে। কালাচাঁদের যে, সমস্তই ঐন্দ্রজালিক কাণ্ড, তাহাও পতিতের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে। পতিত, কালাচাঁদকে প্রত্যহ একসের করিয়া দুধ বিনামূল্যে খাইতে দিত। বলিত,—"গো-দুগ্ধ বেচিতে নাই ;—মূল্য কিছুতেই লইব না।" কালাচাঁদ, পতিতকে অন্যরূপে সে দুগ্ধের দামের দ্বিগুণ পোষাইয়া দিতেন। আজ প্রায় পনের দিন হইল, পতিত, কালাচাঁদকে সে দুগ্ধ দেওয়া বন্ধ করিয়াছে।

ক্রমশ পতিতের ইচ্ছা হইল, কালাচাঁদ তাহার বাসায় আর না থাকেন। কিন্তু সে, ভয়ে একথা কিছুতেই মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিত না। কালাচাঁদ যেরূপ গোঁয়ার-গোবিন্দ লোক, তাহাতে যদি রাগিয়া উঠিয়া, পতিতকে একটা চড়াইয়া দেন,—ইহাই তাহার ভাবনা হইয়াছিল।

পয়সা-শূন্য কালাচাঁদকে তাড়াইবার জন্য, পতিত ঠাকুরদাদার

সঙ্গে ক্রমে বেশী ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ করিল। ওদিকে যতবেশী ।ব হয়, এদিকে কালাচাঁদের সঙ্গে তত ভাব কমে। এমন কি,—ক্রমশ কথাবার্ত্তা পর্য্যন্ত বন্ধ হইবার উপক্রম হইল।

অদ্য তরবারি-ঘটিত ব্যাপার শুনিয়া পতিত বড়ই ভীত হইল। ভাবিল,—"কালাচাঁদের হাত হইতে তলোয়ার খানি ভুলাইয়া লইবার উপায় কি?—আমি নিজে যাইয়া চাহিব কি? বাপ্! বাঘের মুখে কে যাবে? বাঘ কিন্তু আমার পোষা। আমাকে সে কিছুই বলে না। মুদির নিকট আগে একবার যাইয়া নিজের কাণে সকল কথা শোনাই উচিত।"

এইরূপ ভাবিয়া, পতিত, হরিহর মুদির দোকানে উপস্থিত হইল। দোকানে বসিয়া, পতিত প্রাণ ভরিয়া কালাচাঁদের নিন্দা আরম্ভ করিল। সেই নিন্দাবাদ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত, তাহার চতুর্দ্দিকে বহু লোক দাঁড়াইল। এই পৃথিবীমধ্যে কালাচাঁদের ন্যায় মন্দ লোক আর দ্বিতীয় নাই,—ইহাই পতিত প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল। এমন সময় একজন লোক আসিয়া হরি মুদির হাতে একখানি পত্র,—এবং সেই তরবারি,—প্রদান করিল। পত্রলেখক কালাচাঁদ। পত্রে লিখিত আছে,—"তুমি বড় ভুল বুঝিয়াছ। পালাইলে কেন? তরবারি পাঠাইলাম। বেচিয়া যাহা দাম হয়, লইও। অবশিষ্ট দেনা,—হাতে টাকা আসিলে, অগ্রে শোধ দিব।"

তরবারি দেখিয়া, পতিত চমকিয়া, লাফাইয়া উঠিল। ভাবিল, "আমি তরবারির ভয়ে নিজের ঘর ছেড়ে এখানে পালিয়ে এসেচি,—কিন্তু তরবারি যে, আমাকে ছাড়ে না;—আমার সঙ্গে সঙ্গে এখানেও এসে পড়্‌লো। এস্থানে আর থাকা হবে না।"

তরবারির আগমনে পতিত তৎক্ষণাৎ তথা হইতে উঠিয়া পড়িল। ভয়ে সেদিন আর আহার করিল না। কালাচাঁদের সহিতও সাক্ষাৎ করিতে সাহস হইল না। রাত্রে শুইয়া-শুইয়া কেবল ভাবিল,—"এ বাড়ী হইতে কালাচাঁদকে তাড়াইবার উপায় কি?"

তার পর যে ঘটনা ঘটে, তাহা পাঠক অবগত আছেন। ঠাকুর-দাদার নিকট হইতে প্রশ্রয় পাইয়া, তাঁহার সাহসে সাহসী হইয়া, পতিত অর্দ্ধভুক্ত কালাচাঁদকে বেলা তৃতীয় প্রহরে গৃহত্যাগ করিতে আদেশ করিল।

গৃহত্যাগের পর কালাচাঁদ যাহা যাহা করিলেন,—গঙ্গার ঘাটে বসিয়া যেরূপ ভাবিলেন; 'চুরি করায় দোষ নাই'—যেরূপে ঠিক করিলেন;—তাহা অবশ্যই সকলেরই মনে আছে। কিন্তু লাঠিদ্বারা কাছারির ঘাটের লণ্ঠন ভাঙ্গার পর, সে রাত্রি কালাচাঁদ যে, কোথায় কিরূপে অতিবাহিত করিলেন, তাহা পাঠক জানেন না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

কোন প্রহরী জাগ্রত আছে কি-না,—ইহা পরীক্ষা করিবার জন্যই কালাচাঁদ লণ্ঠন ভগ্ন করেন। প্রহরী সমস্ত—যেন ঠিক এক-একটী মূর্ত্তিমতী নিদ্রা। কুঞ্জর-পদতলদ্বারা মর্দ্দিত হইলেও, সহসা ইহাদের নিদ্রাভঙ্গ হয় কি-না সন্দেহ। ইহারা জাগিয়া থাকিবার জন্য মাহিনা পায়,—চোর ধরিবার জন্য মাহিনা পায়,—দুর্ব্বল ব্যক্তিকে প্রবলের উৎপীড়ন হইতে রক্ষা করিবার জন্য মাহিনা পায়;

ইহারা মাসে মাসে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে মাহিনাটী বেশ বুঝিয়া লয়,—কিন্তু কাজের বেলায় কেবল ঘুম,—মহাঘুম। যেটী করিতে নিষেধ, সেইটীই করে। ইহাদের ন্যায় বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি ত সংসারে আর দেখি না। ঠাস্ করিয়া গালে চড়ই—ইহার উপযুক্ত ঔষধ।

কালাচাঁদ সেই গভীর নিশীথে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ব্রাঞ্চ-স্কুল-ভবনের প্রাচীরে গিয়া উপবেশন করিলেন। তখন প্রাচীর এত উচ্চ ছিল না। তিনি চ'কের বাজারের দিকে লোলুপ-দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ক্ষুধায় তাঁহার জঠর জ্বলিতেছে। মন "কিখাই, কিখাই"—করিতেছে। সম্মুখেই ভোলা ময়রার দোকান। কালাচাঁদ ভাবিলেন,—"এ দোকানে ত সবই আছে;—সন্দেস, মিঠাই, জিলিপি, রসগোল্লা,—লুচি, কচুরি, নিমকি,—ক্ষীর্ ছানা, মাখন—এ দোকানে নাই কি? ভোলানাথ প্রধান দোকানদার। হুগলী-সহরস্থ প্রায় অধিকাংশ বড়লোকের বাড়ী ভোলানাথ মিষ্টান্ন যোগাইয়া থাকে। অবশ্যই এই দোকানে নানাবিধ মুখপ্রিয় সরস সামগ্রী আছে। দোকান-ঘরের চাবি ভাঙ্গিয়া, উদরপূর্ণ করিয়া আহারাদিপূর্ব্বক একটু সুস্থ-শান্ত হই;—তারপর টাকা কড়ির চেষ্টা করা যাইবে।"

এই ভাবিয়া কালাচাঁদ তথা হইতে উঠিলেন। ভোলা ময়রার দোকানে গিয়া চাবিতে হাত দিলেন। আবার ফিরিয়া আসিলেন। একটু দাঁড়াইয়া, চকের বাজারের মধ্য-রাস্তা দিয়া খানিক উত্তরমুখে গেলেন। অনেকটা দূর গিয়া দেখিলেন,—একজন রাজ-প্রহরী বসিয়া-বসিয়া ঘুমাইতেছে, অনন্ত নাসিকাধ্বনিও হইতেছে। মাঝে মাঝে তাহার মাথা ঢলিয়া-ঢলিয়া পড়িতেছে; নিদ্রিত অবস্থাতেই সে আবার মাথাটী ঠিক সোজাভাবে রাখিতেছে। কালাচাঁদ প্রায়

পাঁচ মিনিটকাল দাঁড়াইয়া, প্রহরীর সেই অপূর্ব্বভাব, নয়ন ভরিয়া অবলোকন করিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"ওঃ, অভ্যাসের কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা! এই লোকটা ঘোর-নিদ্রায় অভিভূত—অথচ ঠিক সোজা হইয়া বসিয়া আছে,—মাথা টলিয়া পড়িতেছে, অথচ নিদ্রিতাবস্থাতেই আবার তাহা তুলিয়া সোজা করিতেছে। কর্ম্মে সুদক্ষ বটে! বোধ হয়, এ ব্যক্তি এই নাসিকা-ধ্বনিদ্বারা কোম্পানীর লুন খাওয়ার গুণ গাহিতেছে। ওহে কনষ্টবল-সাহেব! তোষক বালিস আনিয়া দিব কি? বসিয়া থাকিতে কষ্ট হইতেছে না ত?"

কালাচাঁদ তথা হইতে প্রত্যাগত হইয়া পুনরায় ভোলাময়রার দোকানের নিকট আসিলেন। আবার চাবিতে হাত দিলেন। আবার ফিরিলেন। ঠিক্ চৌমাথার মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। অর্দ্ধ-স্ফুট স্বরে অন্তরের কথা আপন মনে কহিতে লাগিলেন,—"ভোলানাথ আমার অপরাধ লইও না। আমি চোর হইয়াছি। চুরি-ব্যবসা আরম্ভ করিয়াছি। এ ব্যবসা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সুচারুমতে চালাইতে পারিলে, আমি ইহা দ্বারা সহজেই রাজা হইতে পারিব। আজ যাহা তোমার দোকান হইতে লইব, রাজা হইয়া তাহার মূল্য আমি সুদ-সুদ্ধ শোধ দিব। ভাই! কিছু মনে করিও না। আর তোমার মনেই বা বিশেষ কষ্টানুভব হইবে কেন? তোমারও ত অধিকাংশ চোরাই মাল! তুমি সর্ষপ-তৈলে জিলিপি ভাজিয়া অনেক লোককেই তাহা ঘৃত-পক্ক বলিয়া বিক্রয় কর। একসের সন্দেশ কেহ কিনিতে আসিলে, তাহাকে ভুলাইয়া চৌদ্দ ছটাক দাও। তোমার ঘরে বাটখারা তিন রকম আছে। এক রকম, ঠিক ওজন,—একসের। ২য় রকম, কম ওজন,—১৫ ছটাক। তৃতীয় রকম বেশী ওজন ১৭ ছটাক। কোন জিনিস যখন

তুমি অন্যের নিকট হইতে মাপিয়া লও,—তখন সেই ১৭ ছটাককেই সের বল। তুমি অন্যকে যখন কোন জিনিস বিক্রয় কর, তখন সেই ১৫ ছটাককেই সের বল। যদি কখন ধরাধরি, কড়াকড়ি হয়,—তুমি এই ভয়ে ঘরে ঐ ষোল ছটাকের সেরটী রাখিয়া দিয়াছ। তুমিওত ভাই! চোর। তবে আর আমার উপর রাগ করিবে কেন? তুমি হইলে, ক্ষুদ্র-চোর, উঞ্ছ-চোর,—আমি হইলাম, চোর-রাজ। প্রধান সেনাপতির নিকট সামান্য পদাতি যেরূপ, আমার নিকট তুমিও সেইরূপ। ফল কথা,—উভয়ের বৃত্তি একই। সে যাহাই হউক,—ভাই! তুমি মনে কিছু দুঃখ করিও না। তোমার দোকানে মিষ্টান্নের মধ্যে যাহা কিছু আমার ভাল লাগিবে, তাহাই আমি খাইব;—যত পারিব, উদর পূরিয়া ততই খাইব। ভাই! মনে কিছু করিও না। তোমার দোকানে নগদ যদি টাকা পাই,—তাহাও লইব। বেশী লইব না, আবশ্যক মত লইব। ভাই! মনে কিছু করিও না। যতশীঘ্র পারি, তোমার টাকা শোধ দিব। আজ আমার ক্ষুধা প্রবলা। আর থাকিতে পারিতেছি না।

গা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। ভাই! ভোলানাথ! চাবি ভাঙ্গিতে চলিলাম,—কিছু মনে করিও না।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ পুনরায় চাবিতে হাত দিলেন। একবার চাবিটী নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিলেন। দক্ষিণ হস্তের দৃঢ়-মুষ্টিতে চাবি ধরিলেন। ধরিয়া, এদিক-ওদিক চাহিলেন। তারপর, অমনি চাবিতে এক মোচড়! সুর্‌সা সহিত চাবি ভাঙ্গিয়া কালাচাঁদের হাতে আসিল। ভগ্ন-চাবি কালাচাঁদ নর্দমায় ফেলিলেন।

কালাচাঁদ সন্দেশের ঘরে ঢুকিলেন। ঘর অন্ধকার। কোথায় কোন্ দ্রব্য আছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। বিলাতী দেশ্‌লাই থাকিলে, এ সময় কালাচাঁদের সুবিধা হইত। কিন্তু তখন এ দেশে বিলাতী-দেশ্‌লায়ের এরূপ ভাবে আমদানি হয় নাই। তখন ব্যবস্থা ছিল—চকমকির। 'ইস্পাত' দিয়া ঠুক্ করিয়া চকমকির পাথর একবার ঠুকিলেই সোলায় আগুন পড়িত। সেই সোলায়, টীকা বা কয়লা ধরাইতে হইত। টীকা ধরিলে, দিশি-দেশালায়ের সাহায্যে প্রদীপ জ্বালা হইত।

কালাচাঁদ নূতন ব্রতী। চৌর্য্য-কার্য্যে নিতান্ত নূতন ব্রতী না হইলেও, এরূপ চাবি ভাঙ্গিয়া রাত্রিকালে চৌর্য্য-কার্য্যে নূতন ব্রতী বটেন। তিনি জানিতেন না যে, চোরের সঙ্গে অগ্নি থাকা একান্ত আবশ্যক। অনভিজ্ঞ বলিয়াই,—তিনি অগ্নি বা কোনরূপ আলোক, সঙ্গে করিয়া আনেন নাই। বলাবাহুল্য, তিনি এ বিষয়ে কোন 'খেয়াল' করেন নাই,—ঘর খুলিলেই রসগোল্লা,—ইহাই তাঁহার ধারণা ছিল;—কিন্তু ঘর খুলিলেই যে, অন্ধকার,—ইহা তিনি ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

সুবিধার মধ্যে, তখনও থাকিয়া থাকিয়া এক একবার ঈষৎ বিদ্যুৎ চমকিতেছিল। যদি মেঘে মেঘে ঘোরতর সংঘর্ষণ হইয়া, এ সময় ভীষণা চপলা চমকিয়া বজ্রাঘাতও হইত, তাহা হইলে কালাচাঁদের আরও সুবিধা ঘটিত। কেন না, তিনি এখন চাহেন—অধিক আলোক!—তা, বজ্রাঘাতও না-জানি, মহাপ্রলয়ও না-জানি!

দুঃখ এই, বজ্রাঘাত হইল না;—মেঘের কোলে বসিয়া সৌদামিনী মাঝে মাঝে কেবল মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। মন্দের ভাল বটে। কালাচাঁদের কিঞ্চিৎ সুবিধা হইল। অদূরে চক্‌মকি নজর হইল। পাথর, সোলা, ইস্পাত, কয়লা—সমস্তই তিনি আভাসে দেখিতে পাইলেন। গুড়ি মারিয়া যাইয়া, তিনি হাতড়াইয়া চক্‌মকি ধরিলেন। ধরিয়া, ভাবিলেন,—লাভ যে কিছুই হইল না দেখিতেছি। চক্‌মকি ঠুকিব কেমন করিয়া? ঠুকিলেই যে, শব্দ হইবে। রাত্রিকালে, চোর চুরি করিতে আসিয়া, গৃহস্থের গৃহে বসিয়া চক্‌মকি ঠুকিবে কেমন করিয়া? আর, এই ঘরের দ্বারইবা কতক্ষণ খোলা রাখিব? দরজা এখনি বন্ধ করিয়া দেওয়াই উচিত? কিজানি যদি কোন পথিক এপথ দিয়া চলিয়া যায়,—তাহা হইলেত আমাকে ধরিয়া ফেলিবে। ধরিতে অবশ্যই পারিবে না। তবে আহারটা হইবে না—এইমাত্র।

কিন্তু দরজা বন্ধ করিয়া দিলেত,—ঘরটী ঘোর অন্ধকারময় হইবে। আমি এই আঁধার রাশির মধ্যে একা নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়াইবা কি করিব?

চক্‌মকিও ঠোকা হইবে না, দরজাও বন্ধ করিতে হইবে,—অথচ চাই আলোক। এ-মহাসমস্যার কেমন করিয়া মীমাংসা করিব?

আচ্ছা, হাঁড়িগুলা হাতড়াইয়া দেখি না কেন? মিষ্টান্নপূর্ণ একটা হাঁড়ি পাইলেই আমার যথেষ্ট হইবে!

কিন্তু এক ভয়! কোথায় কি আছে, কিছুই জানি না। কোন্ জিনিস কিরূপ ভাবে সাজান আছে, তাহাও অবগত নহি। যদি হাতড়াইতে হাতড়াইতে হাঁড়িগুলা হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া যায়—তাহা হইলে ত সর্ব্বনাশ। অথবা অন্ধকারে আমি যদি রসের ডাবার ভিতর দুম্ করিয়া পড়িয়া যাই,—তাহা হইলে, সে-ও এক কম ব্যাপার হইবে না।

আরও এক বিষম অভাব দেখিতেছি যে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে। জল কোথা পাই? আগে জল চাই! সুধু সন্দেশ লইয়া কি করিব? সন্দেসগুলা খাইলে ত আরও অধিক পিপাসা পাইবে। সন্দেসইবা গলাধঃকরণ হইবে কেন?

কালাচাঁদ কাতর হইলেন। এসময় কি যে করিবেন,—তাহার কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। একবার ভাবিলেন,—বাহির হইতে একটা আলোর যোগাড় করিয়া আনি না কেন? কিন্তু এরাত্রে আলোক কোথায় পাইব? গৃহস্থকে গিয়া কি বলিব,—'অগো! আমার চুরির ভাল সুবিধা হইতেছে না, তোমরা একটা আলো দাও?' তাও কি কখন হয়?—আর, এরূপ যোগাড়যন্ত্র করিতেই যে, রাত পোহাইয়া যাইবে।

ক্ষুৎপিপাসাশ্রমাতুর কালাচাঁদ বিষম সঙ্কটে পতিত হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন,—এমন সময় আবার সৌদামিনী ঝলসিল। কালাচাঁদ দেখিলেন, তাঁহার ঠিক বামপার্শ্বেই উনান। উনানে আগুন নাইত?—একটুও কি আগুন থাকিবে না? কালাচাঁদ বসিলেন। উনানের ভিতর হাত দিলেন। কৈ উনান-ত বেশী গরম নয়? তবে

কি হতভাগার অদৃষ্টে কিছুতেই আজ আগুন মিলিবে না? বোধ হয়, আমি মরিলে, আজ আমার মুখাগ্নিরও আগুন পাওয়া যায় না।

কালাচাঁদ অদ্য অদৃষ্টবাদী, পরকালবাদী না হইলেও, এ অন্তিমে মনভ্রমে,—অভ্যাস নিবন্ধন—ভাগ্যের কথা, অদৃষ্টের কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। অন্তিমকাল বড় কঠিন কাল।

কালাচাঁদ এইরূপ ভাবিতেছেন, আর উভয় হস্তদ্বারা উনান হইতে পাঁশ তুলিয়া বাহিরে রাখিতেছেন। সর্ব্বাঙ্গ পাঁশে আচ্ছাদিত হইল। নাকে, মুখে, চোখে পাঁশ প্রবেশ করিল। তথাচ কর্ম্মে তাঁহার অবহেলা নাই। একাগ্রমনে যোগীপুরুষের ন্যায়, তিনি পাঁশ-বহিষ্করণ-কার্য্যে নিযুক্তই হইয়া রহিলেন।

হঠাৎ কালাচাঁদের হাতে গরম ঠেকিল। অমনি আনন্দে তাঁহার মন লাফাইয়া উঠিল। মনে মনে মহোল্লাসে বলিলেন "পেয়েছি, পেয়েছি!—আগুন নিশ্চয় আছে। আর ভাবনা কি?" ধীরে ধীরে অতি যত্নের সহিত, তাঁহার অগ্নিতে তিনি হাত দিলেন। অগ্নি এখন প্রাণের ন্যায় প্রিয়তম বস্তু,—সুতরাং হাত দিয়া সেই অমূল্য অগ্নিকে টিপিয়া ধরিতে তাঁহার কষ্টবোধ হইল না। হাতে যে 'জ্বালা' লাগিতে লাগিল, তাহা তিনি তাদৃশ অনুভব করিতে পারিলেন না। এখন জ্বালাও মিষ্টি!

কালাচাঁদ সেই অগ্নিকে বাহিরে আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন। কিন্তু সেই ঘোর অন্ধকারে সেই অগ্নির ত কোনরূপ আলোক দীপ্তি পাইল না। কালাচাঁদ ফুঁ দিতে লাগিলেন। তাহাতেও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল না। সেই অগ্নি, উনানের ভিতরে গরম ছিল, বাহিরে আনা হইলে, সে, আর তত গরম রহিল না। কালাচাঁদ তখন দু-ই হাতে করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখি-

লেন,—অনুভবে স্পষ্টত বুঝিলেন,—"ইহা আগুন নহে,—একটা লোহাভাঙ্গা। বোধ হয় কড়া ভাঙ্গা হইবে। উনানে কখন্ হয়ত পড়িয়া গিয়া থাকিবে।"

ক্রোধে কালাচাঁদ সেই উত্তপ্ত ভগ্ন লৌহখণ্ডকে নর্দ্দমায় নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন, "তুমি আমার সহিত বড়ই প্রবঞ্চনা করিয়াছ। তুমি নর্দ্দমা-রূপ নরকে গিয়া বারমাস বাস কর।"

কেহ যদি নৈরাশ্যের জীবন্ত ছবি দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি এইবার—শীঘ্র কালাচাঁদের মূর্ত্তি অবলোকন করুন। হস্ত-পদ শিথিল, নিস্পন্দ নয়ন,—মুখটী যেন গুটাইয়া গিয়াছে—কোমরে যেন কে লাঠীর আঘাত করিয়াছে—চোখের কোল বসিয়াছে, চড়াইয়া কে যেন গালটি ভাঙ্গিয়া দিয়াছে—সর্ব্ব-শরীর চুপ্সিয়া গিয়াছে। যদি কাহারও সাধ থাকে, তবে এই বেলা এ ছবি দেখিয়া লউন।

কিন্তু অধিকক্ষণ এ ভাব রহিল না। দেখিতে দেখিতে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তিত হইল। কালাচাঁদ ক্রমশ বল পাইয়া যেন একটু সুস্থ হইলেন।

কালাচাঁদ ভাবিলেন, "লোহ-খণ্ডটা প্রথমে খুব গরম ছিল, তখন নিশ্চয়ই উনানের ভিতর আগুন আছে। আগুন না থাকিলে, লোহাটা এরূপ গরম থাকিবে কেন? উনান-মধ্যে গন্গনে আগুন অবশ্যই নাই; তবে পাঁশের ভিতর একটু আধটু-অগ্নি বা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অবশ্যই আছে। আর পাঁশ বাহির করা হইবে না,—খোঁচাখুঁচিতে, যে আগুনটা এখনও আছে তাহা নিবিয়া যাইতে পারে। চকমকীর সোলা ও টীকা সংগ্রহ করা—অগ্রে আবশ্যক।"

কালাচাঁদ তখন বামহস্তে টীকা সোলা রাখিলেন। মুখটী ঠিক উনানের মুখে দিলেন। ডানহাতটী উনানের ভিতর ঢুকাইয়া আগুন খুঁজিতে লাগিলেন।

আবার হাতে গরম ঠেকিল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গও দৃষ্ট হইল। কালাচাঁদের হৃদয়ে আবার হর্ষোদয় হইল।

সত্যসত্যই এবার কালাচাঁদ সোলা ধরাইলেন। সোলার অগ্নি টীকায় আসিল। কালাচাঁদ হাসিয়া ভাবিলেন,—"আগে, একবার তামাক খাইলে হয় না?"

উনানের পাশেই ঘিয়ের কড়াই ছিল। তাহাতে ঘি কিছুই ছিল না,—তবে কড়াইটা ঘি-মাখান বটে। কালাচাঁদ আপনার কাপড়ের কোঁচার দিকটা খানিক ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। সেই ছিন্ন কাপড়টুকু ঘিয়ের কড়ায় বারকয়েক বুলাইলেন। কাপড় বেশ ঘৃতাক্ত হইলে, তাঁহার লাঠীর মুখে সেই কাপড় বাঁধিলেন। দিব্য মশালের মত হইল। কালাচাঁদ কৌশলে তখন টীকা ও সোলার সাহায্যে তাহাতে আগুন জ্বালিয়া দিলেন। বেশ আলো হইল।

বলা বাহুল্য, ইতিপূর্ব্বেই তিনি সদর-দরজা বন্ধ করিয়া ছিলেন। আলোক জ্বালা হইলে ভাবিলেন, আগে খিড়কীর দরজাটা খুলিয়া রাখিয়া আসা উচিত। তিনি তখন সেই জ্বলন্ত মশাল লইয়া, দোকান ঘরের চারিদিক্ দেখিতে দেখিতে চলিলেন। প্রথম ঘর পার হইয়া আর একটা ঘরে পড়িলেন। সেই দ্বিতীয় ঘরের সম্মুখেই একটী ক্ষুদ্র উঠান সেই উঠানে এক কূপ! কূপের নিকট জল তুলিবার দড়ী এবং ঘটী।

কালাচাঁদের স্নান করিবার সাধ হইল। মশালটীকে ঘরের

বার-নারী বেষ্টিত কালাচাঁদ



এককোণে তখন লুকাইয়া রাখিলেন। উল্লাসে কূপের নিকট স্নান করিতে বসিলেন। ধীরে ধীরে জল তুলিয়া প্রায় বিশ ঘটী জল মাথায় দিলেন! অঙ্গের মলা দূর করিলেন। স্নানে যেন পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইলেন। নবজীবন পাইয়া, কালাচাঁদ খিড়কী-দ্বারের খিল খোলা তত আবশ্যক বিবেচনা করিলেন না।

স্নানান্তে ভাবিলেন, "একটু নেবুর সরবৎ পাই ত খাই।" নেবু মিলিল না, কিন্তু তিনি বাতাসা ভিজাইয়া সরবৎ করিয়া খাইলেন।

তারপর দুইখানি কম্বলাসন জুড়িয়া পাতিলেন। বৃহৎ এক-খুলি রসগোল্লা আনিয়া সম্মুখে রাখিলেন। এক ধামা সন্দেশ এবং এক হাঁড়ী ক্ষীর আনিলেন।

এত উদ্যোগের পর কার্য্যারম্ভ। কালাচাঁদ প্রথমত সেই পাতলা ক্ষীর এক হাঁড়ী খাইয়া গলাটা সরল করিয়া লইলেন। তারপর রসগোল্লার বড় খুলিখানা সম্মুখে আরও একটু সরাইয়া আনিয়া, টপাটপ্ সপাসপ রূপে শীঘ্রহস্তে শুভকার্য্যে মনঃসংযোগ করিলেন। রসে ভরা বড় বড় রসগোল্লা এক একটী করিয়া মুখে এই ফেলেন, আর এই নাই! আবার মুখে ফেলেন,—তখন মুখে আর তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। যেন যাদুমন্ত্রে রসগোল্লা-গুলা উড়িয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার দক্ষিণ-কর মুখ গহ্বরে রসগোল্লা-নিক্ষেপ-কার্য্যে যেরূপ তৎপর, মুখ-গহ্বরও তাহাকে উদর-রসাতলে পাঠাইতে সেইরূপ, বা তদপেক্ষা অধিক তৎপর।

কালাচাঁদের প্রাণ কঠিন হইলেও, তিনি এক একবার চমকিতে লাগিলেন। ব্যবসার অদ্য প্রথম আরম্ভ,—হাতে খড়ি—তাই বুঝি এক একবার হাত কাঁপিতে লাগিল।

এসব কার্য্যে কালাচাঁদের অভ্যাস ত বেশী নাই,—কোথায় একটী ইন্দুর নড়ে;—তিনি মনে করেন, ভোলা-ময়রা বুঝি আসিতেছে। বাদুড় উড়িয়া যায়, তিনি মনে করেন, তাঁহাকে বুঝি কে ডাকিতেছে!

যে কারণেই হউক, কালাচাঁদ সমুদায় রসগোল্লা খাইলেন না। যতগুলি খাইলে, রাত্রির ক্ষুধা সহজ ভাবে নিবৃত্তি পায়, ততগুলিই উদরস্থ করিলেন।

রসগোল্লা ভক্ষণ-কার্য্য প্রথমত যেন ডাকগাড়ীর বেগে আরম্ভ হইয়াছিল,—কিন্তু হঠাৎ সে বেগ নরম হইল। যেন গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। সে ভীম ভৈরব বেগ যদি আর অর্দ্ধদণ্ডকাল থাকিত, তাহা হইলে আধখানি রসগোল্লাও পড়িয়া থাকিত কি না সন্দেহ, —খুলিখানি পর্য্যন্ত থাকিত কি না, তাহাতেও কিঞ্চিৎ সন্দেহ!!

কালাচাঁদ রসগোল্লার পর সন্দেশ ধরিলেন। দুইটী সন্দেশ মুখে দিয়া বলিলেন,—"ভোলানাথ! একটু দই দিতে পার? তোমার যদি দই নাই, তবে সন্দেশ খাবো কেমনক'রে? এমন নিমন্ত্রণ করা কেন? দূর কর! আর খাবো না!—এই রাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। দাও, ভোলাবেটার ক্ষীরের হাঁড়ি ভেঙ্গে।"

ক্ষীর-ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া কালাচাঁদ ভোলানাথের বাক্স ভাঙ্গিলেন। বাক্সে অনেকগুলি টাকা থাকিলেও, আটটী টাকা, তিনটী সিকি এবং চারিগণ্ডা পয়সা ব্যতীত আর কিছুই লইলেন না।

আপন জিনিসপত্র সমস্ত বুঝিয়া লইয়া, কালাচাঁদ ভিজা কাপড়ে ভোলানাথের দোকান-ঘর পরিত্যাগ করিলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদের দশগুণ বল বৃদ্ধি হইল। ব্যবসারম্ভের প্রথম দিনেই প্রচুর ফললাভ,—কালাচাঁদের বলবৃদ্ধি হইবে-না'ত কি? নব্য নবীন সেনাপতি প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করিল,—আনন্দ-উল্লাসের কি আর অবধি আছে?

ক্ষুধা নিবৃত্তি হইল,—ক্লান্তি দূর হইল—হৃদয়ে আনন্দ উথলিয়া উঠিল,—কালাচাঁদ গজেন্দ্র-গমনে পুনরায় সেই কাছারি ঘাটে গেলেন। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে ইতিপূর্ব্বে ঘাটের যে পৈঠায় বসিয়া পাপ-পুণ্য, চোর-সাধু, সত্য-মিথ্যার বিষয় ভাবিয়াছিলেন,—যেস্থলে বসিয়া তিনি 'চুরি-করায় দোষ নাই'—এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন;—কালাচাঁদ গিয়া ঠিক সেইখানেই বসিলেন। এক প্রহর পূর্ব্বে যেখানে বসিয়া কত অশ্রুবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, এখন সেখানে বসিয়া পরমসুখ অনুভব করিতে লাগিলেন। আগে ছিল, সংসার তাঁহার পর; এখন হইল, সংসার তাঁহার আপনার। এই বিশ্বসংসারের সমগ্র পরদ্রব্য তাঁহার আপনার হইল। আহ্লাদ-সলিলের নদী না বহিবে কেন?

কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন,—"কোম্পানীর এই কালেক্টরীতে যত-লক্ষ টাকা আছে,—সমস্ত আমারই; কেবল কৌশলে লইতে পারিলেই হইল। ব্রজনাথ বড়াল, এক আনা, দুই আনা সুদে টাকা ধার দিয়া,—এখন কোটীপতি; তাহার নিকট হইতে অন্তত পাঁচ আনা ভাগ চাহিব;—না দেয়, বুদ্ধির জোরে কাড়িয়া

লইব। এ অঞ্চলে যত লোক আছে, তাহাদের প্রত্যেকের নিকট হইতে, অবস্থানুসারে ৫৲, ১০৲, ২৫৲, ১০০৲—অধিক কি, এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত 'চৌথ' আদায় করিব। আমার টাকার অভাব কি? যদি তেমন কিছু অভাব হয়,—তবে একদিন ঠাকুরদাদার লোহার সিন্দুকটা মারাম্ব করিয়া তুলিয়া আনিলেই চলিবে। লোকে বলে, সে সিন্দুকটা মোহরে ভরা! সেই এক সিন্দুকেই সব আছে।"

দরিদ্র কালাচাঁদ, এক এক মুহূর্ত্তে হৃদয়ভাণ্ডারে লক্ষ লক্ষ টাকা সঞ্চয় করিয়া ফেলিতেছেন! আহ্লাদ-সলিলের নদী ত কোন্ সামান্য কথা,—গভীর গর্জ্জনকারী সমুদ্রইবা প্রবাহিত না হইবে কেন?

"কোন্ কৌশল, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে আমার এ ব্যবসা চলে ভাল?"—ইহাই হইল এখন কালাচাঁদের সুচিন্তা। "ছিঁচকে চোর হইলে, কোন কাজ হইবে না; ব্যবসা শীঘ্র ফলাও করিয়া দিগ্বিজয়ী হইয়া উঠিতে হইবে। এই হুগলী-সহরের মধ্যে প্রধান পুরুষ, অর্থাৎ প্রধান চোর কে? প্রথমত মহতের আশ্রয় না লইলে ত শীঘ্র কার্য্যোদ্ধার হইবে না। তাই বলি, মহৎ কে? যদি এ সংসারে কোন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুমহৎ ব্যক্তি থাকেন, তবে তিনি আমার ঠাকুর-দাদা। তাঁহার যোড়া নাই। একবারে চৌকস্। খাঁটি সোনা। এ ব্যবসা চালাইতে হইলে, প্রথমত তাঁহারই আশ্রয় লওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। সেখানে শিক্ষা, দীক্ষা, পরীক্ষা—সবই হইবে। তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিলে, আমার সম্মান-গৌরব বৃদ্ধি হইবে; দু দশজন লোক আমাকে মান্য করিয়া চলিবে। পসার বৃদ্ধি হইবেক। পসার বাড়িলেই পরম লাভ।

এখন তবে ঠাকুরদাদার কাছে গিয়া শ্রীচরণে প্রণিপাত হওয়াই সুযুক্তি।

"কিন্তু বুড়াকে বশ করিব কেমন করিয়া? বুড়া যে, আমার উপর হাড়ে চটা! আমাকে দেখিলেই, তাঁহার যেন গায়ে জ্বর আসে! এমন অচল অটল বিষম বিষধরকে কোন্ মন্ত্রৌষধ গুণে নতশির করিব?

"বৃদ্ধ বোধ হয় এইরূপ ভাবেন, যে,—'আমি মরিলেই তাঁহার যেন আপদ যায়, সংসার জুড়ায়; কালো মেঘ দূরে পলায়।' তাঁহার অন্তরের এরূপ ভাব না হইলে, আমাকে জেলে পাঠাইবার জন্য তিনি এত চেষ্টা কেন করিবেন? নীচের আশ্রয়ে, নাপিতবাড়ী আমি অবস্থিতি করিতেছি জানিয়াও, তিনি আমার কোন্ অপরাধে আমাকে একবার ডাকিলেন না? অপরাধত কিছুই দেখি না;— অপরাধের মধ্যে বোধ হয়,—আমি তাঁর 'আপদবালাই!' আমি যখন তাঁর আপদ-বিপদের মধ্যে গণ্য—তখন অবশ্যই তিনি আমাকে ভয় করেন। যে দিন আমি তাঁহার সহিত এখানে সাক্ষাৎ করি, সে দিনও তাঁহার মুখে যেন একটু ভয়ের চিহ্ন অঙ্কিত ছিল। ইহা-ইত আমার ধারণা! আমার উপর বিরক্ত হইয়া তিনি ভালরূপ কথা কহিলেন না বটে,—কিন্তু তখন ভয়ে যেন তাঁহার বুক ধুক্-ধুক্ করিতেছিল। মুখেই মনের ভাব মাখানো থাকে। ঠাকুর-দাদার সেই মুখটীতে তখনত কেবল বিরক্তি ভাব প্রকাশিত ছিল না,—ভয়ের ভাবও বিলক্ষণ ছিল। নহিলে, আমাকে দেখিয়াই চক্ষুদ্বয় ওরূপ বিস্তৃত হইবে কেন? কপালে ওরূপ রেখা অঙ্কিত হইবে কেন? মাথার চুল অমন সোজা হইবে কেন? শরীর অমন কণ্টকিত হইবে কেন? ভয় বটে!

"কিন্তু আমাকে তাঁহার কেন ভয়? কিসের ভয়? কবে থেকে

ভয়?—তাহাত কিছুই খুঁজিয়াও পাই না, বুঝিতেও পারি না। আমি দরিদ্র, অক্ষম কালাচাঁদ; তিনি ধনবান্, সক্ষম ঠাকুরদাদা। আমার উপর তাঁহার ভয় কি কারণে হইবে?

"কারণ যাহাই হউক, কার্য্য ঠিক বটে। যদি সত্য সত্যই আমি তাঁহার কোনরূপ ভীতি-সঞ্চারের কারণ হই, তাহা হইলে ত আমি তাঁহাকে এক মুহূর্ত্তেই বশ করিয়া লইব।

"কিন্তু আমার এই অনুমান যদি অমূলক হয়, তাহা হইলে বুড়াকে বশে আনা বড়ই কঠিন হইবে। সে যাহাই হউক, এখন স্বকর্ম্ম সাধনে প্রাণপণে চেষ্টা যত্ন করিব,—তাহাতে অবশ্যই কার্য্যোদ্ধার হইবে। চেষ্টার অসাধ্য কোন্ কার্য্য আছে?

"ঠাকুরদাদার বাসায় থাকিব। ঠাকুরদাদার প্রিয়পাত্র হইব। তিনি যাহা বলিলেন, তাহাই করিব। উঠিতে বলিলে, উঠিব বসিতে বলিলে, বসিব। তাঁহার গোলাম হইব। মধুর কথারূপ মহাস্ত্রে তাঁহার মন চুরি করিয়া লইব। এবং তাঁহারই আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহারই অর্থ অপহরণ করিব। তবে তাহার নিকট হইতে দু-চারি টাকা খুচুরা হিসাবে কখন লইব না,—উপযুক্তকালে একবারে ধান্ চুরি, গাঁট চুরি, গুদাম চুরি করিব!

"আচ্ছা,—ঠাকুরদাদার সঙ্গে এক বাসায় থাকা সুবিধা হইবে কি? যাউক্—এ সব ক্ষুদ্র কথা। উপস্থিত মত, তখন যেমন দেখিব, সেইরূপই বন্দোবস্ত করিব। ফল কথা,—ঠাকুরদাদাকে আয়ত্তের মধ্যে, হাতের মুঠার ভিতর আনিতেই হইবে।"

দেখিতে দেখিতে রাত্রি চারিটা বাজিল। একজন প্রহরীর তখন ঘুম ভাঙ্গিল। সে, কাছারির খাটের দিকে আসিয়া, কালাচাঁদকে জিজ্ঞাসিল, "কৌন্ হ্যায়?"

কালাচাঁদ। হাম্, চৈতন্যচরণ চূড়ামণি হ্যায়!

প্রহরী। মকান্ কাহাঁ?

কালাচাঁদ। মকান্ তো—ঘুঘু ডাঙ্গামে হ্যায়।

প্রহরী। কাঁহা যাতে হেঁ।

কালাচাঁদ। নবদ্বীপ-কা শ্রীপাটমে।

প্রহরী। রাতমে আপ্‌কো বহুত তক্‌লীফ হুয়া।

কালাচাঁদ। কনষ্টবল সাহেব! সে কথা কি আর বল্‌বো? বাপু! তামাক খাবার কোন যোগাড় আছে কি?

প্রহরী। থোড়ি তামাকু হ্যায়। লেকিন টীকিয়াভি নহী,—আগ্‌ভি নহী!

কালাচাঁদ। ওহে বাপু! এত ভাবচো কেন? এই দুইটা পয়সা নাও। এক পয়সায় তামাক এবং এক পয়সায় আগুন কিনে নিয়ে এস।

প্রহরী পয়সা লইয়া অবিলম্বে তামাক সাজিয়া আনিল। হুঁকা ছিল না। অশ্বত্থপত্রের নল তৈয়ারি হইল। কালাচাঁদ সেই নলে তামাক খাইতে লাগিলেন। কল্‌কে ফিরাইয়া দিবার সময় কালাচাঁদ প্রহরীকে আরও দুইটী পয়সা দিলেন। প্রহরী কৃতার্থ হইয়া চলিয়া গেল।

কালাচাঁদ তখন তাঁহার লোটাটী গঙ্গাগর্ভে প্রোথিত করিলেন। লাঠিটি সেই বৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের উপর লুকাইয়া রাখিলেন। নিজস্ব অস্ত্র-শস্ত্র এবং ধন-সম্পত্তি এইরূপে রক্ষা করিয়া, কালাচাঁদ দ্রুত-পদে চুঁচুড়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

চুঁচুড়া পৌঁছিবার কিছুক্ষণ পরেই অরুণোদয় হইল। পাখিকুল কলকণ্ঠে কোলাহল করিয়া উঠিল। দোকানদার দোকান খুলিল।

কালাচাঁদ এক ধুতি এবং এক চাদর কিনিলেন। গলির মধ্যে গিয়া গোপনে ছেঁড়া কাপড় ছাড়িয়া, নূতন কাপড় পরিলেন। তিনি সেই সু-ছিন্ন বসনখানি ফেলিলেন না,—একটা প'ড়োবাড়ীর পয়লে লুকাইয়া রাখিলেন।

তারপর—বাজার। মাছ, দই, সন্দেশ, আলু, বেগুন, কলা খরিদ। তারপর এই ভেট-উপহার লইয়া মুটে হাতে করিয়া, ঠাকুরদাদার গৃহে কালাচাঁদের আগমন; এবং সম্ভাষণ,—"দাদা মোশাই! অ, দাদা মোশাই! বাড়ীতে আছেন কি?"

অবশেষে কালাচাঁদের সেই স্নান এবং সেই আহার,—অর্থাৎ ভূরি-ভোজন।

ইহাই হইল—ইতিহাস।

প্রথম অংশের উপসংহার।

বৃদ্ধ হরিতারণ দত্ত, ভাবিয়া চিন্তিয়া, কালাচাঁদকে হস্তগত করাই উচিত বিবেচনা করিলেন। তিনি কালাচাঁদকে উত্তম আশ্রয় দিলেন,—কিন্তু নিজের বাসায় রাখিলেন না। স্বতন্ত্র বাসায় থাকিতে, কালাচাঁদ সানন্দে সহজেই সম্মত হইলেন। ঠাকুরমা কিন্তু প্রথমে কালাচাঁদের স্বতন্ত্র বাসা স্থাপন সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করেন। অবশেষে ঠাকুরদাদার বিনয়-বিতর্কে এবং কালাচাঁদের সম্মতিতে, ঠাকুরমার আপত্তি-খণ্ডন হইয়া যায়। নাতি-ঠাকুরদাদা উভয়েরই মন্ত্রণা সফলতা লাভ করিল। আপন আপন ইষ্টসিদ্ধিতে উভয়েরই সংসার এখন সুখময় হইল।

ফুল ফুটিল। সৌরভ ছুটিল। দশ দিক্ হাসিল। পরম সুখে কালাচাঁদের বিষম ব্যবসা আরম্ভ হইল। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস।

চতুর্থ পর্ব্ব সমাপ্ত।

কালাচাঁদ।

পঞ্চম পর্ব্ব—তীর্থভ্রমণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কি লিখি?—কি চাও? অভ্রভেদী ভীমগিরির বর্ণন করিব কি? বড় নীরস! বীচিমালা-বিভূষিত মহাসাগর আঁকিব কি?—সে যে অতলস্পর্শ, ডুবিয়া যাইব! কলকলনাদিনী, তরতর-বাহিনী স্রোতস্বিনীর কথাটাই বলিনা কেন?—কাজ নাই, ভাসিয়া যাইব, হাবুডুবু খাইব। তবে ব্যোমপথের বিরাট কথা শুনিবে কি? সে যে শূন্যাকার, কূল-কিনারা নাই! আচ্ছা, এইবারে না হয়,—পবিত্র-প্রণয়ের প্রকরণ প্রকটিত হউক না?—প্রণয়'ত প'চে গেছে! ক্ষমা করিবেন!

কাঁঠালপাড়ার রাস দেখিবে কি? সে কাজ বড় মন্দ নয়! তবে আসুন।

একদিকে হুগলী-চুঁচুড়া-চন্দননগর, অন্যদিকে নৈহাটী-ভাটপাড়া-কাঁঠালপাড়া,—মধ্যে গঙ্গা। জনপদ সমৃদ্ধিশালী। প্রতিবৎসর হেমন্তকালে, গঙ্গার উপকূলে, কাঁঠালপাড়ার রাস-মহোৎসব

হয়। বহুলোক সমাগত হয়। দেবদর্শন হয়; আর বেচা-কেনা, জুয়াচুরি-বাটপাড়ী, মারামারি-কাড়াকাড়ি সমস্তই চলে। যাত্রি-দল-মধ্যে ইতরশ্রেণীর স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। লম্পট, শঠ, শ্যাম-নটবরের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। ভাল মানুষও গিয়া থাকেন। রাশীকৃত কেঁচকেঁচির মাজুরি রাসে বিক্রীত হয়। সে সময় গৃহস্থের গৃহে গৃহে ঐ মাদুর।

সূর্য্য ডুবু-ডুবু। সন্ধ্যা হয়-হয়। বেশ মিঠুনি শীত। যেখানে রাসের মেলা বসে,—বেচা-কেনা হয়, তাহার ঈষৎ দূরে, বটগাছের তলায় একটামহাভিড়। প্রায় আড়াই শত নরনারী উপস্থিত সকলেই অগ্রগামী হইয়া, গাছের গুড়ির কাছে যাইবার জন্য উদ্যত। এজন্য বিলক্ষণ ঠেলাঠেলি, অল্পস্বল্প কিলোকিলিও ও হইতেছে। কতকগুলি অদূরে-দণ্ডায়মান দর্শক, ব্যাপার কি, জানিবার জন্য বিষম ব্যস্ত। উৎকণ্ঠার সীমা নাই। কিন্তু কার সাধ্য ব্যূহ-মধ্যে প্রবেশ করে? এই ভিড়ের ভিতর মেয়ে আছে, ছেলে আছে, বুড়া আছে, বুড়ী আছে, নেড়া আছে, নেড়ী আছে, যুবা আছে, যুবতী আছে। নাই কি?

একটা লোক হাঁপাইতে হাঁপাইতে বহু কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া বাহিরে আসিল। তার গায়ে লালরঙ্গের ছিটের আংরাখা, পায়ে নাগরা জুতা; মাথায় চাদর জড়ান; পরণে একটু-ওসারে-খাটো রাঙ্গা-পেড়ে ধুতি। লোকটা আসিয়াই আপন মনে বলিতে লাগিল, ভিড়ের ঠেলায় ম'রে গেছলুম আর কি?—ভিতরে ব্যাপার কিন্তু অতি আশ্চর্য্য।—"

একজন জিজ্ঞাসিল, "ভিতরে কি কাণ্ড হচ্চে, বল দেখি?"

উত্তর। অতি আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য! বড়ই অদ্ভুত!—

প্রশ্ন। কি?—কি?—কি?—

উত্তর। কোথা হইতে এক পরম সন্ন্যাসী এসেছেন। তিনি পৃথিবীর সর্ব্ব তীর্থ ভ্রমণ ক'রে বেড়াচ্চেন,—এই পথে শ্রীক্ষেত্র যাবেন। আজ এখানে থাকবার জন্য তাঁকে এখানকার অনেকেই অনুরোধ করলেন; তাই তিনি রাসতলায় রাত্রিবাস ক'রবেন ব'লেছেন। বাবুরা দোতালার বৈঠকখানায় রাখবার জন্য তাঁকে অনেক সেধেছিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী বল্লেন, বৃক্ষতলাই আমার রাজবাটী।

প্রশ্ন। সন্ন্যাসী কি খান? কি করেন?

উত্তর। তিনি কিছুই খান না। অনেক ভক্ত তাঁর সম্মুখে রাশীকৃত সন্দেশ সাজিয়ে দিয়েছিল;—কিন্তু তাহার তিনি একটীও স্পর্শ করেন নাই। হাসিয়া বল্লেন, আমার কিছুই দরকার নাই। তখন তাঁর চেলারা সন্দেশগুলো একপাশে সরিয়ে রেখে দিলে। সাধু পুরুষ! সাধু পুরুষ!!

প্র। ওখানে বসে তিনি কি কচ্চেন?

উ। সদা ভগবানের নাম জপ কচ্চেন, আর ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান গণনা ক'রে বলে দিচ্চেন! অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই দেখুন না কেন? আমার বাড়ী হ'লো নদে জেলা,—আমার সঙ্গে ওঁর কস্মিন্‌কালে দেখা শুনো নাই—আমি প্রণাম ক'রে দাঁড়াতেই খুসী হয়ে সন্নেসী বোল্লেন,—'এস, এস হরিদাস এস,—ব'স।' আমি ত "থ" হয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগ্‌লেম—'সন্নেসী আমার নাম জান্‌লেন কি করে?'

প্র। বলেন কি মোশাই?—তাঁর অতি আশ্চর্য্য ক্ষমতা বল্‌তে হবে ত?

উ। আশ্চর্য্য নয় ত কি? দেখ্‌লে একবারে অবাক্‌ হয়ে যাবেন! একজন বোবা এসে সন্নেসীর কাছে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। তা দেখে, ঠাকুরজীর দয়া হ'লো। তিনি তার মুখে হাত বুলাইয়া মন্তর আওড়াতে লাগ্‌লেন—আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার কথা ফুট্‌লো। সে লোকটা এখনও ঠাকুরজীর কাছে বসে আছে—আর মাঝে মাঝে তাঁর পদ-সেবা কর্‌চে। সন্নেসীকে দেখ্‌বেন যদি তবে এইবেলা যান।

প্র। ভিড় ঠেলে ঢুকি কি করে?

উ। আসুন তবে আমার সঙ্গে!—কুনুয়ের গুঁতো দিয়ে ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে চলে যাব, তার আর ভাবনা কি?

যাঁহার সহিত হরিদাসের কথাবার্ত্তা হইতেছিল, তিনি গরিফার কলে কাজ করেন। একটু সর্দ্দারী-গোছ চাকুরী,—বেশ দু-টাকা রোজগারও আছে। তাঁর সঙ্গে সাত আট জন কলের কারিকর আছে। তিনি হরিদাসকে জিজ্ঞাসিলেন, "মহাশয়ের নামটী কি বোল্লেন,—ভুলে গেছি!"

হরিদাস হাসিয়া বলিলেন,—"আমার নাম হরিদাস পরামাণিক। কেষ্টনগরের রাজবাটীতে আমার বারমাস থাকা হয়। রাজা আমাকে বড় ভাল বাসেন। এক দিনের তরেও আমাকে কোথায় যেতে দেন না। আমার ইস্তিরীর ব্যারাম হয়েচে ব'লে, ছুটি নিয়ে, আমি লুকিয়ে রাস দেখ্‌তে এসেছি।"

ঈষৎ থামিয়া, একবার এদিক্‌-ওদিক্‌ চাহিয়া হরিদাস প্রশ্ন করিলেন, "মহাশয়ের নামটী কি? আপনাকে যেন কোথায় দেখেচি ব'লে আমার মনে হচ্চে—"

উ। আমার নাম প্রেমচাঁদ দাস,—এই কলেই আমি থাকি।

কল্‌কাতায় দেখে থাকবেন বলে বোধ হচ্চে। আমার বড় ছেলেকে কল্‌কাতার কলেজে পড়তে দিয়েচি—কাজেই মধ্যে মধ্যে তথায় যাওয়া-আসা কর্ত্তে হয়,—

হরিদাস। ছেলেপিলেকে ইংরেজী না শেখালে কি আজকাল কিছু হবার যো আছে? তা বেশ করেছেন,—অতি উত্তম কাজ হয়েছে। মোশায়ের কি ঐ একটী সন্তান?

প্রেমচাঁদ। দুই পুত্র, তিন কন্যা। ছোট ছেলেটীর জন্য আমি বড় কষ্টে আছি। তার দুটী চোখেই ছানি পড়বার যোগাড় হয়েচে। দেখি, যদি সন্ন্যাসী ঠাকুর কিছু এর উপায় কত্তে পারেন।

একদল স্ত্রীলোক, এই সব কথা হাঁ করিয়া গিলিতেছিল। বোধ হয়, আধা-ছানার মণ্ডা অপেক্ষা এ কথা তাহাদের অধিক মিষ্ট লাগিতেছিল। ঐ দলমধ্যস্থ একজন বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক হরিদাসকে কাতরভাবে জিজ্ঞাসিল, "বাছা আমরা কি সন্নেসীকে একবার দেখ্‌তে পাবো না?—আমার নিজের জন্য বলি নাই,—(একটী পার্শ্বস্থ, আধঘোমটা-দেওয়া যুবতী স্ত্রীলোকের গায়ে হাত দিয়া দেখাইয়া)—এই মেয়েটীর একবার হাতটা দেখাতাম। এতে দু-টাকা দু-সিকে খরচ হয়, তাও এখনি দিতে আমি রাজী আছি।"

হরিদাস চমকিয়া উঠিয়া জিহ্বা কাটি। বলিলেন, "ছি ছি ছি! পয়সার নাম শুন্‌লে তিনি রাগ করেন। তবে তাঁর ঠাকুরকে কিছু প্রণামী দাও, ভোগ দাও—তাঁর চেলাগণকে গাঁজা খেতে কিছু দাও,—সে স্বতন্ত্র কথা। এবার তোমাদিগে ভিড়ের মধ্যে কিছুতেই নিয়ে যেতে পারবো না। আগে বাবুদিগে দেখাই;

তারপর যদি সময় থাকে, তোমাদিগে য়ে যাবো। তোমরা এইখানে দাঁড়াও!'

এই কথা বলিয়া হরিদাস, প্রেমচাঁদ প্রভৃতিকে লইয়া বীরদাপে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহারা অদৃশ্য হইবামাত্র, আর দুইটী লোক, সেই স্ত্রীলোক দুইটীর সম্মুখে আসিয়া আপনা-আপনি হাসিতে খেলিতে, নাচিতে লাগিল। তন্মধ্যে যেটী বয়োবৃদ্ধ, সেটী আপন মনে বলিতে লাগিল, "হায় হায়! সন্নেসী নয় ত—ঠিক যেন কাঁচা—জীয়ন্ত দেবতা!—পাঁচ বছর হ'লো আমি এই ছেলে-টীকে হারিয়েছিলুম। সন্নেসীর কাছে এসে দড়াম্ ক'রে পড়ে কেঁদে বল্লুম,—ঠাকুর! তুমি আমার ছেলে না এনে দিলে, আমি উঠবো না—এইখানে হত্যে হবো।' সন্নেসী হেসে তিনবার 'আয়, আয়, আয়' ব'লে ডাকলেন;—আর, অমনি এই ছেলে এসে একেবারে আমার কাছে উপস্থিত। আমার কাছে তখন বেশি পয়সা ছিল না চেলাদের এক টাকা সন্দেশ খেতে দিয়ে চলে এলাম।"

সেই বয়োবৃদ্ধা স্ত্রীলোকটী তাহাকে জিজ্ঞাসিল,—"বাবা! এই মেয়েটীকে একজন খুব ভালবেসেছিল,—কিন্তু ছমাস তার কোন খবর পাওয়া যায় নাই। সন্নেসীর কাছে গেলে এর কোন উপায় হতে পারে কি?"

এইরূপে সেই পিতা-পুত্রের সঙ্গে সেই মেয়েদলের অনেক কথাবার্তা হইল। পরস্পরের সহিত পরস্পরের আলাপ-পরিচয় ভাব হইল। নাম-ধাম-ঠিকানা কেহ কাহারো জানিতে ত্রুটি করিল না। অবশেষে পিতা-পুত্র, সেই মেয়েদলকে সঙ্গে লইয়া ভিড়ের মধ্যে ঢুকিল।

সন্ন্যাসীর প্রাদুর্ভাবে আজ প্রকৃত রাস-তলায় লোক কম হইয়াছে। দোকানের জিনিসপত্র ভাল বিক্রয় হইতেছে না। অধিকাংশ লোকই বেগে সন্ন্যাসীর দিকে ছুটিয়াছে।

ধন্য সাধু সন্ন্যাসী? আর, ধন্য লোকের তরল মন!! গণৎকার বা ভবিষ্যৎবক্তা,—লোকের এমন মনোহরণ করে কেন? লোক এমন অন্ধ হইয়া দৌড়ায় কেন?

দেখিতে দেখিতে প্রায় পাঁচশত লোক সন্ন্যাসীকে ঘেরিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসী, বটবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট। সর্ব্বাঙ্গে ভস্ম মাখা। আসন বাঘছাল, পরিধান বাঘছাল। মস্তকে জটাভার। দাড়ী বিলম্বিত। নেত্র ঢুলু-ঢুলু। হৃষ্টপুষ্ট, দীর্ঘকায়, কৃষ্ণবর্ণ। হস্তে ত্রিশূল। মুখে সদা—কখন ধীরে, কখন উচ্চরবে—'শিবো শিবো, শিবো' করিতেছেন। সন্ন্যাসীর কথা কখন বাঁকাবাঁকা বাঙ্গলা, কখন আধা-বাঙ্গলা আধা-হিন্দি। চারিধারে আধ হাত পরিমিত স্থান লইয়া 'গণ্ডী' দেওয়া। দক্ষিণে এক প্রকাণ্ড মহাদেব-মূর্ত্তি; বামে শিষ্যগণ অবস্থিত। কখন শঙ্খধ্বনি হইতেছে; কখন কাঁসর-ঘণ্টা বাজিতেছে; কখন বা ধূপধুনা গুগ্গুলের সৌরভ চারিদিকে ছুটিতেছে। এক সমারোহ কাণ্ড।

সন্ন্যাসীর আজ্ঞাক্রমে দেবতার ভোগের পর, একজন চেলা, ভিক্ষুকগণের উদ্দেশে এক রাশি সন্দেশ ছড়াইয়া দিল। দর্শক-

মণ্ডলী মধ্যে অনেকেই সন্ন্যাসীর এই নিঃস্বার্থপরতা এবং নিষ্কামধর্ম্ম দেখিয়া নিরন্তর "সাধু, সাধু" বলিতে লাগিল। সন্দেশ বিতরণের পর অন্য একজন চেলা আট আনার পয়সা ছড়াইয়া দিল। লোকসকল, 'অবাক্' হইয়া বলাবলি করিল,—"সন্ন্যাসী পরমভক্ত সাধু,—নিস্পৃহ—দেবাংশে জন্ম।"

তখন আবার গণনা আরম্ভ হইল। একটী অষ্টাদশবর্ষীয়া রমণী আধ-সিকি-ভরি ঘোমটা দিয়া গণাইতেছেন। তাঁহার দুই পার্শ্বে দুইটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। তন্মধ্যে একটী স্ত্রীলোক একজন চেলাকে বলিতেছে, "বাবা, দুটী টাকা বৈত আনি নাই;—এই এখন নিয়ে ঠাকুরের ভোগ দাও; মেয়েটী যদি ওর সোয়ামীকে ফিরে পায়, তা'হলে এক থান মোহর প্রণামী দিয়ে বাবার ষোড়শো-পচারে পূজা দিব।"

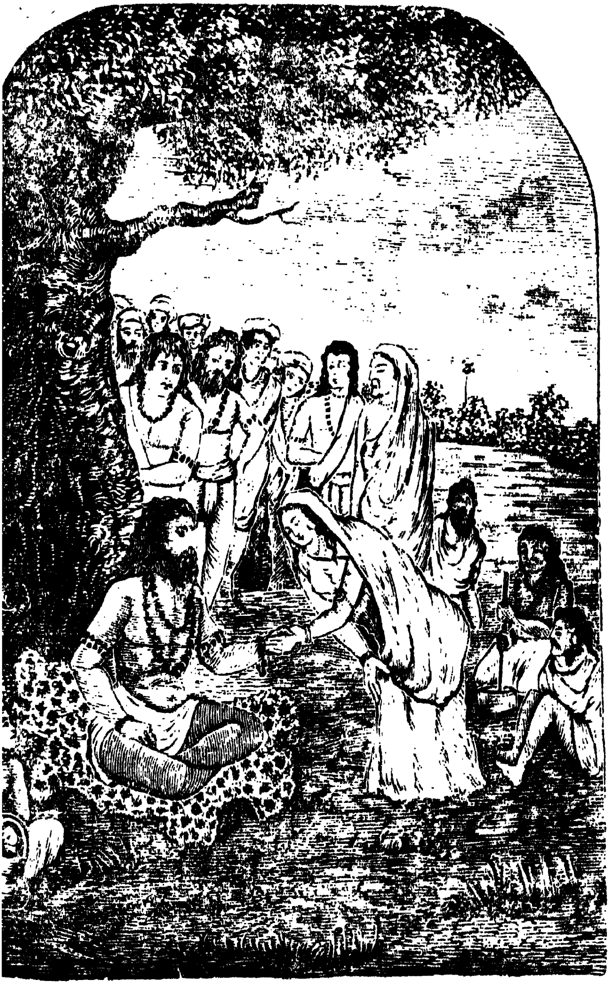
এই কথা শেষ না হইতেই সন্ন্যাসী, রমণীর করকমল ধরিয়া বলিলেন "মায়ী! তোহার নামটী বুঝি গুলাব কামিনী—ঠিক্ বলিস মায়ী।"

রমণী, অপরিচিত সন্ন্যাসীর মুখে তাঁহার প্রকৃত নাম শুনিয়া, শিহরিয়া উঠিলেন। মৃদুস্বরে বলিলেন, "হ্যাঁ ঠিক।"

সন্ন্যাসী পুনরায় হাসি-হাসি মুখে বলিতে আরম্ভ করিলেন,—মায়ী! তোহার কুছ ভয় নেহি,—পাবি, পাবি—ফিরে পাবি! মায়ী! তোর মনটী খুব ভাল আছে। তুই পরের ভাল কর্‌তে যাস্ কিন্তু তোহার ভালো কেহ কর্‌ছে না। তোর যশোভাগ্যি কম্‌তি আছে, মায়ী!—"

ক্রমশই সন্ন্যাসীর উপর রমণীর ভক্তি বাড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী তখন হৃষ্টচিত্তে বলিলেন, 'মায়ী! তুহি মনমে মনমে

বটবৃক্ষমূলে সন্ন্যাসী।



একটা ফুলের নাম্ কর্ দেখি?—এঃ এঃ মায়ী, তুই এক ফুলকো নাম মনে কর্‌কে, আউর দোসরা ফুলকো নাম্ বদল দিয়া কেঁউ?'

তখন সন্ন্যাসীর যেন একটু ক্রোধভাবের উদয় হইল। রমণী অধিকতর আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। বাস্তবিকই প্রথমে যুঁই ফুলের নাম মনে করিয়া, শেষে তাহা গেঁদায় পরিবর্ত্তন করেন। সন্ন্যাসী বলিলেন "থাক্ থাক্ মায়ী!—আর ফুলকো নাম কর্‌তে হইবে নেই,—সাতদিনকে ভিতর্‌মে তোহার সোয়ামী মিলবে, হামি মন্তর বলে দিচ্চি—(হস্তে জল লইয়া)

জলে উড়ম জলে পড়ম জলে দিয়া পাঁও।
এই জল পড়ে দিলে কামিখ্যে চণ্ডী যাও॥
সোয়ামী হ'লো তোহার আকাশের চাঁদ।
এই জল ছুঁলে তুই ঘরে পাবি জীল॥
ভাত দিবে কাপড় দিবে, দিবে তোরে কাঠ।
গুলাবীর আর তার একই শ্মশান ঘাট॥
শ্রীগুরু রামদাসের আজ্ঞা পাঁত্ত।
এই জল না ফলেতো পুতের মাথা খাঁও॥'

এই মহামন্ত্র উচ্চারণানন্তর সন্ন্যাসী, সেই জল রমণীর গাত্রে ছড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "তুই ঘরে যা মায়ী—মিল্‌বে—মিল্‌বে!—পাবি—পাবি—পাবি!"

রমণী উঠিয়া যাইবার সময় পার্শ্বস্থ বৃদ্ধার কাণে কাণে বলিলেন, "তোমার কাছে আর একটী টাকা আছে নয়? সন্ন্যেসী জাগ্রত দেব,—সে টাকাটিও দাও।" বৃদ্ধা টাকাটী লইয়া সন্ন্যাসীকে দিতে গেল। সন্ন্যাসী একটু যেন কুপিত অথচ হাসিয়া

বলিলেন,—"মায়ী। হামি পয়সা নেহি মাঙ্গতা। পয়সায় হামারা কেয়া কাম আছে।"

একজন চেলা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল,—"মায়ী! তুই কি করুচিস্—টাকার কথা শুনলে, সন্ন্যাসী রেগে এখনি তোকে ভস্মো করে ফেল্‌বে! টাকা এইদিগে দে—এইদিগে দে—বাবার ভোগ হবে।"—এই বলিয়া সেই ব্যক্তি ক্ষিপ্রহস্তে, বৃদ্ধার হস্ত হইতে টাকাটী তুলিয়া লইল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। সন্ন্যাসীর সম্মুখে দাউ দাউ দুইটা মশালের আলো জ্বলিতেছে। শিষ্যগণ ঘোষণা-প্রচার করিল, "সন্ন্যাসী আজ আর গণনা করিবেন না—এইবার তিনি ধ্যানে বসিবেন—সমস্ত রাত্রি ধ্যান হইবে, কাহারও সহিত কথা কহিবেন না। সকলে তফাৎ হও, তফাৎ হও—কাল আসিও। কল্য একপ্রহর পর্য্যন্ত সময়। তাহার পরে আসিলে, সন্ন্যাসীকে কেহ দেখিতে পাইবে না।" এই ঘোষণাবার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গে একটা মহা ভয়ঙ্কর গোল উঠিল। চারিজন কন্‌ষ্টেবল, একজন ইন্‌স্পেক্টার, বেগে ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। একটা শব্দ উঠিয়াছে,—"পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো, জল্‌দি পাক্‌ড়ো—ডাকু ভাগেগা।" ঘটনা কি, ব্যাপার কি?—সকলেই জানিতে উৎসুক।

বেলা চারিটার সময় দুইটী স্ত্রীলোক গণাইতে আসিয়াছিল। বাবার ভোগের জন্য তাহারা সন্ন্যাসীকে প্রত্যেকে ৪৲ হিসাবে ৮৲ দেয়। তাহাতেও বাবার কুলান হইবে-না বলায়, তাহারা উভয়ে হস্তস্থিত রূপার পৈঁছা বাবার ভোগের জন্য দিয়া যায়। মেয়ে দুটী কৈবর্ত্তদের। কৈবর্ত্তদের বড়কর্ত্তা সন্ধ্যার পর ঘরে

আসিয়া, ব্যাপার শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া পুলিসে খবর দিল। এক্ষণে পুলিসকে সঙ্গে লইয়া, বড়কর্ত্তা সন্ন্যাসীকে ধরিতে আসিতেছে।

মহা হুলস্থূল। সেই মসাল দুইটা হঠাৎ নিবিয়া গেল। হঠাৎ ঘোর অন্ধকার হইল। ভয়ঙ্কর গোলযোগ। কে কার ঘাড়ে পড়ে, তাহার ঠিক নাই। একজন বলিল, "ঐ পালায়, ঐ সন্ন্যাসী পলায়, ধর্ ধর্ ধর্!" কনষ্টেবলগণের গতি মৃদুমন্দ;—তাহারা ধরিতে ছুটিল বটে, কিন্তু সে "বাদসাহী-চাল্" কোথায় যাবে? তখন কৈবর্ত্তদের বড়কর্ত্তা প্রাণপণ চেষ্টায় দৌড়িয়া গিয়া, সন্ন্যাসীর দীর্ঘদাড়ী একেবারে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল। সন্ন্যাসীও বিলক্ষণ বলিষ্ঠ। বিষম টানাটানিতে সেই দীর্ঘ দাড়ী বড়কর্ত্তার হাতে আমূল রহিয়া গেল;—আর সেই কৃষ্ণকায় সন্ন্যাসী লম্বা-লম্ফে আসিয়া ঝুপ করিয়া গঙ্গায় জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। বড়কর্ত্তা আলো আনিয়া দেখিল, সন্ন্যাসীর দাড়ীটা কৃত্রিম, পরচুলা মাত্র। রাস উপলক্ষে জলে তখন অসংখ্য নৌকা বাঁধা। কত দিক্ হইতে কত নৌকা আসিতেছে, কত দিকে কত নৌকা যাইতেছে, কত নৌকা সেইস্থানেই দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘুরিতেছে। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে পুলীশ-প্রভু সশরীরে আসিয়া গঙ্গাজলে অনুসন্ধান আরম্ভ করিলেন; কিন্তু সন্ন্যাসীকে আর কোথাও পাওয়া গেল না। গঙ্গায় যত নৌকা ছিল, পুলিশ-কর্ত্তার হুকুমে সমস্ত নৌকা আটক হইয়া গেল। অনেক দাঁড়ী মাঝী মার খাইল। অনেকের জিনিস-পত্র নৌকা হইতে গঙ্গার জলে পড়িল। একটা ভীম-ভৈরব কাণ্ড বাধিল।

সন্ন্যাসী সাধু কি ভণ্ড?—এই কথা লইয়া রাসতলায় রাত্রি

দশটা পর্য্যন্ত বাদানুবাদ চলিল। প্রথমে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছিল, "সন্ন্যাসীটে ডাকাত, জুয়াচোর, ভণ্ড!—তা, না হ'লে, পলাবে কেন?" যত রাত্রি অধিক হইতে লাগিল, ততই প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। তখন কেহ কেহ বলিল, "এমনওত হইতে পারে, সন্ন্যাসী ইংরেজের অনাচার, পুলিসের অত্যাচার দেখিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্য-প্রভু শ্রীক্ষেত্রে সাগরে ঝাঁপ দেন; সন্ন্যাসী-প্রভু কাঁঠালপাড়ার গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন।" ফলতঃ সে রাত্রে কোন বিষয়েরই সুমীমাংসা হইল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অগ্রহায়ণের আরম্ভ। শীত সম্বন্ধে এখন মতভেদ। যাঁহার শীতবস্ত্র বেশী আছে, তাঁহার মতে এখন খুব শীত; যাঁহার কিঞ্চিৎ কম আছে, তাঁহার মতে এখনও তত শীত পড়ে নাই।

প্রভাতকাল। সংসার-ক্ষেত্রে যেন মানুষ-সঙের মহা-মেলা। ইস্তক ফুর্‌ফুরে মলমলের চাদর, নাগাইদ তুলা-ভরা দু-আঙ্গুল পুরু বালাপোষ—সর্ব্বরূপ বসনই এখন মানব-গাত্রে বিরাজ করিতেছে। যেখানে পাঁচটী লোক একত্র বসিয়া আছে, সেখানে দেখিবে,—কাহারও গায়ে বনাত, কাহারও গায়ে লুই, কাহারও গায়ে রেজাই, কাহারও গায়ে চাদর, কাহারও গায়ে কোঁচার টেপ। সঙ নয় ত কি?

পুরুষ-পাল-মাঝে শীত সম্বন্ধে এরূপ মতভেদ থাকিলেও কুল-

মহিলা-মণ্ডলে কিন্তু এসম্বন্ধে এখনও কোনও উচ্চবাচ্য নাই। স্ত্রীজাতির পরিধেয়-বসনের আজও কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। গৃহলক্ষ্মী সেই অনুদয়ে উঠিয়া যথানিয়মে পূর্ব্ববৎ, অঞ্চল দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া,—জল তুলিতেছেন, বাসন মাজিতেছেন, ঘর নিকাইতেছেন, উঠান ঝাট দিতেছেন। শীত এ অঞ্চলে আদৌ ঘেঁসিতে পারে নাই।

তবে এখন প্রকৃত কালটা কি?—শীত, না গ্রীষ্ম? একটু উচ্চ অঙ্গের কবি হইলে বলিতাম,—ইহা শীতও নহে, গ্রীষ্মও নহে;—গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম,—হরগৌরী-মিলন,—দীপক-মল্লার সংঘটন!

এ হেন কালে হুগলীর ডাকঘরে দুইটী লোক উপবিষ্ট। একটী প্রবীণ,—পরিপককেশ। একটী নবীন,—যুবতী-রঞ্জন বেশ। উভয়েই ডাকঘরের কাজ একটু-আধটু করিতেছেন এবং পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছেন।

প্রবীণ। ভায়া! তীর্থ-ভ্রমণ ত ক'রে এলে;—আমার জন্য কি নিয়ে এসেচ বল?

নবীন। দাদা! তোমার তরে কিছু কি না নিয়েই ফিরে এসেচি?

প্রবীণ। কি?—কি?—কি জিনিস্?

নবীন। তা, এখন বল্‌বো না।

প্রবীণ। বলই-না কেন?

নবীন। তা কি এখন বলা হয়? সে বড় শক্ত জিনিস্।

প্রবীণ। শক্তই হো'ক, আর নরমই হো'ক—সে কথা বল্‌তে দোষ কি?

নবীন। দাদা! তুমি কি সে সামগ্রীর মর্ম্ম বুঝ্‌তে পার্‌বে? সে একদিন তোমার বাসায় যাবো;—দিদিকে ডেকে, সে জিনিস্‌টী হাতে হাতে সমর্পণ ক'রে আস্‌বো।

প্রবীণ। তোমার বুঝি সব ফাঁকি! পথ থেকে চার্‌টী ধূলো কুড়িয়ে নিয়ে যেয়ে, বল্‌বে,—"এই বৃন্দাবনের রজ নাও।" আমি ধূলো-কাদায় ভুল্‌চি না! সাড়ে তিন-গজা নামাবলী তিনখানি চাই;—তুলসীর মালা চার্ গাছি চাই; রেশমের হরিনামের ঝুলি অন্ততঃ দুটী চাই। আর, কাশী থেকে পেতলের বাসন কি এনেচ বল?

নবীন। দাদাঠাকুর! তোমার কি চাই বল না? আমি কি এনেচি, না এনেচি—সে খোঁজে কাজ কি?

প্রবীণ। তোমার সঙ্গে'ত কথায় কেউ পার্‌বে না!—আমার মোদ্দা একটী ফুল-কাটা পানের বাটা চাই!

নবীন। আর কি চাই?

প্রবীণ। গয়ার তামাক।

নবীন। সে তামাক এখনি খাওয়াচ্চি।

প্রবীণ। সঙ্গে ক'রে এনেচ নাকি? কতটুকু এনেচো?—পোয়াটাক্ তামাক বাসায় নিয়ে যেতে হ'বে।

নবীন। তা, তামাক অনেক আছে! এখন একবার খেয়ে দেখো—

প্রবীণ। তবে, ভায়া! কেষ্টাকে শীগ্‌গির সাজ্‌তে ব'ল!—এখনি সাহেব এসে পড়্‌বে!

কৃষ্ণধন ডাকঘরের একজন পিয়ন। নবীনের আদেশমাত্র সে তখনি তাওয়া-দিয়া এক-ছিলিম গয়ার তামাক সাজিয়া ফেলিল।

তামাক খাইতে খাইতে প্রবীণ ব্যক্তি তামাকের বহু গুণানুবাদ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এ তামাকে মন একেবারে তর্ হইয়া যায়। বেশ, ভায়া! তুমি যে, গয়া থেকে এ তামাকটী নিয়ে এসেচো—এটী অতি উত্তম কাজ হয়েচে। তা, ভায়ার আজ্‌কাল কোন্ কাজটাই বা মন্দ?—গরদের জামা গায়ে,—তার উপর আবার বুক-পকেটে ফুলের তোড়া! ভালো,—ভায়া!—ভালো!"

নবীন। দাদা! ফুলের তোড়াটী আজ সাহেবকে দিতে হবে—

প্রবীণ। তা, তুমি সাহেবকেই দাও, আর নিজেই পরিয়া থাকো,—সে কথা আমি বল্‌চি না। আমি বল্‌চি,—ভায়ার আজ-কাল বাহারটা ভালো!

নবীন-পুরুষ হাসিতে লাগিলেন।

প্রবীণ কহিলেন,—"তা, বাহার হোক! সে'ত হ'বারই কথা। আমি বলি,—তুমি একটী বিয়ে-থা কর,—ঘর-সংসার হোক্!"

নবীন-পুরুষ আরও হাসিয়া উঠিলেন,—বলিলেন,—"আমার বয়স কি?—আমিত এখন ছেলেমানুষ! আর এত তাড়াতাড়ি বিয়েই বা কেন?"

প্রবীণ। ভায়া! তুমি ছেলে-মানুষ কিসে? তোমার বয়স বরং পঁচিশ বৎসরের বেশী হবে, তবু কম নয়! তোমার বিবাহকাল উত্তীর্ণ হয়েচে।—তবে তুমি বিয়ে না কর্ত্তে চাও,—সে স্বতন্ত্র কথা!

নবীন। বিয়ে যে কর্‌বো না—এমন কথাত আমি বল্‌চি না,—তবে আরও দুচার-বছর-দশবছর যা'ক্,—তারপর একটা দেখে শুনে বিয়ে করা যাবে—

প্রবীণ। এ-যে একরকম বিয়ে না-করাই হলো।—এখনও দশবছর পরে বিয়ের সম্বন্ধ হবে!—ভায়া! এ কাজটা কি ভাল হচ্চে?

নবীন। এর আবার ভালমন্দ কি আছে?

প্রবীণ। তা, আমি বুঝেচি,—তুমি বিয়ে ক'র্‌বে না। ভায়া তুমি যে বাড়ীতে আছ, সেখানে থাক্‌লে কি আর মানুষ, মানুষ থাকে। সে-যে কামরূপ কামিখ্যের মন্ত্র,—রেতে মানুষ, দিনে ছাগল!

এই কথা শুনিয়া নবীন-পুরুষ হাসিয়াই আকুল।

প্রবীণ। ভায়া, হেসো-না,—হেসো না! হাসি ভাল নয়! তুমি যে বাসায় আছ, সে বড় কুস্থান। ডাকিনী-মন্ত্রে মানুষকে যে উড়িয়ে নিয়ে যায়,—শুনেচ?—তা, সেখানে তাই। ঘাড়ের রক্ত চুষে খেয়ে ফেলে—

নবীন। দাদা! এত ভয় কর কেন?

প্রবীণ। ওহে! তোমরা ছেলে মানুষ, বুঝনা! তারা মায়ে-ঝীয়ে দুজনে না কত্তে পারে, এমন কাজ নেই। বরং তার মেয়েটা কিছু ভালো,—কিন্তু মা-বেটী জেয়ান্ত রাক্ষুসী।

নবীন। রাক্ষুসীই হোক, আর মানুষীই হোক,—আমার কেউ কিছু কত্তে পার্‌বে না। দাদা! তুমি ভেবো না।

প্রবীণ। আজকাল তোমার বাহার দেখে কিছু ভয় হয়! ওদিকে গয়া-কাশী-বৃন্দাবনে যেয়ে তীর্থও করা আছে, নাকে তিলক, গলায় তিনকণ্ঠী তুলসীর মালাও আছে;—এদিকে আতর-গোলাপ আছে, বাঁকা টেড়ী আছে, রঙ বেরঙের কাপড় জামা আছে, ফুলের মালা, ফুলের তোড়াও আছে? তা, এমন বয়সে

ওসব বাহার ত একটু হবেই,—তা, হোক্। তাতে আপত্তি করি না। তবে কি-না, আমি বলি, একটী বিবাহ কর,—সকল দিকেই শোভা পায়! এখন কি তোমার তীর্থ কর্‌বার বয়স?

নবীন। (হাসিয়া) মা-বাপের গয়ায় পিণ্ড না দিলে কি উদ্ধার আছে?—কেবল গয়া যাবো বলেই যাত্রা করি,—শেষে কেমন মন হ'লো,—৺কাশী-বৃন্দাবন না যেয়ে থাকৃতে পার্‌লাম না।—তাই দেড় মাসের স্থানে সাড়ে তিন মাস হলো।—আমি মনে করেছিলাম,—সাহেব ভারি রাগ কর্‌বেন! তা, কাল তাঁর বাসায় গিয়ে দুই সেলাম ঠুকে তাঁকে বশ করে এসেচি।

প্রবীণ। সাহেব খুবই রাগ করেছিলেন। একদিন আমায় বল্লেন,—যে ব্যক্তি চারি মাস কাজ ক'রে তিন মাস কামাই করে,—তাকে আর রাখ্‌তে নেই!

নবীন। সাহেব রাগই ত কত্তে পারেন। সাহেবের দোষ কি? সাহেবকে ত কাল দুই সেলাম ক'রে—খুসি কর্‌লাম। আর, বিবিকে খুসি ক'র্‌লাম—এক কাঁদি পাকা মর্ত্তমান কলা দিয়ে। তখন সাহেবের মেয়ে দুটী আমাকে এসে ধর্‌লে,—"আমাদের জন্ত কি এনেচো?" আমি কি করি—দু-সের সন্দেস এবং দশটা পাঁড় শশা তখনি কিনে আনা'লাম। মেয়ে দু-জন এবং স্বয়ং বিবি,—এই তিন জনে ঠিক যেন বানরীর মত হাম্‌ হাম্‌ ক'রে কলা, শশা ও সন্দেস খেতে লাগ্‌লো—

প্রবীণ। সে কথাটাও তোমাকে বল্‌বো-বল্‌বো মনে করেচি। তোমার গয়া যাবার পূর্ব্বেই দু-একটা লোক কাণাঘুষা আরম্ভ করেছিল,—'পোষ্ট-মাষ্টার সাহেবের বড়মেয়ের সঙ্গে, ছোট কেরাণী বাবুর ভাব কিছু বেশী বেশী হয়েছে!' তুমি গয়া যাবার

পর, একথা সহরময় রাষ্ট হয়ে পড়্লো। তার পর এখন, তিন চার মাস অতীত হয়েছে, লোকে সে কথা ভুলে গেছে, বা কিছু থেমে আছে। তাই বলি, সাহেবের বাড়ী এখন তোমার যাতায়াত না করাই ভালো।

নবীন পুরুষ হাসি-হাসি মুখে বলিলেন,—"তবে আমি যাই কোথা? যে বাসার সংস্রবে আমি আছি, সেখানে থাক্‌লে,—তারা মা-ঝিয়ে দুজনে আমাকে ডাকিনী-মন্ত্রে উড়িয়ে নিয়ে যাবে! মনিব-সাহেবের বাসায় গেলে, লোকে তার মেয়ের সঙ্গে আমার বদনাম রটাবে! যদি নগরের প্রান্তভাগে একটা বাসা করি,—তা'হলেও লোকে বল'বে—ও-লোকটা বিয়ে-থা করে নাই, কেবল মন্দ মতলবের জন্য একলা তেপান্তর মাঠে বাসা করেছে। তাই বলি, যাই কোথা? ক্রমে আমি মহামুস্কিলে পড়্লাম।

প্রবীণ। তোমার যে স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল, তাহা আমি জানি। তবে কি জান, ভায়া! তোমার বয়স্-কাল এখন খারাপ পড়েচে। একটুতেই তোমাদের এখন মন নেচে উঠে!

মনে মনে হাসিয়া—একটু স্যাকা সাজিয়া, নবীন পুরুষ উত্তর দিলেন,—"তবে কি আমার বাসা অন্য স্থানে কর্‌বো?"

প্রবীণ। আমার মতে তাই করাই ঠিক।—ঐ যে সাহেব আস্‌চেন!

প্রবীণ ব্যক্তি তখন হুঁকাটা লুকাইয়া রাখিলেন। নবীন-পুরুষ গলদেশ হইতে ফুলের মালা খুলিলেন; বুক্-পকেট হইতে ফুলের তোড়া লইয়া সাহেবের টেবিলের উপর রাখিলেন। গল্প বন্দ হইল। নীরবে কাজ-কর্ম্ম চলিতে লাগিল।

হুগলীর পোষ্ট-মাষ্টার—তখন একজন ফিরিঙ্গী-সাহেব

ছিলেন। তাঁহার দুই কন্যা এবং এক স্ত্রী। জ্যেষ্ঠকন্যাটির বয়স্ উনবিংশতি; কনিষ্ঠার বয়স্ চতুর্দ্দশ। উভয়েই অবিবাহিতা বালিকা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেই বটবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট সন্ন্যাসী কে? আর, সেই ডাক-ঘরের আশ্রিত ফুলমালাশোভিত নবীন পুরুষটীই বা কে?

এরাই দুই; দুয়েই এক। প্রণয়ি-যুগল-মধ্যে পরম-প্রীতির পূর্ণ লক্ষণ,—'আত্মা এক, দেহ দুই।' কিন্তু এ স্থলে আত্মাও এক, দেহও এক।

হরি এবং হর—উভয়ে স্বতন্ত্র পদবাচ্য হইলেও, মূলে এক। সন্ন্যাসী এবং নবীন-পুরুষ—উভয়ে পৃথক্ ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও, মূলে এক।

কালাচাঁদই সন্ন্যাসী; কালাচাঁদই নবীন-পুরুষ। কালাচাঁদই রাসতলায় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-কালের ফলাফল-গণক; কালা-চাঁদই ডাকঘরে মসীজীবী, কেরাণী-কুলতিলক।

গতি বিচিত্র, কর্ম্ম অদ্ভুত। শুনিলে, সহসা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ফলকথা, ঘটনা এইরূপই।

ঠাকুরদাদা, নাতীকে এক সর্ব্ব-সন্তাপ-হারিণী আশ্রয়ভূমি দান করেন। কোন্ গুণে সেই আশ্রয়-নিকেতন সর্ব্ব দুঃখ দূর করিতে সমর্থ,—তাহা আর এখন শুনিয়া কাজ নাই। প্রীতি-প্রফুল্লমনে কালাচাঁদ সেইখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

স্বয়ং ঠাকুরদাদা কালাচাঁদের আহারাদির ব্যয়ভার যোগাইতে লাগিলেন। চাল, ডাল, তেল, নুন, ঘি, কাঠ—সমস্তই মুদির দোকান হইতে, ঠাকুরদাদা, কালাচাঁদকে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই মুদিই মাছ, তরকারি, দুধ, দই, মিষ্টান্ন দিবার বন্দোবস্ত করিল।

মুদির নাম নফরচন্দ্র দাস। জাতিতে কৈবর্ত্ত। মুদি, কালাচাঁদের কাছে পয়সা চাহে না। দুই-একদিন অন্তর সে, কেবল এক-একবার আসিয়া বলে,—"হুজুরের কি চাই? একটা ফর্দ্দ ক'রে দিন,—আমি সমস্ত জিনিসই পাঠাবো।" কালাচাঁদের যাহা যাহা আবশ্যক হইত, তৎসমস্তই তিনি একটা কাগজে লিখিয়া দিতেন। কোন দিন সে ফর্দ্দে সহি করিতে ভুলিলে, মুদি যোড়হাতে বলিত,—"হুজুর! সইটে আজ করা হয় নাই।" কালাচাঁদ হাসিয়া তৎক্ষণাৎ অমনি স্পষ্টাক্ষরে নিজ নাম স্বাক্ষর করিতেন।

এ-দিকে মুদির খাতায় কালাচাঁদেরই নাম পত্তন হইল। প্রত্যহ খরচ পড়িতে লাগিল খুব; কিন্তু জমার দিকে প্রত্যহই শূন্য পড়ে। মুদি প্রায় প্রত্যহ একবার ঠাকুরদাদার বাসায় যায়,—তাঁহার সহিত কাণে কাণে কি ফুস্‌ফাস্ হয়,—আর, মুদি আহ্লাদে গদ্গদ হইয়া বাটীতে ফিরিয়া আইসে।

জমার দিকে শূন্য পড়ুক্, মুদি কিন্তু প্রত্যহই যথানিয়মে রসদ যোগাইতে থাকিল। কালাচাঁদের কাছে মুদি আসিত, প্রণাম করিত, যোড়হাত করিত, এবং জিজ্ঞাসিত,—"হুজুর। কি চাই?"

কালাচাঁদ প্রত্যহ একবার করিয়া, ঠাকুরদাদার বাসায় যাইতেন; প্রণাম করিতেন; ঠাকুরদাদা হাসিলে, হাসিতেন; শোকে

শোকান্বিত হইতেন; এবং ঠাকুরদাদা "না" বলিলে "না"—"হাঁ" বলিলে 'হাঁ' বলিতেন।

কয়েক দিন এইরূপে অতিবাহিত হইল। একদা কালাচাঁদ ঠাকুরদাদাকে বলিলেন,—"দাদামোশাই! আপনি ভিন্ন আমার গতি নাই। আপনি আমার একটা উপায় না ক'রে দিলে, আর কে দিবে?"

ঠাকুরদাদা চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল। ভাবিলেন,—"এই গো! এইবার বুঝি কালাচাঁদ বিষয়-বিভাগের প্রস্তাব করিবে!" একটু নীরব থাকিয়া, মধুরস্বরে তিনি কালাচাঁদকে কহিলেন,—"ভায়া! তোমাকে ত আমার অদেয় কিছুই নাই! বল,—তোমার যা মনের ইচ্ছা,—আমাকে খুলে বল।"

কালাচাঁদ। আপনি আর কতদিন আমার আহার যোগাবেন? আমার ইচ্ছা,—আপনি একটী আমার চাকরি ক'রে দেন! আপনি মনে করলে, এখনি আমার চাকরি হ'তে পারে।

ঠাকুরদাদা। (স্বগত) রক্ষেই পাই! চাই—চাকরি!—বিষয়-ভাগ নয়!—এর জন্য তোমার এত ভাবনা কি? (প্রকাশ্যে) ভায়া! এ কথা আমাকে তোমার বলাই অধিক! আমি কি নিশ্চিন্ত হয়ে আছি? তোমার কিসে ভাল হয়,—তুমি কিসে দশজনের একজন হ'য়ে বেড়াও—ইহাই আমার অহরহ চিন্তা! তোমার ভারই ত আমার উপর!

কালাচাঁদ। তা বৈ কি, দাদা-মোশাই! আপনি ছাড়া আমার আর কে আছে?

ঠাকুরদাদা। চাকরির কথা কাল তোমাকে আমি বল্‌বো।

কালাচাঁদ। যে-আজ্ঞে, দাদা মোশাই!

ঠাকুরদাদা। কিন্তু, ভায়া! একটা বিষয়ে তোমার উপর আবার দুঃখ হ'লো।

কালাচাঁদ। আজ্ঞে,—না বুঝে কখন যদি কিছু বলে থাকি, আমাকে বালক ব'লে ক্ষমা ক'র্‌বেন। দাদা-মোশাই! আপনা বই আমি আর কাহাকেও জানি না।

ঠাকুরদাদা। তাইত আমিও চাই। আমি যেমন তোমায় প্রাণের সহিত ভালবাসি,—তোমাকে আপন বলিয়া ভাবি; সেই রূপ তোমারও উচিত, আমাকে প্রাণের সহিত ভক্তি করা, এবং আমাকে আপন বলিয়া ভাবা।

কালাচাঁদ। দাদা-মোশাই! আমি ত তাই করি!

ঠাকুরদাদা। ভায়া! আমাকে যদি সেইরূপই ভাবতে, তা'হলে এখানে এসেই, আমার মুখের উপর, বল্‌তে পার্‌তে না,—'দাদা-মোশাই! আপনি আর কতদিন আমার আহার যোগাবেন?" ভায়া! তোমার ঐ কথাটা আমার অন্তরে গেঁথে আছে। যদি প্রাণ খুলে দেখাবার হ'তো, তা'হলে তোমাকে আমি এখনি দেখাতাম।

বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা তখন চক্ষুদ্বয়ে কাপড় দিলেন। ক্রন্দনের সুরে হাউ-হাউ করিয়া ধ্বনি করিলেন। কালাচাঁদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—"ওরে কেলেসোণা! তুই আমার পর নইস্ রে! তুই আমার আপনার প্রাণের সামগ্রী রে। তোকে বুকে রাখলে আমার বুক জুড়ায় রে! কেলেমাণিক! তুই কেমন ক'রে, মুখ দিয়ে ঐ কথা বা'র কল্লি রে!

কালাচাঁদ সেই গলা-ধরাধরি ব্যাপারে কিঞ্চিৎ বিব্রত হইলেন।

ভাবিলেন,—"বাপ্‌! এ-কি এ? এমন পাকা, ওস্তাদী-ধরণ ত আমি কখন দেখি নাই!"

প্রকাশ্যে কালাচাঁদ কহিলেন,—"দাদা-মোশাই! আমি ভুলেই ব'লেচি,—মনোভ্রমে কথাটা বেরিয়ে পড়েচে। আপনি ক্ষমা করুন।"

ঠাকুরদাদা তখন এক ঘটী জলে মুখ ধুইয়া, গামছায় মুখ মুছিলেন। ক্রন্দনের ভাঙ্গাভাঙ্গা সুর অন্তর্হিত হইল। একটু সুস্থ হইয়া ঠাকুরদাদা আরম্ভ করিলেন,—"ভায়া! তুমি চাকরি কর,—দু-টাকা রোজগার-পত্র কর,—দশ টাকা জমাও!—এ সব দেখে আমার সুখ হোক। তোমাকে খেতে-পরতে-মাখতে আমি চিরকালই দিব,—সে চিন্তা তোমার নাই। সে ভার আমার রহিল।" কালাচাঁদ যুক্তকরে কহিলেন,—'তথাস্তু।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

হুগলীর পোষ্ট-মাষ্টার 'সাহেব' কন্যাদায়গ্রস্ত। কন্যা অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিতেছে,—জাতি-কুল নাশের সম্ভাবনা,—অথচ সুপাত্র মিলিতেছে না;—অতএব দায়গ্রস্ত;—তাহা নহে! কন্যা ভরণ-পোষণের ব্যয়-ব্যাপারেই একান্ত-দায়গ্রস্ত। সেকালে একটাকা মণ চা'ল হইলেও, টাকায় আড়াই সের ঘি হইলেও,—সাহেবটী কন্যাদায়গ্রস্ত।

সাহেব মোটে মাহিনা পান একশত পঁচিশ টাকা। গুণবতী কন্যা-দ্বয়কে শিক্ষা-সহবৎ দিতে, আদব-কায়দায় সুরঞ্জিত করিতে,

ধর্ম্মে কর্ম্মে পণ্ডিতা করিতে, ১২৫৲ টাকা কেন, ২২৫৲ টাকাতেও তাহা সঙ্কুলান হইবার নহে। অথচ আয় ঐ ১২৫৲ টাকার অধিক নহে। তবেই এখন বুঝুন,—কিরূপে সাহেবের সংসার সচ্ছল হইবে?

প্রথমত, সাহেবের যিনি গৃহিণী, তিনি আহারাদি কার্য্যে কিঞ্চিৎ সুপটু। ইহা ব্যতীত ষড়্‌রিপুর আধিপত্যটা তাঁহার শরীরে কিছু অধিক প্রবল ছিল। অন্যান্য রিপুদমনে তিনি কিরূপ সক্ষম ছিলেন, তাহা অবগত নহি; কিন্তু ক্রমশ বয়োবৃদ্ধি সহকারে 'লোভ' রিপু বড়ই অদম্য হইয়াছিল। ইহার ফলে, সাহেবকে কোন কোন দিন অনশনে থাকিতে হইত।

দ্বিতীয়ত,—জ্যেষ্ঠা কন্যাটী সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শিনী! কোনও বিষয়ে তাঁহার উনিশ-কুড়ি ছিল না;—মাত্রা পূর্ণ! কি নৃত্য-গীত বাদ্য, কি রঙ্গ-রস কৌতুক, কি আহার-বিহার-বেশ,—কিছুতেই তাঁহাকে কেহ পরাভব করিতে পারে নাই। ইহার ফলে, সাহেবকে কোন কোন দিন মার্ খাইতে হইত।

তৃতীয়ত,—কনিষ্ঠা কন্যাটী কামচারিণী,—অগ্নিস্ফুলিঙ্গময়ী! রাগ তাঁর কথায়-কথায়। ক্রন্দন তাঁর পলকে পলকে। অভিমান তাঁর অহরহ। কোনরূপ পোষাকই তাঁর পছন্দ হয় না; কোনরূপ ভক্ষ্যদ্রব্যই তাঁর ভাল লাগে না; কোনরূপ রীতিপদ্ধতিতেই তাঁর প্রীতি হয় না। ইহার ফলে, সাহেবকে কোন কোন দিন বিবাগী হইতে হইত।

এ প্রকার অবস্থায় এক-শ পঁচিশ টাকায় সাহেবের অবশ্যই কুলায় না। ধার-সাগরে সাহেব ডুবিয়া আছেন। বাড়ী-ভাড়ার ধার, বাবুর্চির ধার, সাহা-কোম্পানীর ধার, পাঁউরুটীওয়ালার ধার, মোরগ-বেচা-মুসলমানের ধার, ভাড়াটীয়া গাড়ীর ধার, দুধ-ঘিয়ের

ধার, মাখনের ধার, ময়দার ধার,—চারিদিকেই ধার। যেদিকে চাই, সেই দিকেই ধার। আকাশে ধার, পাতালে ধার, পৃথিবীতে ধার!

যখন কিছু বাড়াবাড়ি হইত, অর্থাৎ সাহেবের নামে যখন ছোট-আদালতে নালিষ হইত, সাহেব তখন মহাজন অন্বেষণ করিতেন। এত বড় হুগলী সহরের মধ্যে একজন ছাড়া আর কেহই সাহেবের মহাজন হইত না। সেই অদ্বিতীয় মহাজনের নাম,—"রায় শ্রীহরিতারণ দাসদত্ত বাহাদুর"—ওরফে কালাচাঁদের ঠাকুরদাদা।

সম্পত্তিশালী-লোক ব্যতীত, বিষয়াদি আবদ্ধ রাখা ব্যতীত, এবং পাকা রেজষ্টরি করা দলিল ব্যতীত,—ঠাকুরদাদা কস্মিন্‌-কালে কাহাকেও টাকা কর্জ্জ দেন নাই। তবে তিনি এই ধার-শর-শয্যায়-শায়িত সাহেবকে কেমন করিয়া, কোন্ হিসাবে কর্জ্জ দিবেন?

দেওয়ানজী চিরদিনই কিছু কিছু সাহেব-প্রিয়, শ্বেত-চর্ম্মের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু এই বৃদ্ধবয়সে ধবলাঙ্গের প্রতি তাঁহার অনুরাগ অধিক দৃষ্ট হইতে লাগিল। কমিশনর, জজ, মাজিষ্টর, পুলিস-সাহেব,—এই চারি জনের গৃহে মাসে মাসে ফলমূল মিষ্টান্নাদি ভেট যাইত। ইহাদের মধ্যে যে কোন ধবলাঙ্গের আমোদ-প্রমোদের জন্য, যে দিন বাগান-বাটী দরকার হইত,—দেওয়ানজী সেই দিনই তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে নিজের বাগান-বাটী ছাড়িয়া দিতেন। ঘোড়-দৌড় হইবে, সাহেব-বিবির নাচ হইবে—বার-আনা ব্যয়-ভার দেওয়ানজী বহিতেন। কোন ধবলাঙ্গ টাকা ধার চাহিলে, তিনি 'অনুগ্রহ' বলিয়া মনে করিতেন। টাকা

বলিলেই, অমনি টাকা আসিয়া পড়িল। খত-তমস্যুকের নাম-গন্ধও ছিল না।

পোষ্টাফীসের সাহেবটীর রঙ একটু ময়লা। খুব বেশী কালো নয়,—রঙটা কেমন মেটে-মেটে। পেঁশুটে কি? রঙ যাহাই হউক, তিনি সাহেব ত বটেন। বিড়াল আকারে ক্ষুদ্র হইলেও, ব্যবহারে অপেক্ষাকৃত নম্র হইলেও,—ব্যাঘ্র-জাতীয় বটে'ত! ডাকঘরের সাহেবটীর রঙ ময়লা হইলেও, মাহিয়ানা কম হইলেও, সাহেব-জাতীয় বটেন'ত! জাতির 'গুণ' অবশ্যই কিছু-না-কিছু থাকিবেই থাকিবে!

বিষয়-সম্পত্তি কিঞ্চিন্মাত্র না থাকুক, সেই 'গুণটুকু' আছে বলিয়াই, সাহেবকে ঠাকুরদাদা সময়ে সময়ে টাকা ধার দিয়া থাকেন। তবে সাহেব ১০০৲ টাকা চাহিলে, পান ৫০৲ টাকা। টাকার জন্য সাহেবকে দু-বেলা ঠাকুরদাদার বাসায় আনাগোনা করিয়া তোষামোদ করিতে হয়। হ্যাণ্ডনোটও দিতে হয়।

এই সূত্রেই সাহেবের সহিত ঠাকুরদাদার ঘনিষ্ঠতা। ক্রমশ এত মাখামাখি ভাব হইল যে, ঠাকুরদাদা বিশ্রামার্থ শনিবারে বাগানবাটীতে বেড়াইতে গেলে, সাহেবও সকন্যা-সস্ত্রীক তথায় গিয়া উপনীত হইতেন। ঠাকুরদাদা বিবির সহিত কর-মর্দ্দন করিতেন, মেয়ে দুটীর গায়ে পিঠে হাত বুলাইতেন,—আমোদ-প্রমোদে কাল অতিবাহিত হইত।

সাহেবের সহিত ঠাকুরদাদার আজকাল যদিও ততদূর মাখা-মাখি ভাব নাই, তবে মুখের আলাপ, বাধ্যবাধকতা—অবশ্যই অধিক পরিমাণে আছে।

ঠাকুরদাদা সাহেবকে অনুরোধ ধরিলেন,—কালাচাঁদের

একটী চাকুরি করিয়া দিতে হইবে। এক সপ্তাহ মধ্যে কালাচাঁদের ডাকঘরে চাকুরি হইল! পদ,—কনিষ্ঠ কেরাণিগিরি। বেতন মাসিক ২০৲ টাকা।

পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কালাচাঁদের আহ্লাদ আর ধরে না। দুই দিনেই সাহেবটী কালাচাঁদের বশ হইলেন। প্রথমদিন সাহেবের বাড়ী এক খাসি উপঢৌকন গেল। তারপর একদিন ঘি, ময়দা, সন্দেশ। অবশেষে কালাচাঁদ স্বয়ং একদিন সাহেবের কুঠীতে গমন করিলেন। কালাচাঁদকে দেখিয়া সাহেবের গৃহিণী বড়ই আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। কন্যাদ্বয়ও কালাচাঁদের সহিত কত হাসি-তামাসা কৌতুক করিল। সেদিন আনন্দ-মহোৎসবের এক তরঙ্গ বহিয়া গেল কালাচাঁদের প্রত্যাগমন-কালে গৃহিণী এবং কন্যাদ্বয়, তাঁহার হাতে ধরিয়া বলিয়া দিলেন,—"দেখো, তুমি যেন প্রতি শনিবার আমাদের বাটীতে আসিতে ভুলিও না।"

কালাচাঁদ প্রতি শনিবার বৈকালে নানাবিধ আহারীয় সামগ্রী লইয়া সাহেবের বাটীতে যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। কালাচাঁদ চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেই, জ্যেষ্ঠ কন্যাটী তাঁহার কাছ-ঘেঁসিয়া অন্য একখানি চেয়ারে বসিয়া গল্পারম্ভ করিত। একদিন কথাচ্ছলে জ্যেষ্ঠকন্যা বলিলেন,—"দত্ত! তুমি গান গাহিতে জান?

কালাচাঁদ। না।

কন্যা। হারমোনিয়ম্ বাজাইতে জান?

কালাচাঁদ। না।

কন্যা। বল্-নাচ জান?

কালাচাঁদ। না!

কন্যা। তুমি বড় অরসিক লোক! তোমার কাছে আমি বসিতে চাই না।

কালাচাঁদ। বসুন, বসুন! আমি ওসব জানি না—তা আমি কি করিব?

কন্যা। আচ্ছা, আমি যদি তোমাকে শিখাই, তা হ'লে তুমি শিখিতে রাজী আছ কি না?

কালাচাঁদ ভাবিলেন,—"এ মেয়েটার কতদূর দৌড় একবার দেখি না কেন!" প্রকাশ্যে তিনি বলিলেন,—"রাজী আছি।"

কন্যা। এ কথা শুনে বড় সুখী হ'লাম। আচ্ছা, আমি যে তোমাকে গান-বাজনা শিখাবো, আমার সে পরিশ্রমের পারিতোষিক কে দিবে?

কালাচাঁদ। আমি গরীব লোক। টাকা-কড়ি কোথা পাবো?

কন্যা। (হাসিয়া) তোমার কি এমন কোনও জিনিস নাই—যাহা তুমি আমাকে আনন্দের সহিত দান করিতে পার?

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) প্রত্যহ একগাছি করিয়া ফুলের মালা, এবং একটী ফুলের তোড়া দিতে পারি।

কন্যা। (হাসিয়া) ইহাই যথেষ্ট! সাবাস্ দশুজা! তবে—এস, তোমার সহিত একবার করমর্দ্দন করি।

এই বলিয়া সেই উনবিংশবর্ষীয়া বালিকা-কন্যা, স্বয়ং বলপূর্ব্বক কালাচাঁদের দক্ষিণ-কর গ্রহণ করিয়া, সজোরে মর্দ্দন করিয়া দিলেন!

তখন কালাচাঁদ একবার এদিক ওদিক চাহিলেন; মাথা চুলকাইলেন। চুলকাইয়া, কন্যাকে কহিলেন,—"আজ তবে আমি আসি।"

এই বলিয়া কালাচাঁদ উঠিয়া পড়িলেন। কন্যা অমনি কালাচাঁদের হাত ধরিয়া বলিলেন,—"এখনি যাওয়া কেন? দত্ত! ব’স, ব’স! আমার একটা গান শুনিবে-না?"

কালাচাঁদ কি করেন, অগত্যা বসিলেন। বলিলেন,—"দেখুন, বাড়ীতে একটু বিশেষ কাজ আছে,—আমি আজ যাই, কাল না-হয় আসবো!"

কন্যা। তুমি বিবাহ কর নাই। ঘরে তোমার সুন্দরী স্ত্রী নাই। স্ত্রী থাকিলে, তিনি তোমার মুখ চাহিয়া এতক্ষণ হয় ত অপেক্ষা করিতেন। সুতরাং বাড়ীতে এখন যাইয়া তোমার ফল কি?

কালাচাঁদ। (হাসিয়া) আমার অন্য একটু কাজ আছে।

কন্যা। (হাসিয়া) আমার কাছে থাকিতে কি তোমার কষ্ট হয়?—তা হবে বৈকি? আমি ত আর সুন্দরী নই!

কালাচাঁদ দেখিলেন, ঘোর বিপদ! ক্রমশ বৃদ্ধির দশা! কন্যা বলিতে লাগিলেন,—"তুমি যদি আমাকে ভাল-বাসিতে,—তা হ’লে এমন জোর ক’রে উঠে যেতে চাইতে না। আচ্ছা,—তুমি ঠিক্ ক’রে বল,—আমাকে ভালবাস কি না?

কালাচাঁদ দেখিলেন, দুই দিকেই গোল। যদি বলি ‘ভালবাসি,’—তাহা হইলে মেয়েট একেবারে পাইয়া বসিবে। যদি বলি ‘ভালবাসি-না,’—তাহা হইলে মেয়েটা একটা অকাণ্ড-কাণ্ড বাধাইতে বা অঘটন ঘটনা ঘটাইতে পারে। করি কি? বলি কি?—কিন্তু ‘ভালবাসি’ বলিলে, বোধ হয় উপস্থিত কোন বিপদ দেখি না। যাই-হউক, একটা ত কথা কহিতেই হইবে।

এই ভাবিয়া কালাচাঁদ বলিলেন,—"হাঁ, তোমাকে ভালবাসি বৈকি?"

কন্যা। আমাকে যদি সত্য-সত্যই ভালবাস, তবে আমাকে সঙ্গে লইয়া এখনি গাড়ী করিয়া চুঁচুড়া-ফরেষ-ডাঙ্গা দিয়া বেড়াইয়া আনো দেখি?

কালাচাঁদ। আজ সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে, বেড়াইয়া আসিতে রাত হইবে। আগামী শনিবার তোমাকে লইয়া বেড়াইতে যাইব।

কন্যা। তুমি বড়ই নিষ্ঠুর।

কালাচাঁদ ভাবিলেন, "মেয়েটার সঙ্গে এত বাড়াবাড়ি করা ভাল হয় নাই। এখন কোন্ উপায়ে ইহার হাত হইতে ত্রাণ পাইব?" প্রকাশ্যে বলিলেন,—"আমি নিষ্ঠুর কিসে?"

কন্যা। যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের অপমান করে, সেই নিষ্ঠুর।

কালাচাঁদ। আমি ত তোমার অপমান কিছুই করি নাই।

কন্যা। আমি মুখ ফুটিয়া বলিলাম,—'এস আমরা দুজনে একত্র বেড়াতে যাই;'—কিন্তু তুমি সে কাজে রাজী হইলে কৈ? ইহা অপেক্ষা স্ত্রীজাতির আর অধিক অপমান কি আছে?

কালাচাঁদ। রাত্রি হইয়াছে। এ সময় দুজনে একত্র বেড়াইতে গেলে, তোমার মাতা রাগ করিতে পারেন।

কন্যা। মা, কখনই রাগ করিবেন না। আমাদের জাতির সেরূপ কুসংস্কার নাই। তুমি মিছামিছি মায়ের ওজর কর কেন? স্পষ্ট করিয়া খুলিয়াই বল না,—'আমি বেড়াইতে স্বীকৃত নহি।'

কালাচাঁদ। এখন কি গাড়ী পাওয়া যাবে?

কন্যা। গাড়ী এখনি চাকর আনিয়া দিবে।

কালাচাঁদকে আর কোন কথা কহিতে হইল না। কন্যা চৌকী হইতে উঠিয়া, টেবিলের নিকট গিয়া চাকরের উদ্দেশে ঘণ্টা-ধ্বনি

করিলেন। কিন্তু কেহই সাড়া দিল না। আবার ঘণ্টাধ্বনি হইল,—অথাচ কেহ আসিল না। কন্যা তখন কুপিতা বাঘিনীর ন্যায় বাহিরে গেলেন—মাতাকে জিজ্ঞাসিলেন;—'চাকর কোথা?' মাতার নিকট হইতে যাহা শুনিলেন, তাহার ভাব এইরূপ;—"চাকরের চারি মাসের মাহিনা বাকী পড়িয়াছে। প্রত্যহ সে মাহিনার তাগাদা করে। অদ্য কিছু উচ্চরবে তাগাদা করায় সাহেব তাহাকে মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন।"

কন্যা আসিয়া কালাচাঁদকে কহিলেন,—"চাকর এখন নাই। তুমি ত নিজে গিয়া গাড়ী আনিতে পার। এখনি যাও; শীঘ্র গাড়ী আন। কিছুতেই যেন বিলম্ব না হয়। কোচম্যানকে ঘোড়া খুব ছুট কাটাইয়া আনিতে বলিবে। আমি এই গৃহদ্বারে তোমার অপেক্ষায় বসিয়া রহিলাম। দেখিও,—কিছুতেই যেন দেরি না হয়। উঠ—উঠ—শীঘ্র উঠ। দৌড়িয়া যাও।"

কালাচাঁদ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলেন। সেদিন আর ফিরিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ কেবল কেরাণী নহেন। কেবল যে, তিনি ডাকঘরে গিয়া 'দশটা-পাঁচটা' কলম-পেষণ করেন,—তাহা নহে। তাঁহার আরও অন্য অনেক কাজ ছিল।

কালাচাঁদ অতি প্রত্যুষে উঠিতেন,—প্রত্যেক সম্ভ্রান্ত, সম্পত্তিপন্ন এবং গৃহস্থ ব্যক্তির বাসায় একবার করিয়া যাইতেন। একই লোকের বাসায় প্রত্যহ যে তিনি যাইতেন, বা যাইতে সক্ষম

হইতেন,—তাহা নহে। নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে আজ ইহাঁর বাসায়, কাল তাঁহার বাসায়, পরশ্ব উহাঁর বাসায়,—এইরূপ নিয়মে তাঁহার গতায়াত ছিল। ফল কথা, এক মাসে,—ত্রিশ দিনে, এক এক গৃহস্থের বাটী দুই তিন বার করিয়া তাঁহার যাওয়া ঘটিত।

হুগলীর অধিকাংশ ভদ্র-লোকই কালাচাঁদকে ভাল বাসিতেন। কালাচাঁদকে দেখিলেই কেমন তাঁহাদের অন্তরে আনন্দের উদয় হইত। কালাচাঁদের সদা হাসি-হাসি মুখ, সরস-সরস কথা, কালো কালো-নবীন-নধর গড়ন,—এই ভাব দেখিয়াই লোকের কেমন প্রাতি জন্মিত। কালাচাঁদ লোকের নিকট "আত্ম-তত্ত্ব" গোপন রাখিতেন। তিনি সকলেরই কাছে একটু ন্যাকা-ন্যাকা, বোকা-বোকা, আদুরে-আদুরে ভাব দেখাইতেন। সে ভাবে লোকে স্বতই সন্তুষ্ট হইত।

ক্রমশ কালাচাঁদ জনসমাজে একজন "খাইয়ে" বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। রাষ্ট্র হইল,—কালাচাঁদ একটা গোটা বড় কাঁঠাল একবারে খাইতে পারেন। মহিলাকুল মাঝে, এমন সংবাদও প্রচার হইল,—কালাচাঁদ, এক ধামা মুড়ি, আটটা ঝুনা নারিকেল এবং আড়াই-সের কাঁচা-গোল্লা প্রাতে জল-যোগ করেন। গৃহ-দাসী-মণ্ডলীতে এমন কথাও কাণাকাণি হইল,—কালাচাঁদের ভাত রাঁধিবার হাঁড়ি বাজারে কিনিতে মিলে নাই; সেই জন্য কুমার আসিয়া ফরমাইস মত মাপ লইয়া বড় হাঁড়ি গড়িয়া দিয়াছে। ফল-কথা, হুগলীতে কালাচাঁদের নামডাক পড়িয়া গেল!

ইহার ফলে, অনেকের বাড়ী কালাচাঁদের আহারের নিমন্ত্রণ হইতে লাগিল। বৌ-ঝী পর্য্যন্ত কবাটের ফাঁক দিয়া, কালাচাঁদের খাওয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। কোন এক বাটীতে তাঁহার খাওয়া

হইলে, সেই পাড়ার পাঁচ-বাড়ীর মেয়ে, দলে-বলে, কালাচাঁদের ভোজন-কাণ্ড সন্দর্শনার্থ সমাগত হইতে থাকিল। কালাচাঁদ ভাবিতে লাগিলেন, "এ, এক বড় মন্দ মজা নয়! বেশী খাইলেই যদি লোককে খুসীতে রাখিতে পারা যায়, তবে আমি বেশী না খাইব কেন?" এইরূপ ভোজন-নিমন্ত্রণে, কালাচাঁদ তাঁহার পরিমিত আহারের দুইগুণ-তিনগুণ খাইতে আরম্ভ করিলেন। তিনি কতরূপ কল-কৌশল মায়াজাল পাতিলেন। একটা কৌশলের কথা বলি। বিশ-পঁচিশ জন ব্যক্তি একত্র খাইতে বসিলে, দর্শকমণ্ডলী,—কে অধিক খাইতেছে, কে কম খাইতেছে, এ বিষয়ে প্রথমে ততটা লক্ষ্য রাখেন না, যতই আহার-কার্য্য শেষ হইতে থাকে, ততই দর্শকের ভোজনকারীর পাতের প্রতি অধিক দৃষ্টি পড়ে। তখন, দর্শকমণ্ডলী মধ্যে—"পাতে আরও দাও, আরও দাও"—এইরূপ ধ্বনি উঠে। এই, শেষকালে যিনি অধিক খাইতে সক্ষম হন, তাঁহারই নাম বাজিয়া যায়। কালাচাঁদও এইরূপ নীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি অন্যের বাড়ী পঙ্‌ক্তি-ভোজনে খাইতে বসিলে, প্রথম হইতে একটু হাত রাখিয়া খাইতেন। শেষে হাত দেখাইতেন। যখন অন্য সকলের ভোজন শেষ হইয়াছে, কালাচাঁদের খাওয়া তখনও শীঘ্রহস্তে—হুড় হুড় শব্দে চলিতেছে। বহু লোকে চিত্রার্পিতের ন্যায় অনিমিষলোচনে তাহা দেখিতেছেন। চারিদিক হইতে 'বাহবা' পড়িতেছে। কালাচাঁদ মনে মনে বলিতেছেন,—'কেমন ঠকাইয়াছি! প্রথমে না খাইয়া, শেষে কেবল কসরৎ দেখাইতেছি।'

এইরূপ কৌশল ব্যতীত, আরও দু-একটা তুকতাক ছিল। আহার করিতে আসিবার পূর্ব্বে তিনি এমন কোন প্রক্রিয়া সাধন

করিতেন,—যদ্দ্বারা তাঁহার ক্ষুধা খুব প্রবলা হইত। আহারের চব্বিশ-ঘণ্টা পূর্ব্বে সংবাদ পাইলেই, কালাচাঁদের ঐরূপ প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সবিশেষ সুবিধা ঘটিত।

একেত কালাচাঁদ একজন প্রকৃতই 'খাইয়ে' পুরুষ,—তাহার উপর ঐ কৌশল এবং প্রক্রিয়া,—এবং সেই সঙ্গে প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা,—সুতরাং কালাচাঁদের ভোজন যে, বিরাট বিভীষণ ভোজন হইবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি?

এক ঢিলে দুইটী পাখী মরিত। কালাচাঁদের রসনারও তৃপ্তি-সাধন হইত,—এবং লোকরঞ্জন-রূপ যে, তাঁহার গভীর উদ্দেশ্য, তাহাও সুসিদ্ধ হইত!

কালাচাঁদ যেখানেই প্রভাতে বেড়াইতে যাউন,—বাসায় ফিরিবার সময়, একবার ঠাকুরদাদার বাসা হইয়া তাঁহাকে আসিতেই হইবে। সেখানে প্রত্যহ 'হাজিরা' লেখান চাই! যেদিন অধিক বেলা হইত, সেদিন ঠাকুরদাদার পদযুগলে একটী প্রণাম করিয়াই তিনি চলিয়া আসিতেন।

পথে এক এক দিন একটু আধটু গোলযোগও ঘটিত। অর্থাৎ, পতিতপাবন পরামাণিক, কালাচাঁদকে পথে দেখিলেই দৌড়িয়া পলাইত। তখন পতিত আর পেছু-পানে চাহিত না, উর্দ্ধশ্বাসে লম্ফালম্ফে ছুটিত! কালাচাঁদও, গলা-খেঁকারি দিতে-দিতে পতিতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ হন্ হন্ চলিতেন। এক এক দিন ব্যাপার কিছু গুরুতর হইত। এক পথ দিয়া কালাচাঁদ আসিতেছেন;—পতিত, তাহা দেখিয়া, ঠিক তাহার বিপরীত পথ ধরিল। কালাচাঁদ অমনি দ্রুতপদে অন্য এক সোজা পথ দিয়া, পতিত যে পথে গিয়া পড়িবে, ঠিক সেই পথের মোড়ে আগে আসিয়া ঈষৎ প্রচ্ছন্নভাবে

দাঁড়াইলেন। যাই পণ্ডিত সেই মোড়ে আসিল, অমনি কালাচাঁদ অন্তরাল হইতে বাহির হইয়া, পণ্ডিতের মুখের কাছে হাত-তালি দিয়া "হো-হো" শব্দ করিয়া উঠিলেন। তখন পণ্ডিত ভয়বিহ্বল হইয়া "বাপ্‌! বাপ্‌" রবে দৌড়িয়া পলাইল। কালাচাঁদ হাসিতে হাসিতে অন্য পথ দিয়া বাসায় চলিয়া আসিলেন।

কালাচাঁদ সন্ধ্যার সময় বড় একটা বাসা হইতে বাহির হইতেন না। বাসায় বসিয়া একাগ্র-মনে কখন পড়িতেন, কখন লিখিতেন। কখন বা আবাস-বাটীর সংলগ্ন পুষ্পোদ্যানে মৃদুল-সান্ধ্য-সমীরণ সেবন করিতে করিতে, ফুল-সৌরভে মোহিত হইয়া আপন-মনে বিচরণ করিতেন,—অথবা মালা-গাঁথিবার জন্য পুষ্পচয়নে ব্যাপৃত থাকিতেন। কোন দিন বা নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতীরে বসিয়া জ্যোৎস্না জড়িত গঙ্গার তরঙ্গমালা গণনা করিতেন। তবে এরূপ শুনা গিয়াছে,—কালাচাঁদ এক-আধ দিন, গোপনে, সকলে ঘুমাইলে, রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের পর বাসা হইতে বহির্গত হইয়া কোথায় চলিয়া যাইতেন; পর দিন প্রাতে আবার বাসায় ফিরিয়া আসিতেন।

চাকুরি হওয়ার এক মাস পরে কালাচাঁদ পোষ্ট-মাষ্টার সাহেবের নিকট এক মৌখিক দরখাস্ত করিলেন। দরখাস্তের মর্ম্ম এই,—"আমি একবার মামার বাড়ী যাইব। চারি দিনের ছুটী চাই।" এই ছুটী প্রার্থনার তিন দিন পূর্ব্বে, কালাচাঁদ সাহেবকে দুইটী পাঁঠা, তদপযুক্ত ঘি-মসলা, দশ সের আটা এবং পাঁচ সের রসগোল্লা উপঢৌকন পাঠাইয়াছিলেন। সুতরাং দরখাস্ত করিবামাত্র ছুটী মঞ্জুর হইল।

কালাচাঁদ সেই দিন রাত্রেই হৃষ্টচিত্তে মামার বাড়ী যাত্রা করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ যখন কারাগারে অবস্থিতি করিতেন, তখন তাঁহার অনেক পাকা, ওস্তাদ ডাকাইতের সহিত আলাপ-পরিচয় হইয়াছিল। তাহাদের নিকট হইতে তিনি সাপ-ধরা এবং বশীকরণ প্রভৃতি অনেকরূপ উৎকট-ব্যাপারের মন্ত্র-তন্ত্র-ঔষধাদি শিখিয়াছিলেন।

কালাচাঁদকে সহসা সহজে কেহ ডাকাত বলিয়া চিনিতে না পারে,—এইজন্য তিনি পোষ্টাফীসের চাকুরি গ্রহণ করেন। ঘোমটা দিয়া বেশ্যা সতী সাজে। চাকুরি-রূপ পর্দ্দার ভিতর থাকিয়া কালাচাঁদ সাধু সাজিলেন।

কালাচাঁদ বাহিরে সাধু হইলেন বটে, ভিতরে কিন্তু পূর্ণমাত্রায় ডাকাত রহিলেন। চুরি-ব্যবসা কিসে উত্তমরূপে চলে, ইহাই তখন তাঁহার চিন্তার একমাত্র বিষয় হইল।

একা ডাকাতি করিব, না দল বাঁধিব? একমাত্র স্বত্বাধিকারী হইব, না ইংরেজী-মতে জয়েণ্ট-ষ্টক-কোম্পানী-লিমিটেড খুলিব? ব্যবসাটা কি এইরূপ নামেই চলিবে,—"দত্ত এণ্ড কোং লিমিটেড? দল বাঁধিলে মোদ্দা গোল ঢের! কিন্তু একা ব্যবসা চালাইলেও ত, সঙ্গে দুই চারি জন মুটেগোছ লোক আবশ্যক হইবে। সুতরাং মাহিনা দিয়া লোক ত রাখিতেই হইতেছে! কিন্তু মাহিনা দিয়া লোক রাখিলে ভাল কাজ করিবে কি? যে কাজে সঙ্কটে প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে, সে কাজে বেতনভুক্ কর্ম্মচারী লইলে সুবিধা হইবে কি? মাসিক পাঁচ টাকা মাহিনার লোভে কে বল

প্রাণের মায়া ছাড়িবে? প্রাণের ন্যায় প্রিয়তম বস্তু সংসারে আর কি আছে?

তবে কি দল বাঁধাই সুযুক্তি? দলস্থ প্রত্যেক লোককেই এ ব্যবসার অংশীদার করিয়া লইব। অংশীদার হইলে, ব্যবসার উন্নতির জন্য সকলেই প্রাণপণে কাজ করিবে। সুতরাং ব্যবসাও শীঘ্র ফলাও হইয়া পড়িবে, এবং লাভও প্রচুর হইবে।

কিন্তু মাহিনার লোক-দ্বারা কি একবারেই কাজ অচল হইবে? এই ত শত-শত সহস্র-সহস্র সিপাহী—কেবল মাসিক ছয় বা সাত টাকার জন্য ইংরেজরাজের গোলাম হইয়াছে—শীত-বর্ষা-গ্রীষ্মে,—কালাকাল বিচার না করিয়া, যখন-তখন মরুভূমি, পর্ব্বত, সমুদ্র লঙ্ঘন করিতেছে,—ইংরেজসেনাপতির ইঙ্গিতমাত্রে অমনি রণভূমে আত্মপ্রাণ বলি দিতেছে! আমিও না হয় ৭৲ টাকা মাসিক মাহিনা দিব,—৭৲ টাকা কেন, মাসিক ১৪৲ টাকা মাহিনা দিব,—আমার কর্ম্মচারিগণ কি আমার কার্য্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে না?

কোন্ পথ অবলম্বনীয়? কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না!—কিছুই ত স্থির করিতে সক্ষম হইতেছি না।

আরও একটা ভাবনার বিষয় আছে। এ ব্যবসা গোপনে, না প্রকাশ্যে চালাইব? আমার ত একবার মনে হইতেছে, গোপনে,—প্রচ্ছন্নভাবে কার্য্য করাই সুযুক্তি! পোষ্টাফিসের ছোট-কেরাণী হইয়া বেশ মজায় থাকিব,—আর, নিশীথে ব্যবসাটী, অন্যের অগোচরে, উত্তমরূপে চালাইব! কেহ জানিবে না, বুঝিবে না, ধরিবে না! একপক্ষে আমি লোকলোচন-পথে দিবসে দিব্য ভদ্রলোক হইয়া বেড়াইব; অন্যপক্ষে আমি নিশাকালে দিগ্বিজয়ী দস্যুরাজ হইয়া বিচরণ করিব। এরূপস্থলে আমার কার্য্যাকার্য্যের বিষয়

পুলিস জানিবে না, প্রতিবেশিগণ জানিবে না, সহরবাসী কেহই জানিবে না। বড়ই সুন্দর কৌশল!

কিন্তু এক দোষ। দুর্ব্বল ব্যক্তিই গোপনে কাজ করিতে চায়। ভয়কম্পিত হইয়া লুকাইয়া কার্য্য করিলে মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়। আমি কখনই কাপুরুষের ন্যায়, ক্লীবের ন্যায়, কর্ম্ম করিতে সক্ষম হইব না! আমি লজ্জাশীলা কুলবধূর ন্যায় কেরাণীগিরিরূপ ঘোমটার ভিতর থাকিতে চাহি না। আমি এরূপ আত্ম-বঞ্চনা করিতে পারিব না। আমি কি যাত্রার দলের সঙ, না বহুরূপী? ছি ছি! "নাম কি?"—কেহ জিজ্ঞাসিলে, তাহা বলিতে পারিব না! পিতার নাম জিজ্ঞাসিলেই বা কি বলিব?—এই হতভাগ্য কালাচাঁদকে তদীয় স্বর্গীয় পিতৃদেবের পবিত্র মধুর নাম উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিতেও কি কুণ্ঠিত হইতে হইবে? পিতৃদেবকে কখন চক্ষে দেখি নাই, বাপ যে কেমন বস্তু তাহা কখন বুঝি নাই,—ইহজীবনে পিতা বলিয়া কাহাকেও সম্বোধন করিতে পাই নাই,—সেই পরমপূজনীয় জন্মদাতা পিতার নামটি পর্য্যন্ত আমি মুখে আনিতে পারিব না;—ইহা অপেক্ষা আর অধিক মর্ম্মযাতনার কথা কি আছে?

যাহা ঘটিবার তাহা ঘটুক,—আমি স্বনাম ঘোষণা-পূর্ব্বক প্রকাশ্যে ব্যবসা চালাইব। নিবিড় অরণ্যে বা গিরি-গুহায় আশ্রয় লইব। যথা-সময়ে নগরে-নগরে, গ্রামে-গ্রামে প্রকাশ্য ব্যবসা চালাইয়া, আবার অরণ্যে আসিয়া বাস করিব! এমন নিভৃত ভূখণ্ডে অবস্থিতি করিব যে, পঞ্চাশ বৎসর অন্বেষণ করিলেও, আমার কেহ সন্ধান পাইবে না। ৺রামতারণ দত্তের পৌত্র কালাচাঁদ দত্তের নাম দিগ্বিজয়ী বলিয়া দেশে দেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে। এই মীমাংসাই স্থির!

কিন্তু কেমন করিয়া এই সাধু-সঙ্কল্পকে কার্য্যে পরিণত করিব? হঠাৎ আজ মুখস খুলিয়া, ডাকঘরের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ঠাকুরদাদাকে ছাড়িয়া, একা ঢাল-খাঁড়া ধরিয়া, দিগ্বিজয়ী সাজিলে ত কার্য্যোদ্ধার হইবে না? আশা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইবে। উপযুক্ত সময়েই উপযুক্ত কাজই করা উচিত। অবিবেচনার ফলে, অসময়ে কোন কার্য্য করিলে শেষে অবশ্যই ঠকিতে হইবে।

এই সকল গুরুতর বিষয়ের পরামর্শই বা কাহার সঙ্গে করি? সৎপরামর্শদাতা লোক'ত কৈ দেখিতে পাই না? এ সময় কোন্ কাজ করা উচিত?

আমি ডাকাতি বা দিগ্বিজয়ের কার্য্যে নূতন ব্রতী। আদৌ বহুদর্শিতা নাই। এই নব-ব্যবসায়ে প্রথমে পদে-পদে আমার ভুল হইতে পারে। হয় ত প্রথমে একটী ভুলেই সর্ব্বনাশ সাধিত হইতে পারে। ভোলাময়রার দোকানে সামান্য একটী চুরি করিতেই কত-না কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, কতই-না বিভ্রাট ঘটিয়াছিল! মন-ভ্রমে আলো না লইয়াই চুরি করিতে গিয়াছিলাম! তাই বলি, চুরি বিদ্যা বড় কঠিন বিদ্যা! উপযুক্তরূপে শিক্ষিত না হইলে, এ কর্য্যে করিতে যাওয়াই বিড়ম্বনা!

তাই ভাবি,—আমার উপযুক্ত শিক্ষক কে? একটী গুরু চাই! আগে সদ্গুরুর অন্বেষণ করিতে হইবে। গুরুর কাছে উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া, সুশিক্ষিত হইয়া, এ ব্যবসা আরম্ভ করাই কর্ত্তব্য।

যখন আমি কারাগারে ছিলাম, তখন যে সকল দস্যুর সহিত আলাপ হইয়াছিল,—তাহাদিগকে একবার আহ্বান করি না কেন? আটজন ওস্তাদের সহিত আলাপ হয়, তন্মধ্যে পাঁচজন মুক্তি পাইয়াছে। সেই পাঁচজনকেই পত্র লিখিয়া জানাই!

এককালে পাঁচজনকে পত্র লেখা উচিত হয় না। পাঁচজনের মধ্যে যিনি প্রধান, তাঁহাকেই পত্র লেখা যাউক।

যাক্। যিনি এই পাঁচজনেরই গুরু, তাঁহাকেই চিঠি লিখি না কেন? তিনি ব্রাহ্মণ, প্রবীণ, বুদ্ধিমান্, বহুদর্শী! তিনিই ত উত্তম গুরু, শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

না,—চিঠি লেখা হইবে না। আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট যাইব। শুভ কার্য্যে বিলম্ব করিব না;—শীঘ্রই যাইব।

কালাচাঁদ পোষ্টমাষ্টার সাহেবের নিকট এই জন্যই চারি দিনের ছুটী লয়েন। মাতুলালয় যাত্রার কথা ভাণ মাত্র।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

কালাচাঁদ মামার বাড়ী গেলেন, পতিতের ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল। পতিতের কেমন একটা দুর্ভাবনা হইয়াছিল, তাহার খাইয়া-মাখিয়া-শুইয়া সুখ ছিল না।

পথে কালাচাঁদকে দেখিলে, পতিতের ভয় হইত। ঘরে কালাচাঁদের কথা ভাবিলে, পতিতের অতীব আতঙ্ক উপস্থিত হইত। নিদ্রায় কালাচাঁদকে স্বপ্ন দেখিয়া, পতিত চেঁচাইয়া উঠিত। পতি-তের এরূপ ভীতির হেতু কি?

পাছে কালাচাঁদের সহিত দেখা হইয়া পড়ে, এই ভয়ে পতিত অনেকের বাড়ীতে কামাইতে যাওয়া বন্ধ করিয়াছিল। কালাচাঁদ কিন্তু পতিতকে মুখে কোন কথাই বলিতেন না,—কোন সময়ে

সময়ে তিনি পশ্চাৎ হইতে গলা খেঁকারি দিতেন,—এবং "হুঁ-হুঁ—হুঁ-হুঁ"—এইরূপ একটা শব্দ করিয়া উঠিতেন। ইহাতেই পতিতের সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিত,—দাঁত-কপাটী লাগিবার যো হইত। যে দুই-এক-দিন, কালাচাঁদ, পতিতের সম্মুখে চৌমাথার উপর হাত-তালি দিয়াছিলেন,—সে দুই-একদিনের ইতিহাস বড়ই রহস্যময়! কালাচাঁদ দুই চারিবার হাত-তালি দিবার পর, হো-হো শব্দ করিয়া হাসিতে হাসিতে অন্য পথে চলিয়া যাইতেন; কিন্তু তাঁহার হাত-তালির বিষম ব্রহ্মাস্ত্রে পতিতের যে, কি অনির্ব্বচনীয় দুর্দশা ঘটিত, তাহা আর তিনি পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিতেন না। একদিন পতিত ঐরূপ হাত-তালি খাইয়া বাপ বাপ রবে দৌড়িয়া যাইতে যাইতে হঠাৎ পা-মুচুড়িয়া পড়িয়া গেল। যে স্থলে পতিতের পতন হইল, সে স্থলটী পুষ্করিণীর পাড়। পতনের পর, পতিত-পাবন, গড়াইতে-গড়াইতে, সেই পুকুরে গিয়া পড়িল। সুবিধার মধ্যে, পুকুরে তখন বেশী জল ছিল না;—পাঁকই বেশী; জল এক হাঁটুরও কম। পার্শ্ববর্ত্তী স্ত্রীলোকবৃন্দ সেই পুকুরে কেবল বাসন মাজিত।

পতিত পুকুরে পড়িয়াই পাঁকে গাড়া গেল। যে সকল স্ত্রীলোক বাসন মাজিতেছিল। তাহারা দৌড়িয়া গিয়া, পতিতকে ধরাধরি করিয়া তুলিল। পতিতের নাকে আঘাত, ঘাড়ে আঘাত; বুকে আঘাত, কোমরে আঘাত,—পতিত আঘাতময়। পতিতের চোখে, মুখে, চুলে, কাদা; কোঁচায়, কাছায়, চাদরে কাদা; জামায়, জেবে, জুতায় কাদা; হাতে, পায়ে, ভাঁড়ে কাদা,—পতিত কর্দ্দমময়।

কামিনীকুলের সাহায্যে ক্রমশ পতিতপাবন সেই পুষ্করিণীর

তীরে উত্তোলিত হইল। পতিত তথায় বসিল না, দাঁড়াইলও-না, —কেবল চিৎপাত হইয়া শুইয়া রহিল। পতিত চক্ষু মেলিয়া চাহিল না, মুখ খুলিয়া কথা কহিল না, অঙ্গ হেলাইয়া পাশ ফিরিল না,—ভয়ে না হইলে নয়, তাই নিশ্বাসটী ফেলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পতিতকে বহুলোক ঘেরিয়া দাঁড়াইল। কেহ ভাবিল, পতিত মরিয়াছে; কেহ ভাবিল, গঙ্গাযাত্রার উদ্যোগ হইতেছে? কেহ ভাবিল, কেবল অচেতন অবস্থায় আছে। কিন্তু রোগ নির্ণয় করিতে সহজে কেহই সক্ষম হইল না। কেহ স্থির করিল, সাপে কামড়াইয়াছে; কেহ অনুমান করিল, ভূতে পাইয়াছে; কেহ বা ঘোষণাদ্বারা প্রকাশ করিল,—ইহা সাপও নহে, ভূতও নহে,—মূর্চ্ছা-বাই!

পতিতপাবনের এমন কিছু নিদারুণ আঘাত লাগে নাই যে, তাহাকে এতক্ষণ পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হইয়া থাকিতেই হইবে! আঘাতটা অঙ্গের উপযুক্ত হইলেও, তাহাতে অচেতন হইবার উপকরণ কিছুই ছিল না। তবে পতিত নিশ্চল, নিষ্পন্দ, অসাড় কেন? বোধ হয় পতিতের ধ্রুব ধারণা;—এমন করিয়া এরূপ ভাবে পড়িয়া গেলে, মূর্চ্ছিত হওয়াই নিত্য নিয়ম? তাই সে, মূর্চ্ছিত।

যাহাই হউক, পতিত কিছুক্ষণ এরূপ মূর্চ্ছিত থাকিয়া, বিশেষ কিছুই সুখ-স্বস্তি পাইল না। তখন অগত্যা সে একবার চাহিল। ক্রমশ ধীরে ধীরে কথা কহিল। অবশেষে উঠিয়া বসিল। 'কেন এমন ঘটিল,'—বহু ব্যক্তিকর্ত্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, পতিত যেন প্রীতি-প্রফুল্ল অন্তরে উত্তর দিল,—"ঘরে কালসাপ পুবেছিনু, বাটী-বাটী দুধ খাইয়েছিনু,—তার এই ফল পেলুম। কলিকাল কি-না! যার তুমি ভাল করবে, সে-ই তোমার মন্দ করবে!

এই বড়-কর্ত্তার নাতীকে—এই কালাচাঁদকে,—আমি দু-বছর ধরে খাওয়ালুম—মাখালুম,—যা ই তার হাতে দু-পয়সা হলো,—যা-ই নাতী-ঠাকুদ্দায় ভাব হলো, অমনি সে শিকলি-কেটে উড়ে চলে গেল। তা, চলে যা'ক্—সে জন্য দুঃখ করি না,—কিন্তু আমাকে এমন ক'রে মেরে ফেলবার চেষ্টা করা কেন?—এই, আমি এখান দিয়ে যাচ্চি, অমনি সে, বাঘের মত ঝাঁপিয়ে প'ড়ে এই পুকুরের পাঁকে আমাকে পুঁতে ফেলতে লাগ্‌লো!—কি বলবো,—তখন আমার বগলে ভাঁড় ছিল;—নহিলে, পতিতকে কায়দা করা বড় সোজা কাজ নয়!!—"

একজন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বলিল, "তোমার কেমন কথা গা? তুমি ত নিজে আপন মনে এই পথ দিয়া দৌড়ে আসছিলে;—আস্‌তে আস্‌তে হোঁচট্ খেয়ে পড়ে গেলে! তোমাকে ত কেউ ফেলেও দেয় নাই,—পাঁকেও পোঁতে নাই! তুমি সেই ভালমানুষের ছেলের—সেই কালাচাঁদের দোষ দাও কেন? সে ত খুব ভাল ছেলে! ঘাড় হেঁট ক'রে পথ চলে। বৌ-ঝীয়ের উপর তার উঁচু নজর নেই! আমরা ত এই ঘাটে ব'সে বাসন মাজ্‌চি,—কিন্তু কালাচাঁদকে ত কৈ আজ দেখি নাই!"

আর একজন স্ত্রীলোক বলিল—"আহা! কালাচাঁদের সদর্শ ছেলে আর আছে কি?"

একজন বৃদ্ধপুরুষ বলিল,—"পরামাণিক! তুমি মিছামিছি কালাচাঁদের দোষ দাও কেন? এই মাত্র দেখে এলাম, কালাচাঁদ তার ঠাকুরদাদার বৈঠকখানায় বসে রয়েচে! ছি! ভদ্দর লোকের উপর কি এমন মিছা দোষ চাপাতে আছে?"

ক্রমশ সকলেই সমস্বরে এই ভাবে বলিতে লাগিল, "কালাচাঁদ

অতি সুবোধ ব্যক্তি। তাহার কোন দোষ নাই। এই নাপিতই দুষ্ট এবং দমবাজ।”

পতনে পতিতের যত-না যন্ত্রণা হইয়াছিল,—কালাচাঁদের প্রশংসা-কীর্ত্তনে তাহার শতগুণের অধিক যন্ত্রণা হইল। গতিক বড় ভাল নয় বুঝিয়া, পতিত তখন উঠিয়া দাঁড়াইল,—এবং এই ভাবিতে ভাবিতে চলিল,—

হুগলী বড়ই কঠিন ঠাঁই!
কীল্-খেয়ে কীল্-চুরি কর্‌রে ভাই!!

নবম পরিচ্ছেদ।

কাজেই কালাচাঁদের মামার বাড়ী-গমনে পতিতের প্রাণে অতুল আনন্দ। পতিত ভাবিতে লাগিল, “কালাচাঁদ মামার বাড়ী হইতে যদি আর না ফেরে, তাহা হইলে আমার আপদ-বিপদ দূর হইয়া সুখের উদয় হয়। কিন্তু ও-পাপ ত একবারে বিদায় হইবার নহে!—আবার সে, হুগলীতে আসিবে! আবার আমাকে জ্বালাইবে। কোন্ উপায়ে উহাকে হুগলী হইতে তাড়াই? উহার চেহারা ঠিক যমদূতের মত। উহাকে দেখিলেই আমার দাঁত-কপাটী লাগে! কালাচাঁদও মানুষ, আমিও মানুষ;—অথচ উহাকে দেখিলে আমার এত ভয় হয় কেন?

“আচ্ছা, বড়-কর্ত্তারই বা কেমন আক্কেল। আমার সঙ্গে যুক্তি পরামর্শ হইল যে, কালাচাঁদকে তাড়াইতে হইবে। কিন্তু

যাই আমি কালাচাঁদকে বাসা হইতে তাড়াইলাম, বুড়ো ব্যাটা, অমনি নাতীকে আদর করিয়া ডাকিয়া আশ্রয় দিল। ঐ বুড়ো-দেওয়ানটাকে আমি চিরকাল চিনি;—কথা যেন মিছরির ছুরি! ওর মুখে এক কথা, পেটে এক কথা! মনটা ঠিক যেন জিলিপির পাক্! বুড়োটা তখন আমায় তেমন-ক'রে খোষামোদ ক'রে কালাচাঁদকে তাড়িয়ে দেওয়ালে,—আর নিজে কিনা ভাবে গদগদ হয়ে এখন কেবল কালাচাঁদকে কোলে ক'রে বসে রৈল! কেন এমন হইল? কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না। আমাকে বধ করিবার জন্যই কি এরূপ ষড়্‌যন্ত্র হইল? তা, বৈ আর কি? এখন কালাচাঁদকে আমার পেছনে ঠেকিয়ে দিয়ে, কর্ত্তা নিজে ঘরে বসে মজা দেখ্‌চেন! আচ্ছা, যাই আজ বড়-কর্ত্তার আছে!—তাঁকে আমার এতই ভয় কি? আজ খোলাখুলি কথা কয়ে আস্‌বো।

এইরূপ ভাবিয়া সভ্য নাপিত পতিতপাবন উঠিল, পোষাক পরিল, বগলে ভাড় লইল, কাণে নরুন গুজিল,—বাহু নাড়িয়া যাত্রা করিল।

এদিকে বড়-কর্ত্তা, নিভৃত-কক্ষে বসিয়া রামঠাকুরের সহিত গল্প করিতেছেন। কর্ত্তা বলিতেছেন,—"তোমার সে কাজটা ভাল হয় নাই।"

রামঠাকুর। আপনি যা আজ্ঞে করচেন,—তাই ঠিক! তবে সে, এই তিনমাস ঘর- করতে এসেচে। আমি আপনাকে বলব বলব মনে করছিলাম,—এমন সময়,—এই ঘটনা ঘট্‌লো!

কর্ত্তা। তার বয়স ঠিক কত হলো?

রামঠাকুর। এই ষোল বেয়ে ঠিক সতর বছরে পড়েছে।

কর্ত্তা। রঙ কেমন?

রামঠাকুর। সে কথা কি আর বল্‌বো? ঠিক যেমন দু'ধে-আল্‌তা মাখানো চাঁপার কলি! তা, ময়রার ঘরে অমন সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখি নাই, দেখবো-না—হয় নাই, হবার নয়!

কর্ত্তা। তোমার সঙ্গে কি তার কখন চাক্ষুষ দেখা-শুনা হয়েছিল?

রামঠাকুর। আমার সঙ্গে একদিন তার এক রকম কথা-বার্ত্তাই হয়েছিলো,—বল্‌তে হবে।

কর্ত্তা। সে কি প্রকার?

রামঠাকুর। ভোলা-ময়রা সকালবেলা দোকানে আসে,—আর তার স্ত্রী দোয়ারের কপাটটী ফাঁক ক'রে মুখটী বাড়িয়ে সদাই দাঁড়িয়ে থাকে।

কর্ত্তা। এরূপ ভাবে এক-দমে কতক্ষণ থাকে?

রামঠাকুর। এক প্রহরের কম'ত নয়!

কর্ত্তা। আচ্ছা,—তারপর।

রামঠাকুর। আমার সঙ্গে তার প্রায়ই চারচক্ষে চাওয়া-চায়ি হয়। দেখা হইলেই সে অমনি কপাটটী বন্ধ করে মুখটী লুকিয়ে ফেলে।

কর্ত্তা। আচ্ছা, মুখ লুকাবার সময়, সে মুচকি-হাসি হাসে কি না?

রামঠাকুর। অতি সুন্দর হাসিয়া! যেন ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া মুক্তা ঝরিতে থাকে।

কর্ত্তা। আচ্ছা, কপাট বন্ধ করিবার সময়, সে, আড়নয়নে চায় কি না?

রামঠাকুর। ওঃ, খুব চায়। ডান-চোখের তারাটী যেন একেবারে ঠেলে কপালে এসে পড়ে!

কর্ত্তা। কোনরূপ অঙ্গ-ভঙ্গি করে কি না?

রামঠাকুর। হাঁ, করে বৈ কি!

কর্ত্তা। সে কি রকম?

রামঠাকুর। তার চোখ ঘুরিতে থাকে, ঠোঁট কাঁপিতে থাকে, নাকের নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতে থাকে!

কর্ত্তা। আর কিছু হয় কি?

রামঠাকুর। তার কটীতট দোলে, পদযুগল দোলে, বাহু-মূল দোলে;—আর দোলে, তার নবীন কেশ-পাশ।

কর্ত্তা। তোমার সঙ্গে কোন দিন তার কোন কথা হয়েছিল কি?

রামঠাকুর। কথা কওয়াই বটে! মেয়েটী একদিন কথা কই-কই করিয়া আর কথা কহিতে পারিল না!

কর্ত্তা। কেন কেন?

রামঠাকুর। লজ্জা বলুন, ভয় বলুন, বিভীষিকা বলুন, আতঙ্ক বলুন,—এইরূপ একটা না-একট, প্রথম-যৌবনে রমণীর হইয়াই থাকে! তা, সে জন্য কোন চিন্তা নাই। দু-দিন পরে সব দোষই সেরে যাবে।

কর্ত্তা। সে সব কথা যা'ক্। এখন তাকে পা'বার উপায় কি?

রামঠাকুর! সে মেয়েটা ত আমার হাতের মুঠার ভিতর।

কর্ত্তা। মুঠার ভিতর কিসে?

রামঠাকুর। ভোলা-ময়রা আপনার শ্রীচরণে শরণ নিয়েচে। আপনি তার এখন মরণ-কাটী, বাঁচন-কাটী। ভোলা-ব্যাটাকে এখন যা বল্‌বো,—এখন সে, তাই কর্‌তে বাধ্য। আমি ভোলা-

ময়রাকে খুলেই বল্‌বো,—'ভোলানাথ! মেয়েদিগে একবার কর্ত্তার কাছে পাঠিয়ে দিও। কর্ত্তার অনুগ্রহ না হ'লে এবার ঐ চুরি-মোকদ্দমায় তোমার চৌদ্দ বৎসর মেয়াদ হবে! ভোলানাথ! আগে কর্ত্তাকে খুষী কর, তার পর তোমার উদ্ধার।'

কর্ত্তা। ভোলা-ময়রাকে বশ কর্‌বার জন্য ত কোন কাজ আটক হবে না; মেয়েটাকে আগে রাজী করিবার উপায় কি?

রামঠাকুর। আহা! সে জন্য কোন ভাবনা নাই। মেয়েটা যখন আপনার নাম শুনবে, তখন সে, রাজী না হয়ে থাকতে পারে কি? এদেশে আপনাকে কে না ভক্তি করে, মান্য করে, ভাল-বাসে? যখন আপনার কথা তার কর্ণে যাবে, তখন সে কি আর স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারবে?—সে, একেবারে ধেয়ে যেয়ে আপনার বাগানবাড়ীতে উপস্থিত হবে। আপনি হ'লেন, এ দেশের রাজা। সুতরাং কোন্ রমণীর আপনাকে ভজনা করিবার সাধ না হয়? রাজাকে যে রমণী উপভোগ করিতে পায়,—সেই ত প্রকৃত রাণী। রাণী হইবার জন্য কাহার না বাসনা প্রবলা হয়?

কর্ত্তা। মেয়েটার কি নাম?

রামঠাকুর। আদুরী। তার বাপের নাম বলদেব ময়রা। পিতামহের নাম হলধর-ময়রা। বেশ সদ্বংশ। আদুরীর বাপ-পিতামহ দোল-দুর্গোৎসব কর্‌তো! কোন দোষ নাই। আদুরী পদ্মিনীজাতীয়া স্ত্রী। সুলক্ষণ-সম্পন্না। বলেন ত, আদুরীর কুষ্ঠীখানি আনাই;—রাশি-লগ্ন এবং পতিস্থানের বিচার করে দেখি। যদি কুষ্ঠী না থাকে, তবে, না-হয় নষ্ট-কোষ্ঠীটাই উদ্ধার করিয়া ফেলি।

কর্ত্তা। থাক্, থাক্—সে সব এখন থাক্। এক্ষণে এমন

একটী পাকা লোক চাই, যাহাদ্বারা আহুরীর নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব হ'তে পারে। তা, সে লোকটী পুরুষ হ'লেও চল্‌তে পারে।

রামঠাকুর কিছুক্ষণ ঘাড় হেঁট করিয়া বিশেষ স্থিরবুদ্ধিতে এই গুরুতর বিষয়ের চিন্তা করিলেন। শেষে গ্রীবা উত্তোলন করিয়া, গম্ভীর ভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন, "লোকের ভাবনা কি? লোক অনেক আছে। তবে কিনা এ-সব কাজে একটু পরিপক্ক লোক চাই। যার-তার দ্বারা এ-সব কার্য্য সম্পন্ন হয় না। একটী আটে-পিঠে-দড় লোক হলেই ভাল হয়। আচ্ছা, প্রণিধানপূর্ব্বক একটা কথা শুনুন দেখি: পণ্ডিত পরামাণিক, ভোলাময়রার খুড়ার ভিক্ষাপুত্র। ও-বাড়ীতে সে সদাই যাওয়া-আসা করে। বৌয়েদের সঙ্গে তার ঠাট্টাতামাসাও চলে। লোকটাও পাকা ঝুনো বটে। হিসাব-বোধও তার বেশ আছে। বিশেষ, পণ্ডিত অতি সজ্জন ব্যক্তি। সকলের সঙ্গেই সে, হেসে-খেলে কথা কয়। তার কোনও দোষ দেখিতে পাই না। এই পণ্ডিতের দ্বারা আহুরীর নিকট প্রস্তাব করাইলে চলে না-কি?"

কর্ত্তা তখন মুখটীকে বিকৃত করিলেন,—একটু রুক্ষ-স্বরে রামঠাকুরকে বলিলেন,—"পণ্ডে নাপ্‌তেটা বড় পাজি! তার নাম মুখে এনো না। সে বদ্‌মাইস্‌টা মিথ্যা-কথার বাদ্‌সা। সে, ভুলে সত্য কথা কয় না। একটা কথারও যদি তার ঠিক আছে! ইচ্ছা হয়, দেওয়ালে তার নাক ঘসাড়ে ছিঁড়ে দি।"

রামঠাকুর। আপনি যা বল্‌চেন, সবই ঠিক্। পণ্ডে ব্যাটা বড় বদ্‌মাইস্। সে নচ্ছার চোর, সিঁদেল, ডাকাত। সে, গুলিখোর, গাঁজাখোর, মদখোর। তার মা-মাসী জ্ঞান নাই। তার

মুখ দেখ্‌লে অন্ন হয় না। তাকে আমি দেখ্‌তে পেলে এখনি দশ জুতা মারি! সে শ্যালা মিথ্যা কথা কয়—

কর্ত্তা। পণ্ডেটা কি কম মিথ্যাবাদী। সে ব্যাটা একদিন এসে বল্লে,—কালাচাঁদ খেতে পায় না, মাথ্‌তে পায় না,—তার কাপড়-চাদর-জুতা নাই—এমন কি, তার একটীও পয়সা নাই;—অথচ কালাচাঁদ, তার পরদিনই তোফা ধুতি-চাদরপ'রে, মাছ-দই-সন্দেশ নিয়ে, আমার বাড়ী উপস্থিত হ'লো। হেঁয়ে ব্যাটা পণ্ডে! বোম্বাই-বজ্জাত। কালাচাঁদের যদি একটীও পয়সা ছিল না, তবে সে পাঁচ-সাত টাকার বাজার ক'রে—এমন দশসের একটা রুইমাছ নিয়ে, কেমন করে এলো?—

রামঠাকুর। এঁ—এঁ, বলেন কি? আপনার সঙ্গে, সেই পাজি পণ্ডেটা এতদূর জুয়াচুরি কত্তে সাহস কর্লে!! ব্যাটা বড় বাড় বেড়েচে! সুমুখে একবার পেলে, তাকে জুতিয়ে লম্বা ক'রে ফেলি! কড়িকাঠে টাঙিয়ে জলবিছুটি দি!

এইরূপে নিভৃত-কক্ষে গুরুবিষয়ে গভীর গল্প চলিতেছে, এমন সময় পতিতপাবন বড়-কর্ত্তার গৃহে সমাগত হইল। বৈঠকখানায় প্রকাণ্ড হ'লে, তখন কেহ ছিল না। পণ্ডিত আসিয়াই খানসামাকে জিজ্ঞাসিল,—"কর্ত্তা-মোশাই কোথা?"

চাকর। কর্ত্তা ও-ঘরে কাছারীর কাজ কর্‌চেন,—ও-ঘরে অন্য কাহারও এখন যাইতে নিষেধ।

পণ্ডিত। নিষেধ আবার কেন রে বাপু!—আমি পতিতপাবন পঞ্চাননিক,—আমার নিষেধ কোথাও নাই।

চাকর। না—না,—তা হবে না,—তোমার ওখানে যাওয়া হবে না।

পণ্ডিত। (ক্রোধভরে) তুই কে-রে বাপু?—তুই হলি কালুকের ছেলে, আজ ছমাসমাত্র চাকুরী পেয়েচিস্—আমাকে এ বাড়ীতে নিষেধ করবার তুই কে? তুই আজ আছিস্, কাল নেই। কিন্তু পণ্ডিত চিরকাল এ বাড়ীর চাকর।

এই কথা বলিতে-বলিতে পণ্ডিত সেই নিভৃত কক্ষের দিকে, বুক ফুলাইয়া, সতেজে হন্-হন্ চলিয়া যাইতে লাগিল। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় ভৃত্যটী ফ্যাল্-ফ্যাল্ চাহিয়া রহিল।

পণ্ডিতকে কিন্তু অধিক দূর যাইতে হইল না। বড়-কর্ত্তা পণ্ডিতের সাড়া পাইয়াই সেই গুরু গল্প ভাঙ্গিয়া দিলেন। রামঠাকুর তৎক্ষণাৎ অমনি যেন পণ্ডিতকে প্রহারার্থ বীরদর্পে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কর্ত্তা, রামঠাকুরের উদ্দেশে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"পণ্ডেকে হঠাৎ কিছু বলা হবে না—তুমি যেন হঠাৎ কোন গাল্ দিয়ে ফেলোনা।"

রামঠাকুর। আজ্ঞে, তা বৈ কি?

এইরূপ সংক্ষেপে কথা-বার্ত্তা শেষ হইলে, রামঠাকুর বাহির হইয়া পণ্ডিতের সম্মুখীন হইলেন।

পণ্ডিত। ঠাকুর-গোশাই গো। প্রণাম হই।

রামঠাকুর। জয়স্ত।

পণ্ডিত। (যোড়হাতে) একটু পদ-রজ আজ্ঞে করুন।

রামঠাকুর অমনি দক্ষিণ-পদ উঠাইয়া পণ্ডিতের বুকের নিকট ধরিলেন। পণ্ডিত প্রথমত তাহার মাথাটা সেই উত্তোলিত দক্ষিণ-পদে সংলগ্ন করিয়া দিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে থাকিয়া, পণ্ডিত মাথা সরাইয়া লইল। শেষে, সে, দক্ষিণ-হস্তের সাহায্যে রামঠাকুরের পদতলের যাবতীয় ধূলিরাশি লইয়া, কতকগুলি নিজের বুকে

এবং কতক নিজের মাথায় স্থাপন করিল। অন্তিমে ভক্তিভাবে গদ্‌গদ হইয়া বলিল,—"আহা! সু-ব্রাহ্মণের পায়ের ধুলা অমৃতের তুল্য। ঠাকুর-মোশাই! আপনারাই ভগবান,—আপনারাই রাত-দিনের কর্ত্তা।"

রামঠাকুর। পরামাণিক! সকল কথাই সত্য। কিন্তু এখন ঘোর কলি উপস্থিত! আজকাল আর আমাদিগকে মানে কে?—কয়জন লোক আছে যে, ব্রাহ্মণ দেখিলে প্রণাম করে? পতিত! তোমার নাপিত-কুলে জন্ম বটে কিন্তু তোমার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক, ভক্তব্যক্তি, আমি ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের ভিতরও দেখ্‌তে পাই না।

পতিত এবার যোড়হাতে প্রণাম করিল,—আবার রামঠাকুরের পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল,- বলিল, "ঠাকুর গো! সমস্তই আপনার অনুগ্রহ! পতিত অতি ক্ষুদ্র মনুষ্য; তবে আপনারা অনুগ্রহ ক'রে পতিতকে যা কিছু বড় করেচেন।"

রামঠাকুর। আমরা পারি সব! শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের এমনি শক্তি যে, তিনি ছোটকে বড় করিতে পারেন, বড়কে ছোট করিতে পারেন। দুর্ব্বাসা একদিন ক্রোধবশত দৃষ্টিমাত্রেই সংসারটা ভস্ম ক'রে ফেলেছিলেন। শুকদেব গোস্বামী কি? নারদ মুনিইবা কি? পরামাণিক! তুমি একবার এঁদের চরিত্র ভেবে দেখ দেখি! ভাবিলে, অবশ্যই তুমি এ তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে।

পতিত। ঠাকুর মোশাই! আপনি যা বল্‌চেন তাই ঠিক। আমরা যতদিন বাঁচবো, আপনাদের চরণ-সেবা ক'রেই কাল কাটাবো; কিন্তু আমাদের ছেলে-পিলেরা এর-পর কি কর্‌বে বল্‌তে পারি না।

রামঠাকুর। তুমি ঠিক্ বল্‌চো।

পণ্ডিত। (যোড়হাতে) এইবার একটু বিপ্রপাদক আজ্ঞে করুন।

পণ্ডিতের 'বিপ্রপাদক' অর্থে—ব্রাহ্মণের পদধৌতজল।

রামঠাকুর বলিলেন,—"তথাস্তু।"

পণ্ডিত তখন একটী ছোট বাটীতে জল লইয়া রামঠাকুরের পদপ্রান্তে রাখিল। রামঠাকুর, দক্ষিণ-পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটী সেই জলে ডুবাইলেন। পণ্ডিত সেই জল লইয়া পরমপ্রীতিভরে পান করিল। বলিল,—"আহা এ জল অতিমিষ্ট। যেন আকের রস। আহা! কিবা গোলাপী গন্ধ! এ জল একবার পান করিলে মানুষের আর ক্ষুধা তৃষ্ণা হয় না,—রোগ শোক থাকে না; বিষয়-বাসনা থাকে না! মানুষ অমর হয়।

এইরূপ ভূমিকা করিয়া পণ্ডিত গ্রন্থারম্ভ করিল;—অর্থাৎ রামঠাকুরকে জিজ্ঞাসিল,—বড়কর্ত্তামোশাই কোথায়?

রামঠাকুর। তাঁকে এখন কেন?

পণ্ডিত। তাঁর কাছে আমার এক নালিশ আছে। তিনি হলেন মা-বাপ, তাঁর কাছে না যেয়ে আর কোথায় যাবো?

রামঠাকুর। কর্ত্তার এখন ঈষৎ অসুখ হয়েচে,—আমি তাঁকে ধরাধরি ক'রে বৈঠকখানায় নিয়ে আস্‌চি। তুমি একবার ওদিকে ব'স। বেশী বিলম্ব হবে না।

পণ্ডিত। আজ্ঞে,—আজ্ঞে,—এ দাস গোপনেই নালিশটা করবে! যদি অনুমতি হয়, তবে আমিই না-হয় ঐ ঘরে কর্ত্তার কাছে যাই।

রামঠাকুর। আচ্ছা, দাঁড়াও,—আমি কর্ত্তাকে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।

রামঠাকুরকে আর জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে হইল না! কর্ত্তাই উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—“ঠাকুর মোশাই! পতেকে এদিকে আস্‌তে বল।”

শব্দমাত্রে পতিতপাবন আগে আগে, রামঠাকুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ বড়কর্ত্তার কক্ষাভিমুখে যাত্রা করিল এবং করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

পৌঁছিয়াই, পতিত প্রথমত ভূমিষ্ঠ হইয়া বড়কর্ত্তাকে প্রণাম করিল। শেষে দাঁড়াইয়া যোড়হাতে বলিল,—“দেওয়ানজী মোশাই! এ গরীবকে এদেশে রাখ্‌বেন কি না বলুন? যদি আপনার সে বিষয়ে অমত হয়, তবে পতিত কালই দেশ ছেড়ে চলে যাবে। পতিত'ত আপনার কথার অবাধ্য হ'তে পারবে না।”

কর্ত্তা। (রুক্ষস্বরে) ব্যাটা যেন সভ এসে দাঁড়ালো-গো! যেন হরবোলা পাখী,—মুখে যেন খৈ ফুটচে!

পতিত। (যোড়হাতে) আজ্ঞে, আপনি আমাকে সবই বল্‌তে পারেন। পতিত কখন আপনার কথার অবাধ্য হবে না। আমি আপনার সভও বটি, বেটাও বটি, পাখীও বটি, ফোটা-খৈও বটি, —আমাকে আপনি যা বলেন, আমি তাই! সে-কথা যাক্!— আপনি অনুমতি করুন, আমি আজই এদেশ থেকে চলে যাই।

কর্ত্তা। (মুখ বিকৃত করিয়া) তা' কোথা যাবি—যা না!— সে-কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করা কেন? তোর কোন্ চুলোয়

জায়গা আছে, সেই চুলোর ভিতর গিয়ে ঢুকে থাকুগে না।— আমি তোকে কি ধ'রে,—আটক ক'রে রেখেছি! ব্যাটা বোঁচা, বদ্‌মাইস,—মিথ্যাবাদী!—

পতিতের স্বর কাঁদ-কাঁদ হইল। বড়-কর্ত্তার দিকে সে আরও একটু অগ্রসর হইল। শেষে, যাত্রার দলের দূতীর ন্যায় যোড়হাতে বলিতে আরম্ভ করিল,—"এই পতিতপাবনকে বোঁচা বলুন, বদ্‌মাইস বলুন, ব্যাটা বলুন,—পতিত তা'তে কোন কথা কবে না; এই পতিতপাবনকে চোর বলুন, ডাকাত বলুন, মাতাল বলুন, গেঁজেল বলুন,—পতিত সে-কথা গ্রাহ্য কর্‌বে না,—কিন্তু পতিতকে মিথ্যা-বাদী বল্‌লে, পতিতের আর সহ্য হবে না। মেরে পতিতের পিঠ ছিঁড়ে দিন্‌,—পতিত "না" বল্‌বে না। পতিতের গলায় পা দিন,—দু-আধখানা ক'রে কেটে ফেলুন—পতিতকে গোর দিন, বা গঙ্গার ঘাটে দাহ করুন,—পতিত সে-সময় একটীও কথা কবে না; —কিন্তু পতিত যে, মিথ্যা কথা কয়, এ-কথা বল্‌লে, কিছুতেই সহ্য কর্‌তে পার্‌বে না।"

কর্ত্তা। পতে! তুই কি একটীও মিথ্যা কথা ক'স্‌ না? ঠিক্‌ বলিস্‌!

পতিত। (যোড়হাতে) আজ্ঞে,—পূবের সূর্য্যি যদি পশ্চিমে গিয়ে উদয় হন, তবু পতিত মিথ্যা কথা কবে না।

কর্ত্তা। দেখ্‌,—এখন ওসব কথা রাখ্‌। পূব্‌-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের কথা পরে হবে। আমার সাক্ষাতে ঠিক্‌ ক'রে বল্‌,—তুই কখন মিছে কথা কয়েচিস্‌ কি না?

পতিত। (যোড়হাতে) আজ্ঞে, আমি যদি কখন মিছে কথা কয়ে থাকি, তবে এখনি আমার মাথায় বজ্রাঘাত হউক।

কর্ত্তা। (বিরক্ত হইয়া) আরে! বাজপড়ার কথা আমি বলচি-না,—তুই ব্যাট—

পণ্ডিত। (যোড়হাতে) তবে এখনি আমার ঠোঁটে-মুখে কুঠ হোক্—গায়ে সাদা-সাদা চাকা-চাকা দাগ বেরুক্!

কর্ত্তা। তুই ব্যাটা বড় বদ্‌মাইস্!

পণ্ডিত। আজ্ঞে, তাতে আমি অস্বীকার নই।

কর্ত্তা। ব্যাটাকে মারে কেগো।

পণ্ডিত। আজ্ঞে, তাতে-ও আমি গর্‌-রাজি নই।

কর্ত্তা। ওঃ, ব্যাটা কি ধড়ীবাজ মিথ্যাবাদী!!

পণ্ডিত। (যোড়হাতে) আজ্ঞে, এ গোলামকে ঐটী ক্ষমা কর্‌তে হবে! গোলাম, মিথ্যাকথা জানে না! কোন্ কথা কহিলে মিথ্যা কথা হয়,—এ দাস তাহা বুঝে না। মিথ্যা-কথার রঙ কেমন, এ চাকর তাহা দেখে নাই।

কর্ত্তা। (সুর একটু নরম করিয়া) আচ্ছা, তবে তুই বাপু! আমার সঙ্গে এমন মিথ্যা কথাটা কৈলি কেন?

পণ্ডিত জিহ্বা কাটিল। কিছুক্ষণ পরে জিহ্বাটীকে মুখ-গহ্বরে গুটাইয়া লইয়া পিতত কহিল,—"সেকি কথা? এ রাজ-কাছারিতে আমার নামে বদ্‌নাম! নিশ্চয় আমার কেউ শত্রু আছে।"

কর্ত্তা। না-রে বাপু! তোর আবার শত্রু কে হ'তে গেল?

পণ্ডিত। (যোড়হাতে) আজ্ঞে, সে কথা বল্‌বেন না,—পণ্ডিতের শত্রু সকলেই।

কর্ত্তা। আচ্ছা, না-হয় তাই হলো।—কিন্তু তোর নামেত কেউ আমায় লাগায় নাই,—তুই যে নিজেই আমার সঙ্গে কার্‌সাজি খেলেচিস্।

পণ্ডিত। অ্যাঁ—অ্যাঁ! বলেন কি?

কর্ত্তা। তুই সে দিন বল্‌লি,—কালাচাঁদের কাছে এক পয়সাও নেই,—কালাচাঁদ খেতে পায় না,—

পণ্ডিত। আজ্ঞে, কালাচাঁদ-ত খেতেই পেত না; আপনিই তাকে দিয়ে দিয়ে বাড়িয়েচেন এবং রাজভোগে খাওয়াচ্চেন। আমি মা-গঙ্গা-দরিয়ান্ বল্‌চি,—তার হাতে তখন একটী পয়সাও ছিল না।

কর্ত্তা। যদি একটী পয়সাও কালাচাঁদের ছিল না, তবে সে কেমন করিয়া তার পরদিনই অ াকে ৫।৭৲ টাকার সামগ্রী ভেট দিল?

পণ্ডিত। সে কথা আপনি জানেন, আর আপনার কালাচাঁদ জানে,—আমি কেমন ক'রে জান্‌বো? আপনাদের নাতী-ঠাকুর-দাদার ভাব আমি কেমন ক'রে বুঝবো! আপনি কালাচাঁদ সম্বন্ধে আমাকে বল্লেন একরকম, আর এখন কল্লেন আর এক রকম। বল্লেন ফাঁসি শূলি, কল্লেন রত্ন-সিংহাসন। এখন সেই কালাচাঁদ আমাকে পথে দেখ্‌তে পেলেই লাঠী নিয়ে দৌড়ে মার্‌তে আসে—

কর্ত্তা। পতে! মুখ সাম্‌লে কথা ক'স্!

পণ্ডিত। সাম্‌লা-সাম্‌লিতে আর কাজ কি? আমাকে বিদেয় দিন, আমি এ দেশ থেকে চলে যাই। আমি এমন মারখেয়ে আর ক-দিন এখানে টিকুবো?

কর্ত্তা। কচি খোকাটী-গো! গলা টিপ্‌লে দুধ বার্ হয় কি না,—তাই তোকে কালাচাঁদ পথে দেখ্‌তে পেলেই অম্‌নি মার্‌তে যায়!! কালাচাঁদ অতি সুবোধ বালক।

রামঠাকুর ঘাড় দুলাইয়া বলিলেন,—'হাঁ-হাঁ,— কালাচাঁদ অতি

সুবোধ! চাঁদে কলঙ্ক আছে, কিন্তু কালাচাঁদে মোটেই কলঙ্ক নাই!"

পণ্ডিত। আজ কালাচাঁদ অতি সুবোধ হবে বৈ কি? কিন্তু তখনকার কথাত—

কর্ত্তা। চোপ্‌রও,—বদ্‌মাস! কোই হ্যায় রে!

রামঠাকুর। (কর্ত্তার উদ্দেশে) আপনি এত জোরে কথা কইবেন না,—আপনার বুকে হাঁপ লাগ্‌বে!

দুই জন দ্বারবান্‌ আসিয়া উপস্থিত হইল।

পণ্ডিত। "কোই হ্যায়" হোয়ে আর কাজ কি? কি কর্ত্তে হয়, আমাকেই বলুন-না,—তাই আমিই করি?

কর্ত্তা। চোপ্‌রও,—বদ্‌মাস্‌! ওস্‌কো শির্‌পর্‌ লাগাও জুতি।

পণ্ডিত তখন দড়াম করিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। পড়িয়া, বড়কর্ত্তার জুতা লইয়া, স্বয়ং সজোরে আপন কপালে আঘাত করিতে লাগিল। কিঞ্চিৎ রক্তপাত হইতে আরম্ভ হইলেও, পণ্ডিতের আঘাত-কার্য্য চটাচট্‌-পটাপট্‌ চলিতে লাগিল।

কর্ত্তা তখন রামঠাকুরের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "পণ্ডিতকে ধর, ধর।"

রামঠাকুর আজ্ঞামাত্রে পণ্ডিতের হাত হইতে জুতা কাড়িয়া লইলেন।

জুতা হস্তচ্যুত হইবামাত্র পণ্ডিত মূর্চ্ছার ভান করিয়া ভূতলে পতিত হইল।

কর্ত্তা দ্বারবান্‌ দুইজনকে বলিলেন, "তোমরা স্বস্থানে গিয়া ব'স। চাকরকে জল আনিতে বল।"

দ্বারবানদ্বয় চলিয়া গেল। চাকর জল আনিল। রামঠাকুর সেই জল পণ্ডিতের মুখে, চোখে, নাকে দিলেন—বুকে, পিঠে, মাথায় দিলেন। পণ্ডিত মনে মনে ভাবিল—"ইহা ত এক রকম বিপদ নয়? গায়ে এত জল ঢালে কেন? বোধ হয় কথা কহিলে এ সকল লেঠা চুকিয়া যায়,—কিন্তু কথা কহিলে যদি অন্য বিপদ বাড়ে, তখন উপায়?" এইরূপ ভাবিয়া পণ্ডিত কথাও কহিতে পারিল না,—আর এদিকে রামঠাকুরের জলঢালা-কাণ্ডও থামিল না।

কর্ত্তা। (রামঠাকুরের প্রতি) ভাল ক'রে দেখ,—পণ্ডেটা ম'লো কি রৈল?

রামঠাকুর। মরে গেলেই বা ভাবনা কি আছে? সিন্দুকে পাস্ পূরে দুপুররাত্রে মাঝ-গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে আস্‌বো।

কর্ত্তা ভাবিতে লাগিলেন, "তাই'ত পণ্ডেটা যদি সত্যসত্যই মরে, তা'হলে অনেক হাঙ্গামে পড়্‌তে হবে দেখ্‌চি। খুন হজম করা বড় সহজ নয়। বিশেষ, আজকালের আইন-কানুন বড় খারাপ হয়েচে। আগে আগে যে সকল কাজ করেচি, তাহা হইতে সহজে সতেজে নিষ্কৃতি পেয়েচি! কিন্তু এখন আর সে রকম আদালত নাই, মাজিষ্টর নাই, জজ নাই! যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আর চারা কি আছে? দেখা যাউক,—এখন কি হয়?"

পণ্ডিত ভাবিতে লাগিল;—"ওরে বাবা! রামঠাকুরটা বলে কি? আমাকে সিন্দুকে পূরে গঙ্গায় ফেলে দিবে!! ওঃ, কি ভয়ানক বিপদে পড়েচি! যদি কথা কই, তবে দুটা দরোয়ান এসে এখনি মেরে খুন করবে। যদি চুপ করিয়া পড়িয়া থাকি,—তা'হলে রামঠাকুর এখনি হয় ত আমাকে সিন্দুকে পূরে ফেলে

চাবি বন্ধ করবে। আচ্ছা,—হঠাৎ কি সিন্দুকে পুরতে পারে অনেকক্ষণ দেখ্‌বে-শুন্‌বে,—তার পর ভাব্‌বে-চিন্তবে,—তবে ত সিন্দুকে পুরবে! সে কাজ ক'রতে এখনও অনেক দেরী আছে! আপাতত আমি আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়াই থাকি। যখন আমাকে পাঁজরে-কোলা করিয়া ধরিয়া, সিন্দুকের ভিতর ঢোকাতে যাবে, তখনি আমি পাশমোড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইব। কিন্তু একাজে এক দোষ ঘটে। রামঠাকুর যদি তখন মনে করেন,—আমি বাঁচিয়া উঠি নাই—আমাকে "দানা" পাইয়াছে,—তাই কেবল আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম,—এবং এই ভাবিয়া, যদি রামঠাকুর তখনি আমার মাথায় কুড়ুল মারেন, তাহা হইলে ত একবারেই গিয়াছি! করি কি?—কথা কওয়া কিন্তু এখন কিছুতেই হবে না!"

পতিতপাবন প্রাণভয়ে এইরূপই ভাবিতেছে, বড়কর্ত্তা তখন রামঠাকুরকে বলিলেন,—"ঠাকুর! দেখত,—পতেটার নাক্ দিয়া নিশ্বাস পড়্‌চে কি না?

রামঠাকুর পতিতের নাকের নিকট তাঁহার দক্ষিণ-হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলিটী ধরিলেন।

'পতিত এখনও জীবিত আছে,'—পাছে রামঠাকুর ইহা বুঝিতে পারেন,—তাই পরামাণিক তাহার নিশ্বাসটী বন্ধ করিয়া ফেলিল।

কর্ত্তা। (রামঠাকুরের প্রতি) নিশ্বাস পড়্‌চে কি?

রামঠাকুর। আজ্ঞে,—না।

কর্ত্তা। ভাল করিয়া দেখ,—বুঝিয়া ঠিক্ করিয়া বল,—নিশ্বাস পড়্‌চে কি না?

রামঠাকুর। আজ্ঞে, নিশ্বাসের লক্ষণ কিছুই দেখিতেছি না।

কর্ত্তা। নাকের নিকট অঙ্গুলি খানিকক্ষণ ধরিয়া থাক।

পতিত ভাবিয়াছিল, নাসিকাগ্রে একবার হাত লইয়া গিয়াই, রামঠাকুর তখনই হাত ফিরিয়া আনিবে এবং কর্ত্তাকে বলিবে, পতিতের নিশ্বাস নাই। এইরূপ আশায় আশ্বস্ত হইয়াই, পতিত নিশ্বাস বন্ধ করিয়াছিল; কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকবশত হাত শীঘ্র ফিরিয়া আনা দূরে যাউক, রামঠাকুর যেন চিরস্থায়িরূপে পতিতের নাকের গোড়ায় হাত রাখিয়া দিলেন।

পতিত নিশ্বাস বন্ধ করিয়া আর কতক্ষণ থাকিবে? পতিতের প্রাণ যায়-যায় হইল। পেট ফুলিল; বুক ফুলিল; মুখ ফুলিল; নাক ফুলিল; চক্ষু কপালে উঠিল; পতিত আর থাকিতে না পারিয়া, "বাপ্!" এইরূপ একটা উচ্চধ্বনি করিয়া হুস্-হুস্ শব্দে সমস্ত নিশ্বাসটা রামঠাকুরের হস্তে ফেলিয়া দিল।

রামঠাকুর উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—"পতিত মরে নাই, মরে নাই! নিশ্বাস বন্ধ ক'রে ছিল। কল্লা ক'রে পড়েছিল।"

কর্ত্তা। বল কি? বল কি? ওঃ, ব্যাটা কি বাইস বিটল। ঢের ঢের বদমাইস দেখেছি, কিন্তু এমনটী আমি কখন দেখি নাই। দাও, ব্যাটার দেওয়ালে নাক ঘসাড়ে!

পতিত গাঝাড়া দিয়া উঠিয়া, যোড়হাতে বলিল, "আমার নাক ঘসাড়ে দিবার জন্য অন্য লোককে ডাকিবার দরকার কি? আমি নিজেই ঘস্ড়াচ্চি।"

এই কথা বলিয়া পতিত সেই ঘরের মেজেয় নাক ঘস্ড়াইতে আরম্ভ করিল।

কর্ত্তা। ওঠ্, ওঠ্,—আর ভাঁড়ামি কর্ত্তে হবে না—

পতিত উঠিয়া দাঁড়াইল।

কর্ত্তা। দেখ্, পতে! আজ তোকে আমি মাফ্ ক'রলাম;—ফের্ যদি তুই কালাচাঁদের কোন কথা মুখে আনিস্,—অথবা লোকের কাছে গল্প করিস্,—তবে তোকে কেটে দু-আধখানা ক'রে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিব।

পতিত। আজ্ঞে,—পতিত তা'তে স্ব-রাজি হবে না!

কর্ত্তা। পতে! ভাল ক'রে চোখ মুখ ধুয়ে, ঘরে যা।

পতিত। আজ্ঞে, পতিত কখন আপনার কথার অবাধ্য হ'তে পারবে না। পতিত সব করতে পারে, পারে না কেবল, মিথ্যা কথা কইতে।

পতিত তখন চোখ মুখ ধুইল। কর্ত্তার সাক্ষাতে কাপড়টী সুস্পষ্টরূপে ঝাড়িয়া পরিল। যাত্রাকালে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিল, "পতিত কখন মিথ্যা কথা কয় না।"

কর্ত্তা ভাবিতে লাগিলেন,—"পতেটাকে জব্দ করিবার উপায় কি? ঐ দুকান-কাটা, হেজলদাগড়াটাকে ফাঁদে ফেলিবার উপায় কি?"

পতিত চলিয়া গেল। রামঠাকুর কিন্তু বসিয়াই রহিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, ভোলাময়রাণীর কথাটা আবার উত্থাপিত হয়। আবার তিনি,—কখন হাসিয়া, কখন গম্ভীর হইয়া, কখন ধীরে, কখন দ্রুতপদে, কখন করুণ-বীরে, কখন আদি-বীভৎসে—সেই অবনতাঙ্গী আতুরীর উপাখ্যান কীর্ত্তন করেন। কর্ত্তা মোদ্দা মুখ ফুটিয়া কোন কথাই কহিলেন না। রামঠাকুর, আতুরীর কথা উঠিবার জন্য মনে মনে ঠাকুর দেবতাকে মানসিক করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

সপ্তগ্রাম কোথায়? মনে আছে ত! তা, নিশ্চয়ই নাই। এ সব কথা মনে থাকিলে আর ভাবনা কি?

সপ্তগ্রাম, হুগলীর নিকটবর্ত্তী,—বর্ত্তমান ত্রিশবিঘা ষ্টেসনের সমীপস্থ। সপ্তগ্রাম, বঙ্গের পূর্ব্ব রাজধানী।

ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে সপ্তগ্রাম ভয়ানক জঙ্গল ছিল। উচ্চ মাটীর স্তূপ;—তার উপর নানারূপ বৃক্ষশ্রেণী, এবং নানারূপ লতাগুল্ম; আর তার মাঝে ভগ্ন-অট্টালিকার শেষ-চিহ্ন স্থানে স্থানে দৃষ্ট হইত।

এমনি নিবিড় অরণ্য হইয়াছিল যে, লোকে বলিত, সপ্তগ্রামে বাঘে বাসা করিয়াছে। কেহ বলিত, হাতী লুকাইয়া আছে। কেহ বা অনুমান করিত, বনে সদাই গণ্ডার বিচরণ করিতেছে। ফল কথা, সে বনে সহসা কেহ প্রবেশ করিতে সাহসী হইত না।

ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ভূগর্ভে প্রোথিত বা ভূগর্ভ হইতে কিঞ্চিৎ উত্থিত অনেক বাড়ীর ভগ্নাবশেষ সপ্তগ্রামে দৃষ্ট হইত। কিন্তু রেল-কোম্পানীর কল্যাণে এখন আর তাহার কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইষ্টইণ্ডিয়া-রেলপথে খোয়া দিবার জন্য, কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ মাটী খুঁড়িয়া সমস্ত ঘরবাড়ীর ইট পাথর তুলিয়া লয়েন। প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত যে সমস্ত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্ন অট্টালিকা ছিল, সেই সময় তৎসমুদায়েরই শেষ-চিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়। সেই সময়ই বহু পরিমাণে বন কাটা হয়! সেই সময় হইতেই গজ-ব্যাঘ্র-গণ্ডার-ভীতি নিবারিত হয়।

বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে সপ্তগ্রামের সেই গভীর অরণ্যে দুইটী লোক বিচরণ করিতেছেন। একটী বৃদ্ধ, অপরটী যুবক। বৃদ্ধটী আগে আগে, যুবকটী পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছেন। বৃদ্ধটী পথপ্রদর্শক, যুবকটী পথদ্রষ্টা। সেই নিবিড় জঙ্গলেও যাইবার পথ আছে। প্রশস্ত রাজপথ বা ফুটপাথ অবশ্যই নাই,—গলিপথও নাই, গ্রাম্য-পথও নাই, মেঠো পথও নাই,—আছে কেবল, পথচিহ্ন। অভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত, কেবল সেই চিহ্ন দেখিয়া, অন্য কেহ সে পথে যাইতে একান্ত অক্ষম।

তপনদেব, গগনপটের মধ্য খণ্ডে সমুদিত। ধরাধাম আলোক মালায় বিভূষিত। কিন্তু সপ্তগ্রামের বন এমনি ঘোর-ঘন যে, সেই বিচরণকারী বৃদ্ধ এবং যুবকের অঙ্গে কিছুমাত্র সূর্য্য-রশ্মি লাগে নাই।

যাইতে যাইতে বৃদ্ধ হঠাৎ দাঁড়াইলেন। যুবককে বলিলেন,—"কোন্ পথ দিয়া যাবে?"

যুবক। আপনি যে পথ দিয়া আজ্ঞা করবেন—

বৃদ্ধ। এই সহজ পথে গেলে অনেক ঘোর হয়। পথ ভাল আছে বটে,—কিন্তু গড় পৌঁছিতে প্রায় দুই তিন দণ্ড দেরী লাগিবে। কিন্তু এই সম্মুখস্থ পথ দিয়া যাইতে পারিলে, অর্দ্ধ-দণ্ডেরও কমে তথায় যাওয়া যাইবে।

যুবক। তবে এই সম্মুখস্থ পথ দিয়া'ত যাওয়াই ভাল।

বৃদ্ধ। এই সম্মুখস্থ পথে কিন্তু কিঞ্চিৎ বিপদ আছে।

যুবক। কি বিপদ?

বৃদ্ধ। এই পথে যাইতে হইলে, প্রথমত একটা বৃহৎ গাছে উঠিতে হইবে। সেই গাছ হইতে আবার একটা অন্য গাছে

লাফাইয়া পড়িতে হইবে। সেই দ্বিতীয় গাছ হইতে নামিয়া, একটু চলিয়া গিয়াই, এক ভগ্ন প্রাচীর দেখিবে। খুব সাবধানে সেই প্রাচীরে উঠিতে হইবে। সেই প্রাচীর হইতে প্রায় বার হাত নীচে এক লাফ দিতে হইবে। সেই নিম্নভূমে ইট, পাথর এবং অল্প জল আছে। সেই নিম্নভূমি হইতে একটু উচ্চে উঠিলেই গড়ের দ্বার দেখিবে। কিন্তু তুমি এমন বিপদজনক কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে কি? যখন এক গাছ হইতে অন্য গাছে লাফাইতে হইবে তখন দৈবাৎ যদি পড়িয়া যাও, তাহা হইলে একে বারে অতলস্পর্শে ডুবিয়া যাইবে। বৃক্ষের নিম্নেই প্রস্তরগ্রথিত এক জলাশয় আছে। ঐ জলাশয় যে, কত গভীর, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বারমাসই জল থাকে। বেশ বিবেচনাপূর্ব্বক দেখ, তুমি এই বিপদপূর্ণ পথ দিয়া যাইতে সমক্ষ হইবে কি না?

যুবক। আপনি যদি অনুমতি করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমি ঐ দুর্গম পথ দিয়া যাইতে সক্ষম হইব। ভয় আমার কিছুতেই নাই।

বৃদ্ধ যুবকের শিরে হাত দিয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিলেন, "বাছা! তুমি দীর্ঘজীবী হও। এমন সাহসপূর্ণ, তেজোময় বাক বহুদিন আমাকে কেহ বলে নাই। বাছা! তোমার কথা শুনিয়া আমার আজ প্রাণ যুড়াইল।"

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ আগে আগে, কাঁটাবন ঠেলিয়া চলিলেন;—যুবক তৎপদানুসরণ করিয়া আসিতে লাগিলেন। অল্প দূর গিয়াই, বৃদ্ধ অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক দেখাইলেন,—"বাছা! ঐ দেখ —সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষ! উহা যেন আকাশ ভেদ করিয়া উচ্চে উঠি-

য়াছে। উহার শাখা-প্রশাখা চারিদিকে বিস্তৃত, যেন বহু বাহুদ্বারা পথিককুলকে আহ্বান করিতেছে।

আরও একটু অগ্রসর হইয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "এই স্থানে খুব সাবধানে পথ দেখিয়া আইস—এখানে সর্পভয় আছে। বড় বড় গোখুরা সর্প ফণা উন্নত করিয়া, এস্থলে বেড়াইয়া বেড়ায়। দেখিও যেন সাপের গায়ে পা লাগে না! সাপ দেখিলে ভীত বা সঙ্কুচিত হইবে না; ইতস্তত ধাবিত হইবে না;—উপেক্ষা করিয়া আপন মনে চলিয়া যাইবে। সাপ সুধুসুধু আক্রমণ বা দংশন করিবে না।"

সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষতলে গিয়া বৃদ্ধ বলিলেন,—"ইহা কি গাছ, তাহা আমি জানি না। বোধ হয় কোন পার্ব্বতীয় বা আরণ্য বৃক্ষ হইবে। এ গাছে আগে তুমি উঠিবে, না, আগে আমি উঠিব?"

যুবক। যদি অনুমতি করেন, তবে আগে আমিই উঠি।

বৃদ্ধ। (হাসিয়া) না, আগে তোমার উঠিয়া কাজ নাই!—আমি কি রূপে, কি ভাবে গাছে উঠি, তাহা প্রথমে তুমি পর্য্যবেক্ষণ কর।

এই কথা বলিয়া বৃদ্ধ বিনা-আয়াসে, খুব সহজে থর্ থর্ করিয়া, বানরের ন্যায় গাছে উঠিয়া গেলেন। কিছু দূর গিয়া, স্থির হইয়া, তিনি এক ডালে বসিলেন। যুবককে বলিলেন,—"এই বার তুমি উঠ;—ধীরভাবে উঠ।"

বৃদ্ধের কার্য্য-কৌশল দেখিয়া, যুবক অবাক্। ভাবিলেন, "এই সত্তর বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ এরূপ তীরবেগে এই বৃহৎ বৃক্ষে উঠিয়া পড়িলেন! এমন দ্রুতগতিতে অথচ স্বচ্ছন্দভাবে উঠা'ত আমার কর্ম্ম নয়!"

প্রকাশ্যে আর কোন কথা না কহিয়া, যুবক, ধীরে ধীরে, বিশেষ সতর্কতার, সহিত, গাছে উঠিতে লাগিলেন। বহু কষ্টে তিনি এ কার্য্যে সক্ষম হইলেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধের গাছে উঠিতে যে সময় লাগিয়াছিল, যুবকের তাহার চতুর্গুণ সময় লাগিল।

বৃক্ষশাখায় বৃদ্ধের নিকট যুবক পৌঁছিলে, বৃদ্ধ কহিলেন, "আইস আমার সঙ্গে। এই বৃক্ষের উচ্চ চূড়ায় যাইতে পারিবে ত?"

যুবক। আজ্ঞে, পারিব।

তখন উভয়ে সেই উচ্চ বৃক্ষের সর্ব্বোচ্চ শাখায় গিয়া উপনীত হইলেন। বৃদ্ধ কহিলেন,—"ঐ দেখ, অদূরে গঙ্গা প্রবাহিত। ঐ দেখ, পাল তুলিয়া নৌকা যাইতেছে। যে দিন আমরা গড়ের ভিতর বসিয়া মন্ত্রণা করি, সে দিন এই বৃক্ষোপরি দুই জন প্রহরী উঠিয়া চারি দিক্ পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকে। বাছা! তুমি চারি দিক্ ভাল করিয়া দেখিয়া লও। এমন উচ্চবৃক্ষ বোধ হয় এ দেশে আর নাই। আরও দেখ, পাতার এমন ঘন সন্নিবেশ যে, এ বৃক্ষোপরি উঠিলে, দূর হইতে তোমাকে কেহই দেখিতে পাইবে না; অথচ তুমি সকলকেই দেখিবে। এই বৃক্ষ হইতে তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিবার বেশ সুবিধা! তুমি তীর ছুড়িবার কৌশল জান কি?

যুবক। আজ্ঞে,—না। খেলা-ছলে দুই-একবার তীর-ধনুক লইয়া হনুমান্ তাড়াইয়াছিলাম,—এই মাত্র!

বৃদ্ধ। তীরের তেজ বড় ভয়ঙ্কর। উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত, হইয়া, সুকৌশলে, শীঘ্রহস্তে তীরধনুক লইয়া যুদ্ধ করিতে পারিলে, শত্রুদল নিশ্চয়ই ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া পড়িবে। যখন আমাকে গ্রেফ্‌-তার করিবার জন্য, এই বাঙ্গলায় সমস্ত পুলিস এক হইল, আমাকে

ধরিয়া ফাঁসি-কাঠে লট্‌কাইবার জন্য রাজকর্ম্মচারিগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল, তখন আমি সাঁওতালদের দেশে গিয়া আশ্রয় লইলাম। লুকাইবার অমন সুবিধাজনক স্থান আর নাই। বন, পর্ব্বত, উপত্যকা, গিরিগুহা, নদীতট —সাঁওতালদেশে সবই আছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতাকীর্ণ এরূপ নিবিড় অরণ্য আছে যে, বোধ হয়, তথায় আজ পর্য্যন্ত মনুষ্যের গতায়াত হয় নাই। সে দেশে আমাকে আর ধরে কে? বিশেষ, সাঁওতালগণ বড়ই বিশ্বাসী, অতিথি-সেবা-তৎপর, এবং শরণাগতের আশ্রয়। আমি তাঁহাদের মধ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে লাগিলাম। ক্রমশ তাহাদের সহিত আমার সদ্ভাব জন্মিল। কালক্রমে সেই প্রসিদ্ধ সাঁওতাল-যুদ্ধ উপস্থিত হইল। আমিও তখন সাঁওতালদের একজন দলপতি হইয়া হাতে তীরধনুক ধরিলাম। ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে পাইব বলিয়া মনে বড়ই আহ্লাদ এবং উৎসাহ হইল। ইংরেজের সহিত সম্মুখ সমরে পরাস্ত হইব জানি, ইংরেজের গোলায় প্রাণ যাইবে, তাহাও বুঝি,—তথাচ ইংরেজকে একবার হাত দেখাইয়া মরিতে ইচ্ছা হইল;—আমরাও যে, জননীর স্তন্যপান করিয়াছি, ইংরেজকে তাহা একবার দেখাইবার সাধ জন্মিল। রণভেরী বাজিয়া উঠিবামাত্র ইংরেজসৈন্য দলে-দলে সাঁওতালদেশে প্রবেশ করিল। আমি একশত সাঁওতাল যোদ্ধার নেতা হইলাম। প্রত্যেক সাঁওতালই এক এক জন বীরপুরুষ; মৃত্যুকে ভয় করে না; প্রভুর আজ্ঞাবহ দাস; এবং যুদ্ধকালে ভীষ্ম-প্রতিজ্ঞ। আমরা মাজিষ্টরের বাঙ্গলা পোড়াইলাম, কালেক্টরি লুঠিলাম, সিপাহীগণের নিকট হইতে সজোরে রসদ কাড়িয়া লইলাম, ভাল ভাল বন্দুক দখল করিলাম। কোম্পানি কাঁপিয়া উঠিল। আতঙ্কে

শিহরিল! ভাবিল, বুঝি, সাঁওতালগণই ইংরেজকে দেশছাড়া করিবে। আমি অবশ্যই বুঝিয়াছিলাম, সাঁওতালদের এ ব্যাপার জলবুদ্‌বুদ মাত্র,—ইহা বালির বাঁধ এবং জলের আলৃপনার সহিত তুলনীয়।

যুবক। আপনি সে সময়ে কোন অস্ত্র হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন? বন্দুক না তীর?

বৃদ্ধ। (হাসিয়া) অস্ত্র কিছু ছিল না বলিলেই হয়। গোটা পাঁচিশ বন্দুক ইংরেজের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কিন্তু বন্দুক ছুড়িবার উপকরণ কিছুই ছিল না। বিশেষ, সাঁওতালগণ বন্দুক ছুড়িতে অভ্যস্ত নহে। তবে শোভার স্বরূপ বন্দুকগুলি সঙ্গে থাকিত। তীরে-ধনুকে তাহারা সিদ্ধ ছিল; কিন্তু সিদ্ধ থাকিলে কি হয়? তীরগুলি মরিচা ধরা, ধনুকের ছিলা ছেঁড়া।

যুবক। তবে যুদ্ধাদি হইত কিরূপে?

বৃদ্ধ। কামার ডাকাইয়া, তাড়াতাড়ি করিয়া সংক্ষিপ্তভাবে কতক তীরে শান্ দিয়া লইলাম। আমি বিশ হাজার তীরের বরাদ্দ করিলাম। লোহা ইস্পাত যুটিল বটে, কিন্তু এত কামার কোথা পাইব? যে কয়জন কামার পাইলাম,—তাহারা কারিকর প্রায় আমারই মতন। শুনিলাম, এদেশে আগে খুব ভাল কারিকর ছিল, কিন্তু ইংরেজের আমলে, অস্ত্রাদির আবশ্যকতা না থাকায় কামার-বংশ এককালে ধ্বংস হইয়াছে। পেটের দায়ে তাহারা কে কোথায় পলাইয়াছে, তাহার ঠিক নাই। অধুনা, তীর তৈয়ারি আর বড় হয় না। কাজেই কামার, তীর তৈয়ারিতে কারিকর হইতে পায় না। যাহা হউক, কয়েকজন কামার আসিল; আম-

রাও তাহাদের সহিত যোগ দিলাম। এই উভয়দলে একত্র মিলিয়া আড়াই হাজারের অধিক তীর তৈয়ারি হইল না। তাহা লইয়াই যাত্রা করিলাম।

যুবক। কোন্ দিকে প্রথমে গেলেন?

বৃদ্ধ। সাতক্রোশ দূরে এক পুলিস-থানা ছিল। তথায় ষোল-জন মাত্র ভোজপুরে সিপাহী থাকিত। সিপাহীগুলা অকর্ম্মার একশেষ। এক কড়ার যোগ্যতা নাই,—কেবল ছাতু খাইতে মজ-বুত। তাহাদের বন্দুক আছে, তোজদান আছে, সঙ্গীন আছে—আছে সব; কিন্তু সে সব নাড়ে কে? তোলে কে? আমরা এক দিন শেষরাত্রে "হো—হা" করিয়া গিয়া তথায় পড়িলাম, সিপাহীগুলা যে কোথায় পলাইয়া গেল, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। উহারা দক্ষ, কেবল পলাইবার সময়।

যুবক। শুনিয়াছি, সিপাহীগণ ত ভাল যোদ্ধা।

বৃদ্ধ। যুদ্ধ করিতে পারিবে না কেন?—কিন্তু বড়ই কাপুরুষ। উহারা যুদ্ধ করে, কেবল ইংরেজের ভয়ে। কর্ত্তব্যজ্ঞান আদৌ নাই। যখন তাহারা বুঝে যে, যুদ্ধ না করিলেও শেষে ইংরেজের হস্তে প্রাণ যাইবে, তখন উহারা বীরের ন্যায় যুদ্ধ করিতে থাকে। সে দিন থানায় যদি একটা লালমুখ গোরা থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সিপাহীগণ পলাইত না। সেই গোরার আজ্ঞায় আমাদের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিত। আর, সম্মুখ যুদ্ধ হইলে, যুদ্ধের ফলাফল কি হইত, তাহা বলা যায় না। কারন উহারা আগ্নেয় অস্ত্রধারী—আমরা একরূপ নিরস্ত্র। আমি জানিতাম, "হো—হা" শব্দ করিলেই,—কেবল হাত-তালিতেই নিশ্চয় ভোজ-

পুরেগুলা পলাইবে,—তাই ওরূপ ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলাম। গোরা থাকিলে, আক্রমণের কৌশল অন্যরূপ হইত।

যুবক। সে কৌশল কিরূপ?

বৃদ্ধ। (হাসিয়া) গভীর রাত্রে লঙ্কাদগ্ধ করিতাম। আগুন ধূ ধূ জ্বলিয়া উঠিত। গোরা-বাছাধনগণ অবশ্যই বাহির হইয়া পড়িত। আমরা কোন নিভৃত স্থান হইতে, বা এইরূপ কোন বৃক্ষের উপর হইতে—গোরার-পোয়ের প্রাণ লইতাম। কিন্তু এই কয়টা ভোজপুরেদের জন্য এত কষ্ট স্বীকার করিব কেন?

যুবক। আচ্ছা,—ভোজপুরে মাত্রেই কি এত অকর্ম্মণ্য।

বৃদ্ধ। না, কে বলিল? কতকগুলা ভোজপুরে আছে, কেবল ছাতু খাইবার জন্যই তাহারা জীবন ধারণ করিয়া থাকে। অন্যান্য ভোজপুরবাসিগণ কর্ত্তব্যপরায়ণ, স্থির-বুদ্ধি এবং রণদুর্ম্মদ।

যুবক। থানা দখলের পর কি করিলেন?

বৃদ্ধ। তার পর-দিন গিয়া কালেক্টরি লুটিলাম।

যুবক। এখানে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল কি?

বৃদ্ধ। (হাসিয়া) না। যুদ্ধ অধিকাংশ সময়ই করিতে হয় না, কেবল বাহু প্রতাপে শত্রুপক্ষ পলায়। যদি প্রতিপদে যুদ্ধ করিতে হইত, তাহা হইলে সংসার চলিত? যুদ্ধ আমাকে কোন দিনই করিতে হয় নাই;—কেবল একটী দিন মাত্র যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। সে দিন শত্রু-পক্ষের রাঙ্গারক্তে কালো পাহাড় ভূষিত হইয়াছিল।

যুবক। সে যুদ্ধ কি রকম?

বৃদ্ধ। আমাকে এবং আমার দলকে ধরিবার জন্য তখন

আড়াইশত গোরা এবং এক হাজার সিপাহী ধাবিত হইয়াছে! ইহারা আবার চারি পাঁচ দলে বিভক্ত হইয়া আমাকে অন্বেষণ করিতেছে; কিন্তু আমি ধরা না দিলে, আমাকে ধরিবে কিরূপে? ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করিব,—ইহাই আমার চিরদিনের অন্তরের সাধ। একটা সুবিধাজনক স্থান পাইয়া সেইখানে আড্ডা করিলাম। সেই স্থানের এক দিকে ঢালু পাহাড়। সেই পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গাছ, এবং বিষম কাঁটাবন। অভ্যাস না থাকিলে, এবং পথ না জানিলে, সে পাহাড়ে অন্যে উঠিতে অক্ষম। বেলা দ্বিপ্রহরে ইংরেজ-ছাউনিতে একজন গোয়েন্দা সংবাদ দিল, আমি এখানে সসৈন্যে আছি। কোম্পানির সে ছাউনিতে তখন একশত গোরা এবং আড়াইশত সিপাহী ছিল। তাহারা সকলে অস্ত্র-শস্ত্রে মণ্ডিত হইয়া, আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ধাবিত হইল! সূর্য্যদেব পশ্চিম-গগনে পাটে বসিয়াছেন,—আমি একাকী, সাতজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত, পর্ব্বতোপরি উঠিয়া দেখিতেছি,—সিপাহী-দল আগে আগে, গোরা-দল পশ্চাৎ পশ্চাৎ তালে তালে পা ফেলিয়া আসিতেছে। বন্দুকের সঙ্গীন, সূর্য্যের রক্তিম আভায় যেন রক্তময় হইয়া উঠিয়াছে। অশ্বারোহী, অশ্বে আরোহণ করিয়া, তরবারি ঘুরাইতেছে। ঐরাবত-সদৃশ বৃহৎ বৃহৎ গজ এবং উষ্ট্র, পৃষ্ঠদেশে তাঁবু এবং আহারীয় সামগ্রী বহন করিয়া আনিতেছে। তাহার পশ্চাতে প্রায় একশত ডুলি, বাহকগণ স্কন্ধে করিয়া বহিতেছে। সৈন্যগণ অন্যূন পঞ্চাশ দলে বিভক্ত হইয়া শ্রেণীবদ্ধ হইয়া, দ্রুতপদে অগ্রসর হইতেছে!

এই সমস্ত আয়োজন দেখিয়া আমি আমাকে বড় ভাগ্যবান্ বলিয়া ভাবিলাম। আজ কি শুভদিন! আমার অদৃষ্টে আর এমন

দিন ঘটিবে না।" এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র বাঙ্গালীর জন্য এত উদ্যোগ! আমি আজ ইংরেজের সহিত সম্মুখ-সমরে আত্ম-প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। পরক্ষণেই মনে হইল, আমি একা নহি; আমার সহিত এই দেড়শত লোক সুধু সুধু মরিবে কেন? কৌশল করিতে হইবে,—উপায়ে কার্য্য-সিদ্ধি করিতে হইবে। সেই সাতজন অনুচরের সহিত পরামর্শ করিলাম। ষোল জন লোক থাকাই স্থির হইল।

যুবক। আপনি ত এইরূপ ভাবিতেছেন এবং পরামর্শ করিতেছেন, কিন্তু সেই ইংরেজ-সৈন্য ইতিমধ্যে কতদূর অগ্রসর হইল?

বৃদ্ধ। পথিমধ্যে এক গিরি-নদী ছিল। ক্ষুদ্র নদী,—জল বেশী ছিল না; হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সেই নদী হইতে পর্ব্বত অর্দ্ধপোয়া পথ। ইংরেজ সৈন্যদল সেই নদী পার হইবামাত্র,—আমার সেনাগণ তীর-বর্ষণ আরম্ভ করিল;—শ্রাবণের বারিধারার মত তীর বৃষ্টি হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পঁচিশ জন ইংরেজ-সৈন্য তীর-বিদ্ধ হইয়া ভূপতিত হইল। আমরা আনন্দ-উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম; কিন্তু সে রব ক্ষণমাত্র! আমরা যেরূপ তীর-বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছিলাম, তৎক্ষণাৎ ইংরেজ সৈন্যগণ সেইরূপ গুলি-বর্ষণ আরম্ভ করিল; বন্দুকের সেই উত্তপ্ত গুলির আঘাতে একাদশ জন সাঁওতাল ভূপতিত হইয়া একবারে প্রাণত্যাগ করিল। দেখিতে দেখিতে আরও পাঁচজন মরিল। আমি তখন বংশীধ্বনি করিয়া নাগরায় কাঠি দিলাম। আমার সৈন্যদল পাহাড়ের অপর প্রান্ত দিয়া দ্রুতপদে পলাইল। ইংরেজ-সৈন্য বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল। শত্রু পলায়িত দেখিয়া, তাহারা এক ভৈরব হুঙ্কার ছাড়িল। এই সময় এক মহা গোল উঠিল। তখন

সূর্য্য ডুবু-ডুবু, সন্ধ্যা হয় হয়! সন্ধ্যার ঈষৎ অন্ধকার, বন্দুকের ধোঁয়া এবং বিষম গোলযোগ—এই তিন ব্যাপারে বিশেষ সুবিধা পাইয়া, সেই পার্ব্বতীয় বৃহৎ আটটী বৃক্ষে উঠিয়া-পড়িয়া লুকাইয়া রহিলাম। পূর্ব্বপরামর্শ মত, এক একটী বৃক্ষে দুইজন করিয়া উঠিলাম। ইংরেজ সৈন্য প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল, এদিক্-ওদিক্ ধাবিত হইল,—এক জনকেও ধরিতে পারিল না। যে কয়েকজন সাঁওতালের মৃতদেহ পাহাড় হইতে গড়াইয়া পড়িয়াছিল, ইংরেজ-সৈন্য কেবল সেই দেহগুলাকে বহিয়া লইয়া, সেই তটিনী-তটে রাখিল। দেখিতে দেখিতে গাঢ় সন্ধ্যা সমাগত হইল। ক্রমশ কিছুই আর দেখা গেল না। সে প্রদেশ কেবল বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্ব্বত, নদী-ঝরণায় পরিপূর্ণ। কোন নির্দ্দিষ্ট বাঁধা পথ নাই। যুদ্ধে জয়ী হইয়া, ইংরেজ সৈন্য নিজের দূরস্থ আড্ডায় প্রত্যাগত হইল না; সেই নদীতটে তাঁবু খাটাইয়া রাত্রি বাসের উদ্যোগ করিল। আলো জ্বলিল। সিপাহীগণ নদীর ধারে উনান তৈয়ারী করিয়া রন্ধন আরম্ভ করিল। গোরাগণ, বিশ পঁচিশ জন হিসাবে এক এক স্থানে বসিয়া, চা বিস্কুট রুটি খাইতে লাগিল। গোরাদের জন্য আহারীয় সামগ্রী একেবারে রাঁধা তৈয়ারী আসিয়াছিল। চা বিস্কুটের পর,—তাহারা মদ মাংস ধরিল। সঙ্গীত আরম্ভ হইল। তাঁবু কয়েকটা খাটান হইল বটে, কিন্তু তাহার ভিতরে বড় একটা কেহই রহিল না। সকলেই আমোদ-আহ্লাদ করিয়া বাহিরে বেড়াইতে লাগিল।

সেই অত্যুচ্চ বৃক্ষচূড়ায় বসিয়া যুবক চিত্রার্পিতের ন্যায় নীরবে নিস্পন্দে, বৃদ্ধ-মুখ-নিঃসৃত এই মাধুরীপূর্ণ মহাকথা শুনিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ, যুবকের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,

"দৃঢ়-মুষ্টিতে বৃক্ষশাখা ধরিয়া থাক। দেখিও, অন্যমনস্ক হইয়া যেন হাত ছাড়িয়া দিও না। বৃক্ষোপরি বসিয়া আছ, ইহা যেন তোমার এক্ষণে সর্ব্বদাই মনে জাগরূক থাকে।"

এই কথা শুনিয়া যুবক লজ্জিত হইলেন। বাস্তবিকই তিনি তখন অন্যমনস্ক ছিলেন। সর্ব্ব বিষয় ভুলিয়া গিয়া, তিনি একাগ্র-চিত্তে কেবল ঐ গল্প শুনিতেছিলেন। প্রকৃতই তাঁহার বৃক্ষশাখা হইতে হাত আল্‌গা হইয়া কতক খুলিয়া গিয়াছিল। যুবক সামলাইয়া লইয়া, সুস্থ হইয়া বসিয়া ধীর-স্বরে বলিলেন,—"হঁা, অন্যমনস্কই হইয়াছিলাম। গল্পস্রোতে ভাসিয়া গিয়াছিলাম। আর এ দোষ হইবে না।"

বৃদ্ধ। কোন বিষয়েই কখন অত্যন্ত উতলা হইবে না। ঔৎসুক্যের আতিশয্য অত্যন্ত খারাপ।

যুবক। আপনার উপদেশ শিরোধার্য্য!

বৃদ্ধ। তারপর গল্প শুন। ইংরেজ-সৈন্য আহ্লাদে আটখানা। সাত টাকা বেতনের সিপাহীগুলাও, স্বদেশবাসিগণকে হত্যা করিয়া আনন্দে কুন্দন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। দেখিয়া-শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল। আমরা তীর-ধনুক সঙ্গে লইয়া গাছে উঠিয়া-ছিলাম। প্রত্যেকের নিকট আড়াইশত করিয়া ক্ষুরধার বিষাক্ত তীর ছিল। দুইজন গোরা এবং চারিজন সিপাহী বন্দুক ঘাড়ে করিয়া তাঁবুর নিকট পাহারা দিতেছিল। ইংরেজের সেনা-শিবির তখন আলোকময়। আমি বেশ লক্ষ্য করিয়া একজন প্রহরী গোরার বাম চক্ষে এক বাণ মারিলাম। বাণ চক্ষু ভেদ করিয়া গোরার ঘাড় দিয়া বাহির হইল। গোরা অমনি ভূতলশায়ী হইল। তৎক্ষণাৎ অমনি আমার অন্য পনর জন অনুচর শীঘ্রহস্তে বাণ

বর্ষণ আরম্ভ করিল। ইংরেজ-শিবিরে এক মহাভয়ঙ্কর সন্ত্রাস উপস্থিত হইল। সে এক বিরাট্ হৈ হৈ ব্যাপার ইংরাজী বংশীধ্বনী হইল। ব্যাণ্ড বাজিল। সৈন্যগণ যে যেখানে ছিল, অমনি বন্দুক লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কোন গোরা রুটী চিবাইতেছিল, সেই অর্দ্ধভুক্ত রুটী মুখ হইতে ফেলিয়া দিয়া বন্দুক ধরিল। কেহবা ভূমে শুইয়া আনন্দ-গান গাহিতেছিল;— সে অমনি উঠিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া তরবারির খাপ খুলিয়া ফেলিল। কেহ বা মনের সুখে নিদ্রা গিয়াছিল; বাঁশীর ভীতি-ব্যঞ্জক রবে সে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া, পোষাক পরিতে পরিতে আপন শ্রেণীমধ্যে দৌড়িল। ইংরেজ-সৈন্যমধ্যে রব উঠিল,—"শত্রু আসিয়াছে, শত্রু আসিয়াছে,—প্রবল শত্রু,—খুব সাবধান—কিন্তু ভয় নাই—ভয় নাই।" সংবাদ এরূপ ভয়াবহ হইলেও, ইংরেজ-সেনাগণ বেশ শৃঙ্খলার সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইতে লাগিল। কিন্তু গোল ঘটিল,—ভোজপুরে সিপাহী লইয়া। কে কার ঘাড়ে পড়ে, তার ঠিক নাই। কে কোথায় যায়, তাহার ঠিক নাই। কে কাহার বন্দুক লয়, তাহার ঠিক নাই। কে কার পোষাক পরে, তাহার ঠিক নাই। কে কাহার দলে মিশে, তাহার ঠিক নাই। এই ভোজপুরী দলে সকলি অঠিক এবং অনিয়ম। বোধ হয় অনিয়মই ইহাদের নিয়ম। যাহা হউক, বেচারাদের বড় কষ্ট হইয়াছিল। কেহ ভাতটী রাঁধিয়া ফেনটী গড়াইতেছিল; কেহ রুটী সেকিয়া ঘী মাখাইতেছিল; কেহ ছাতু গুলিয়া গুড় মাখিয়া মুখে তুলিবার উপক্রম করিতেছিল। এমন সময় রণভেরীর ভৈরব রব হইল। তখন মুখের 'গ্রাস' মুখে রৈল, কেবল নয়ন জলে ভেসে গেল। ফলকথা, ভোজপুরীদের মধ্যে অনিয়ম এবং মনঃকষ্টের অবধি

রহিল না। এ দিকে আমরা ষোলজন ব্যক্তি ঝাঁকে-ঝাঁকে বাণ বৃষ্টি করিতে লাগিলাম। কাহারও বুক বিঁধিল, কাহারও পেট বিঁধিল, কাহারও নাক বিঁধিল কেহ ধরাশায়ী হইল, কেহ পলাইবার উদ্যোগ করিল, কেহ বা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। আমরা আটজন ব্যক্তি কেবল গোরাদলের উপর বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলাম ; অন্য আট জন ব্যক্তি, সিপাহীদলকে ছিন্ন-ভিন্ন করিতে লাগিল। দুই মিনিট মধ্যে প্রায় পঁচিশজন সেনা বিষম প্রাঘাত প্রাপ্ত হইল। ইত্যবসরে গোরা-সৈন্যগণ বেশ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া পর্ব্বতের উপর গুলি-বৃষ্টি আরম্ভ করিল। তাহারা ভাবিয়াছিল ; সাঁওতালগণ পর্ব্বতের উপর পুনরায় আসিয়া, অন্ধকারের সুবিধা পাইয়া, তীর ছুড়িতেছে। কিন্তু এবার ইংরেজের গুলিতে তীরবর্ষণ কিছুই থামিল না। সাঁই-সাঁই শব্দে তীর আসিয়া ইংরেজ-সৈন্যদলকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। ইংরেজ কিছু ভীত হইল। কোথা হইতে তীর আসিতেছে, কোথায় শত্রু লুক্কায়িত আছে,—ইংরেজ, ইহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারিল না। তখন প্রকৃত তথ্য নির্দ্ধারণের জন্য ষোল জন অশ্বারোহী সৈন্য গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে অগ্রসর হইল। কিন্তু সে সময় ঘোর অন্ধকার ; পর্ব্বত ঘোরতর অন্ধকার ; বৃক্ষরাজিও ঘোরতর অন্ধকার। আমরা বৃক্ষশাখার অন্তরালে নির্ব্বিঘ্নে থাকিয়া, মনের সাধে মহোৎসাহে কেবল বাণ-বৃষ্টি করিতে লাগিলাম। এক ভয়, বাণ ফুরাইলে উপায় কি ? শেষে সে উপায় যাহা হয় করা যাইবে ; কিন্তু এখনত তা বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। এই ভাবিয়া প্রাণপণে বাণ ছুড়িতে লাগিলাম। সেই ষোলজন অশ্বারোহী বাণের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত-দেহ হইল। তথাচ তাহারা পশ্চাৎপদ হইল না;

ক্রমশই অগ্রগামী হইতে লাগিল। কিন্তু অন্ধকারে নিবিড়-জঙ্গলে তাহারা কি করিবে? পাহাড়ে' পথ—মাঝে মাঝে গর্ত্ত এবং ঝুপি বন। একজন অশ্বারোহীর ঘোড়া, পা-হড়্‌কাইয়া পড়িয়া গেল। অশ্বারোহীও সেই সঙ্গে পড়িয়া ভূমে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। আমি ঘোড়ার পেটে তিন বাণ এবং অশ্বারোহীর বক্ষে দুই বাণ মারিলাম। ঘোড়া ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল; অশ্বারোহী অচেতন হইয়া মৃতবৎ হইল। আমার অন্য একজন অনুচর দ্বিতীয় অশ্বারোহীর দুই চক্ষে দুই বাণ মারিল; সে, চারিদিক অন্ধকার দেখিয়া, ঘুরিয়া ভূতলে পতিত হইল। তাহার অশ্বটী বেগে ছুটিয়া পলাইল। তৃতীয় অশ্বারোহীর অবস্থা আরও শোচনীয়। বাণাঘাতে তাহার ঘোটকের চারিটা পা-ই খোঁড়া হইয়াছে। ঘোড়া কিছুতেই অগ্রসর হইতে চায় না,—পারেও না। অশ্বারোহী তবু ছাড়িবে না—ঘোড়া চালাইবেই! সে, তখন ঘোটকের গলায় আদর-ছলে চাপড় মারিতে লাগিল! একবাণে সেই হাতটী ঘোড়ার সহিত তৎক্ষণাৎ গাঁথা গেল। হঠাৎ তাহার ললাটেও এক বিষম বাণ বিদ্ধ হইল। অশ্বারোহী তখন নিতান্ত কাতর হইয়া ঘোড়ার উপর শুইয়া পড়িল। তখন সেনাপতি দূর হইতে বংশীধ্বনি করিল, অমনি অবশিষ্ট অশ্বরোহিগণ ফিরিয়া চলিল। আবার বংশীধ্বনি হইল;—অবশিষ্ট জীবিতসেনা নদী পার হইয়া পলাইল। তাহারা আহত ব্যক্তিগণকে, যত পারিল, ডুলি করিয়া লইয়া গেল। একশত ডুলি পূর্ণ হইল। অনেকগুলি মৃতদেহ রণস্থলে পড়িয়া রহিল। আমার বিশ্বাস, এই যুদ্ধে অন্যূন ১২৫ জন সিপাহী এবং ৬০ জন গোরা প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। রণক্ষেত্রেই যে এতগুলি লোক মরিয়াছিল, তাহা নহে। যাহারা আহত হইয়াছিল, তাহারা

ঘরে গিয়া, চিকিৎসিত হইলেও, অবশ্যই মরিয়াছিল। কেননা বাণ সকল বিষাক্ত। একবার রক্তের সহিত সে বাণ-মুখের যোগ হইলে, আর রক্ষা নাই!

যুবক। যুদ্ধ অবসানে আপনি রণজয়ী হইয়া কি করিলেন?

বৃদ্ধ। চোখ দিয়া টস্ টস্ জল পড়িতে লাগিল।

যুবক। কেন—কেন?

বৃদ্ধ। কেন,—কি? এই একশত পঁচিশজন স্বদেশবাসী সিপাহীকে সুধু সুধু কেন প্রাণে মারিলাম? ইহাদের অপরাধ কি? ৭৲ টাকা মাহিনার জন্য ইহারা অদ্য প্রাণ দিল! ধন্য প্রভু-ভক্ত!! আর তখন কত কথা যে, হৃদয়ে উদয় হইল, তাহা আর তোমাকে কি বলিব?—এবং তাহা তোমার শুনিয়াও কাজ নাই।

যুবক। আচ্ছা, বৃক্ষ হইতে নামিয়া তখন কি করিলেন?

বৃদ্ধ। (হাসিয়া) সে অনেক ইতিহাস। সে কথাও এখন তোমার শুনিয়া কাজ নাই। আমি যে যুদ্ধের কথা এখন তোমার নিকট বলিলাম,—তাহা ইংরেজ-লিখিত ইতিহাসে অবশ্যই লেখা নাই;—লেখা আছে, কেবল আমার অন্তরে। আমি মরিলে, ইতিহাসও ফুরাইবে থাক্ ওসব কথা। এই বৃক্ষ দেখিয়া সাঁওতাল দেশের সেই বৃক্ষ মনে পড়িয়াছিল বলিয়াই, আজ এত কথা গল্প করিলাম। এখন চল,—আমারা লাফ্ দিয়া, অন্য বৃক্ষে যাই!

যুবক। কোথায় লাফ্ দিয়া পড়িব বলুন।

বৃদ্ধ। এস্থান হইতে লাফ্ দিতে হইবে না,—আরও একটু নীচে এস। যে ডালে ত্রিশূল অঙ্কিত আছে, সেই ডাল হইতে উহার নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের ডালে লাফাইতে হইবে। মধ্যে পাঁচ হাত ব্যবধান।

সেই ত্রিশূল-চিহ্নিত শাখায় আসিয়া প্রথমত বৃদ্ধ লাফ দিয়া অন্য বৃক্ষের শাখা ধরিলেন। যুবক তার পর লাফ দিলেন। এবার ডাল মড়্‌-মড়্‌ করিয়া উঠিল। বৃদ্ধ বলিলেন; "ভয় নাই, পার্শ্বস্থ অন্য ডাল আশ্রয় কর।" যুবক তাহাই করিলেন। বৃদ্ধ তখন বলিলেন, "তুমি অদ্য সোজা পথটী নষ্ট করিলে। ডালটী অর্দ্ধভগ্ন হইয়াছে; সুতরাং ভবিষ্যতে আর লাফাইব কোথায়? এ ডালটী এখনি সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইতে হইবে।" যুবক অপ্রতিভ হইলেন। বৃদ্ধ কহিলেন, "তোমার বিশেষ দোষ নাই। তোমার গুরু শরীর; এবং তুমি খুব তেজের সহিত লম্ফ দান করিয়াছিলে; কাজেই বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিল, সম্পূর্ণ-রূপে ভাঙ্গিলে হয়ত তোমার জীবন-নাশ হইতে পারিত। ওরূপ জোরে, না লাফাইয়া, একটু ধীর-ভাবে লাফাইলে, আর এ বিভ্রাট ঘটিত না! যাহা হউক, গত কর্ম্মের আর অনুশোচনা কি আছে? —তোমার মত জোরে লাফাইতে গিয়া আমি একদিন গাছ হইতে পড়-পড় হইয়াছিলাম। সতেজ লম্ফের দরুণ ডাল বিষম দুলিতে লাগিল। বর্ষার জল পড়িয়া, ডাল কিছু পিছল হইয়াছিল। হঠাৎ আমার হাত ফসকাইয়া গেল। আমি পড়িলাম। কিন্তু পতন-কালেও আমি বুদ্ধিহারা হই নাই। পড়িতে-পড়িতে গুঁড়ির নিকটস্থ আর একটী ডাল ধরিয়া সে দিন রক্ষা পাইলাম।"

যুবক। আমি যদিও অনেকানেক গাছে উঠিয়াছি, নানা স্থান হইতে লাফাইয়াছি বটে,—কিন্তু এরূপ বৃহৎ বৃক্ষে কখন উঠি নাই; এরূপ সঙ্কট স্থান দিয়াও কখন লাফাই নাই। কাজেই প্রথম উদ্যমে শরীরে সর্ব্বশক্তি সঞ্চয় করিয়া লাফ দিয়াছিলাম। অভ্যাস হইলে লাফে এত জোর লাগিবে না।

বৃদ্ধ। লাফালাফির ব্যাপার ত আজ হইতে ফুরাইল! এই ডালকে এখনি ভাঙ্গিতে হইবে।

যুবক কিছু ক্ষুণ্ণ হইলেন। বৃদ্ধ কহিলেন, "তুমিই তবে ঐ ডালটী ভাঙ্গ।" যুবক এক আকর্ষণেই সেই ডালটী ভাঙ্গিয়া ভূতলে ফেলিয়া দিলেন। বৃদ্ধ কহিলেন,—"সাবাস্।"

যুবক জিজ্ঞাসিলেন, "আর কোথায় লাফাইতে হইবে?"

বৃদ্ধ। আর বেশী গোল নাই। বেশী বিপদ্‌ও নাই। এই গাছ হইতে নামিয়া একটী উচ্চ ভগ্নপ্রাচীরে উঠিতে হইবে। সেই প্রাচীর হইতে বার হাত নীচে লাভ দিতে হইবে। প্রাচীর হইতে যে নিম্ন স্থলে লাফাইয়া পড়িবে, তথায় অল্পমাত্র জল এবং ভগ্ন পাথরের রাশি আছে।

যুবক। আপনি যাহা আদেশ করিবেন তাহাই করিব।

বৃদ্ধ। আমার সঙ্গে সঙ্গে এস।

তখন বৃদ্ধ এবং যুবক উভয়েই বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন। উভয়েই সেই ভগ্ন প্রাচীর হইতে এক সঙ্গে লাফ দিলেন। উভয়েই নির্ব্বিঘ্নে সর্ব্ব বিপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া গড়-দ্বারে পৌঁছিলেন।

বৃদ্ধ কহিলেন,—"ঐ দেখ,—আমার দুর্গ। আমি রাজা। ঐ গড়ের মধ্যে রাজপ্রাসাদ আছে, রাজসিংহাসন আছে, মন্ত্রী আছে, গায়ক আছে, সৈন্য আছে। এস্থানে অন্তত একশত লোক বেশ থাকিতে পারে। ঐ একশত লোকের নিমিত্ত দুই বৎসরের আন্দাজ আহারীয় সামগ্রী এখানে সংগৃহীত আছে।"

যুবক। কৈ,—কোন লোককেইত এখন দেখিতে পাইতেছি না!

বৃদ্ধ তখন একরকম অস্ফুটধ্বনি করিলেন। অমনি চারিজন চৌকিদার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। তাহাদের আকার দীর্ঘ;

কেশ কুঞ্চিত; বক্ষ প্রশস্ত; রঙ্ কৃষ্ণবর্ণ; দেহ দৃঢ়; চক্ষু রক্তবর্ণ; হস্তে লৌহমণ্ডিত বংশ-লগুড়। তাহারা আসিয়াই বৃদ্ধের পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া পায়ের ধূলা লইয়া মাথায় দিল। বৃদ্ধ তাহাদিগকে বলিলেন,—"সঙ্গে আমার অতিথি। ইহাঁর পূজা করিতে হইবে।" চৌকিদারচতুষ্টয় যুবককেও ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ করিল।

তখন বৃদ্ধ অগ্রে অগ্রে, যুবক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গড় মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দুই জন চৌকিদার সেই বৃহৎ বৃক্ষে উঠিয়া পাহারা দিতে লাগিল। অন্য দুই জন গড় দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

যুবক কালাচাঁদ; বৃদ্ধ রঘুনাথ রায়। যুবক পাঠকের পরিচিত; বৃদ্ধ অপরিচিত।

কালাচাঁদ শিষ্য; বৃদ্ধ গুরু।

রঘুনাথ রায় ব্রাহ্মণ। নিবাস বর্দ্ধমান জেলার কোন পল্লীগ্রামে। তিনি প্রাচীন জমীদার বংশে সমুদ্ভূত।

এগার বৎসর বয়সে রঘুনাথের পিতার মৃত্যু হয়। দ্বাদশ বর্ষ হইতে রঘুনাথ প্রবল-প্রতাপ।

বিষয়ের আয় বিশহাজারের অধিক ছিল না। কিন্তু দেশ মধ্যে রঘুনাথের পিতৃ-পিতামহের নামখ্যাতি, পসার-প্রতিপত্তি রাজ্যেশ্বর রাজা অপেক্ষাও অধিক ছিল। রায়েদের জমীদারীর প্রজাগণ কখন আইন আদালত জানিত না; কখনও জজ-মাজিষ্টর চিনিত না; লাট বড় লাট বুঝিত না। জানিত, চিনিত, বুঝিত কেবল,—রায়-বংশের বাবুগণকে।

অসম্পূর্ণ।

বড় দুঃখে এইখানে কালাচাঁদকে শেষ করিতে হইল। কালাচাঁদ-রচয়িতা স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় কালাচাঁদ গ্রন্থের এই পর্য্যন্ত প্রকাশ করিয়া আর প্রকাশ করেন নাই। এমন কি, পঞ্চম পর্ব্বে দ্বাদশ পরিচ্ছেদটী আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত করেন নাই। পঞ্চম পর্ব্বে যে পর্য্যন্ত প্রকাশ হইয়াছিল, তৎসহ যে "প্রকাশকের নিবেদন" প্রকাশ হয়, তাহা এই :—

"এবার কালাচাঁদের পঞ্চম পর্ব্ব সম্পূর্ণ হইল না। পঞ্চম পর্ব্ব বৃহৎ—আগামী বারে শেষ হইবে।

কালাচাঁদ উপন্যাসের এখনও প্রকৃত গল্প-ভাগ আরম্ভ হয় নাই; এখনও সেই প্রাথমিক ভূমিকা চলিতেছে! ষষ্ঠ পর্ব্ব— চম্পকলতা। সেই চম্পকলতা হইতেই গীতের আরম্ভ হইবে।"

দ্বাদশ পরিচ্ছেদের যতটুকু লেখা হইয়াছিল, ততটুকুই গ্রন্থকার প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। একাদশ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার যে যুবক ও বৃদ্ধের পরিচয় দিয়াছেন। সেই পরিচ্ছেদে বলিয়া দিয়াছেন— যুবক—কালাচাঁদ, বৃদ্ধ—রঘুনাথ রায়। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে সেই বিখ্যাত রায় জমীদার বংশের বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সে পরিচ্ছেদ আর তিনি শেষ করিয়া যান নাই। তবে বলা বাহুল্য পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ-বর্ণিত রঘুনাথ রায় এই বিখ্যাত রায় জমীদার বংশেরই বংশধর। কালাচাঁদ এই রঘুনাথ রায়েরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরু শিষ্যে মিলিত হইয়া কি মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহা আর প্রকাশ হইল না। বঙ্গসাহিত্যের অতিশয় দুরদৃষ্ট যে, এমন মহা-উপন্যাস গ্রন্থকার শেষ করিয়া গেলেন

না। অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের ন্যায় যে উপন্যাসকে অষ্টাদশ পর্ব্ব করিবার গ্রন্থকারের সংকল্প ছিল; সে উপন্যাসের পঞ্চম পর্ব্বও তিনি সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। আমরা জানি, এই পর্ব্বের পর গ্রন্থকার 'চম্পকলতা' নামে এক পর্ব্ব লিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহার লেখাও শেষ হয় নাই। ছাপাও হয় নাই এবং সে লেখাও এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাহাতে প্রকাশ করিবার জন্য দুই তিনটী ছবি পর্য্যন্ত খোদিত হইয়াছিল। সে ছবিগুলিও এখন পাওয়া যায় না। তবে তাহার দুইটী ছবি আমরা দেখিয়াছি। একটী ছবি—কালাচাঁদ ঠাকুরদাদা প্রভৃতি সকলে মিলিয়া হরিসংকীর্ত্তনের মধ্যে নাচিতেছেন। আর একটী ছবি—সুরেশ চুপি চুপি একটী কুলস্ত্রীকে ফুসলাইয়া তাহার বাটী হইতে বাহির করিয়া আনিতেছে। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য এমন মহা উপন্যাস অসম্পূর্ণ থাকিয়া গেল।

প্রকাশক।

ভূমিকা।

কালাচাঁদ অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর অষ্টাদশ পর্ব্ব। লোকের ভাল লাগিবে কি না সন্দেহ। ঔষধ কখন মিষ্ট হয় না। তথাচ বুদ্ধিমান ব্যক্তি ঔষধ-সেবনে বিমুখ নহেন। সেই এক আশা।

কালাচাঁদ-গ্রন্থের প্রথম এবং দ্বিতীয়-পর্ব্ব নায়িকা-ছুট্। ছবি-ছুট্ তাস বরং খেলিতে পারি, বায়ু-ছুট্ পৃথিবীতে বরং বাস করিতে পারি, কিন্তু এ কলিকালে নায়িক-ছুট্ উপন্যাস কখন পড়িতে পারি না। প্রথম পর্ব্বদ্বয় যেন বাবলা গাছের বিষম গাঁট্;—কঠিন, নীরস, শুষ্ক।

এই অষ্টাদশপর্ব্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে ধৈর্য্য চাই এবং আরও কিছু চাই।

কলিকাতা,
২রা পৌষ, ১২৯৬। } শ্রী———

বঙ্গবাসী পুস্তক-বিভাগ।

সর্ব্বসাধারণের জন্য বিক্রয়ার্থ।

	পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১।	বর্দ্ধমান রাজবাটীর মহাভারত	৫৲	০	৸৴৹
২।	পঞ্চদশী (মূল টীকা ও অনুবাদ)	১৷৹	১৲	৷৹
৩।	পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১৷৹	১৲	৷৵৹
৪।	বিষ্ণুপুরাণম্	৸৵৹	৸৹	৴৹
৫।	গরুড়পুরাণম্	১৷৹	১৲	৷৴৹
৬।	মহানির্ব্বাণ তন্ত্রম্	॥৵৹	॥৹	৷৴৹
৭।	কবিকঙ্কণ চণ্ডী	৸৹	॥৵৹	৴৹
৮।	হরিবংশ (বঙ্গানুবাদ)	১৷৹	১৲	৷৵৹
৯।	চৈতন্য-চরিতামৃত	৸৵৹	৸৹	৷৹
১০।	লিঙ্গপুরাণ (বঙ্গানুবাদ)	৸৵৹	৸৹	৷৹
১১।	জগৎমঙ্গল ও চমৎকার-চন্দ্রিকা	৷৴৹	৷৹	৵৹
১২।	ভক্তিরত্নাবলী	৷৵৹	৷৹	৶৹
১৩।	ব্রতমালা-বিধান	৸৹	॥৵৹	৷৹
১৪।	রাসেলাস (তারাশঙ্কর তর্করত্ন-প্রণীত)	॥৵৹	॥৹	৶৹
১৫।	ক্ষুদিরাম (শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত)	॥৹	৷৵৹	৶৹
১৬।	চৈতন্যমঙ্গল	॥৵৹	॥৹	৷৹

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
১৭। কূর্ম্মপুরাণ (অনুবাদ)	৸৹	။৶৹	।৹
১৮। তুলসীদাসী রামায়ণ	৸৹	။৶৹	।৹
১৯। বামনপুরাণম্	১॥৹	১।৹	।৶৹
২০। অদ্ভুত রামায়ণ (মূল ও অনুবাদ)	॥৶৹	॥৹	৶৹
২১। ভরতপুর যুদ্ধ (শ্রীযুক্ত বিহারী-লাল সরকার প্রণীত)	॥৶৹	॥৹	।৹
২২। সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ ৩য় খণ্ড	॥৹	।৶৹	।৹
২৩। সঙ্গীত-তরঙ্গ (৺রাধামোহন সেন প্রণীত)	৸৹	॥৶৹	।৹
২৪। পুরুষ-পরীক্ষা (৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত	।৹	৶৹	৶৹
২৫। প্রবোধ-চন্দ্রিকা (৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত)	।৹	৶৹	৶৹
২৬। কৌতুক-বিলাস	।৹	৶৹	৶৹
২৭। হরিদাস সাধু (শ্রীরঙ্গলাল মুখো-পাধ্যায় প্রণীত)	।৶৹	।৹	৶৹
২৮। কঙ্কাবতী (শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত	॥৹	।৶৹	৶৹
২৯। বঙ্গভাষার লেখক	॥৶৹	॥৹	।/৹
৩০। চিনিবাস চরিতামৃত ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত	॥৶৹	॥৹	।৹
৩১। আলালের ঘরের দুলাল টেকচাঁদ ঠাকুর প্রণীত	॥৹	।৶৹	।৹

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
৩২। শিবায়ন	।৶০	।০	⁄০
৩৩। কৃষ্ণমঙ্গল	॥৶০	॥০	।০
৩৪। স্তবমালা	॥০	।৶০	।০
৩৫। কুলীনকুলসর্ব্বস্ব নাটক (৺রামনারায়ণ তর্করত্ন প্রণীত)	।৶০	।০	৶০
৩৬। শ্রীরামরসায়ন (৺রঘুনন্দন গোস্বামী প্রণীত)	১।০	১	।৵০
৩৭। শ্রীশ্রীভক্তমাল (শ্রীমৎ কৃষ্ণ-দাস কৃত)	৸০	॥৶০	।০
৩৮। অদ্ভুত রামায়ণ (বাঙ্গলাপদ্য)	।৵০	।⁄০	৵০
৩৯। পঞ্চতন্ত্র (অনুবাদ)	৸০	॥৶০	।০
৪০। কাদম্বরী (অনুবাদ)	॥৶০	॥০	।০
৪১। শ্রীশ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম	⁄০	০	⁄০
৪২। ভূত ও মানুষ (শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত	॥০	।৶০	।০
৪৩। খিল হরিবংশ (মূল)	১।০	১৲	।৶০
৪৪। দেবীপুরাণ (মূল ও অনুবাদ)	১৲	৸৶০	।⁄০
৪৫। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (মূল)	১॥০	১।০	।৶০
৪৬। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ (অনুবাদ)	১৸০	১॥০	॥০
৪৭। রাজাবলী ৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা-লঙ্কার প্রণীত)	৸০	॥৶০	৵০
৪৮। বত্রিশ সিংহাসন (৺মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রণীত	॥৵০	॥০	

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
৪৯। শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী (৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত)	১৸৹	১।৹	।৶৹
৫০। ৬১ বৎসরের পুরাতন পঞ্জিকা	২৲	১।৹	॥৶৹
৫১। পুরাতন পঞ্জিকার পরিশিষ্ট	॥৹	।৶৹	।৹
৫২। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্ (মূল)	১।৹	১৲	।৶৹
৫৩। উৎকলখণ্ড (মূল ও বাঙ্গনুবাদ)	৸৹	৶৹	।৹
৫৪। বৈষ্ণবপদলহরী	১।৹	১৲	।৵৹
৫৫। বাঙ্গালীর গান	১॥৹	১।৹	॥৹
৫৬। ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী	৸৹	॥৶৹	।৹
৫৭। মডেল ভগিনী (৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত)	১।৹	৸৹	।৹
৫৮। হাতেমতাই	।৶৹	।৹	৶৹
৫৯। করোনেশন আলবম	৹	।৶৹	৶৹
৬০। বঙ্গে বর্গী	॥৶৹	॥৹	।৹
৬১। বৈশেষিক-দর্শনম্ (মূল, টীকা ও অনুবাদ)	২৲	১৸৹	।৶৹
৬২। তিথিতত্ত্বম্ (মূল, টীকা ও অনুবাদ)	২৲	১৸৹	।৶৹
৬৩। শ্রীশ্রীজগন্নাথমঙ্গল ৺বিশ্বম্ভর দাস বিরচিত	॥৶৹	॥৹	৶৹
৬৪। ৺কৃষ্ণমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী যাত্রার পালা	১।৹	১৲	।৹
৬৫। মন্দীরাবণের আত্মকথা (৺যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত)	।৵৹	।৹	৶৹

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
৬৬। মজার গল্প—(শ্রীত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত)	‖৹	।৶৹	৶৹
৬৭। কাশীরাম দাসের মহাভারত	২‖৹	২।৹	‖৶৹
৬৮। কৃত্তিবাস বিরচিত রামায়ণ	১।৹	১৲	।৵৹
৬৯। বরাহপুরাণম্ (মূল ও বঙ্গানুবাদ)	১‖৹	১।৹	।৶৹
৭০। পদ্মপুরাণম্ স্বর্গখণ্ডম্ (মূল ও অনুবাদ)	৸৹	‖৶৹	।৹
৭১। বিদ্যাসুন্দর (৺রামপ্রসাদ সেন প্রণীত)	‖৶৹	‖৹	।৹
৭২। অধ্যাত্ম-রামায়ণম্ (মূল ও অনুবাদ)	৸৶৹	৸৹	।৵৹
৭৩। ধর্ম্মসিদ্ধান্তঃ (শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন প্রণীত)	৸৹	‖৶৹	।৹
৭৪। কাশীখণ্ড (৺রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল প্রণীত)	১৲	৸৹	।৶৹
৭৫। ৺ব্রজমোহন রায়ের পাঁচালী	৸৹	‖৶৹	।৵৹
৭৬। মেঘনাদবধ কাব্য (শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত)	১৲	৸৹	।৵৹
৭৭। শিবপুরাণম্	২৸৹	৹	।৵৹
৭৮। অগ্নিপুরাণম্	২৲	৹	।৶
৭৯। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণম্	১।৹	১	।৵৹
৮০। রত্নাবলী	‖৶৹	‖৹	৶৹

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
৮১। মহারাণী স্বর্ণময়ী	।/০	০	৶০
৮২। কলিকাতার ইতিহাস	৸০	॥৶০	।০
৮৩। শিখ-ইতিহাস	২৲	০	॥০
৮৪। স্বাধীনতার ইতিহাস	২৲	০	॥০
৮৫। ভজহরি সর্দ্দার	।৶০	।/০	৶০
৮৬। My Dairy in India—by Milton Howard Russel Vol II	১।০	০	।/০
৮৭। Narratives of Bengal by Francis Glodwin	১।০	০	।/০
৮৮। Disaster of Afganistan, by Lady Sale	১।৶০	০	।/০
৮৯। My Dairy in India (By William Howard Russel) Vol I	১৲	০	।০
৯০। Historical Fragments of the Mogol Empire (by Robert Orme)	১॥০	০	।/০
৯১। Tavernier's in India	১॥৶০	০	॥০
৯২। Thirty Five Years in the East by Honigberger	১।০	০	।/০
৯৩। A Visit to Europe by T, N, Mukherji	৸০	০	।/০
৯৪। History of the Sikhs by I. J. P. Cunningham	২৲	০	।৶০
৯৫। Emperor Humayun's life by Major Charles Stewart	১৲	০	।০

পুস্তকের নাম	বাঁধা	আবাঁধা	ডাঃমাঃ
৯৬। "Ratnavali" by Michael Madhusudan Dutt	।৹	৹	।৹
৯৭। "Sarmishta" by Michael Madhusudan Dutt	।৹	৹	।৹
৯৮। Indian Tracts by Major John Scott and Warren Hastings	।৹	৹	।৹
৯৯। Two Months in Arrah in 1857, by John James Halls	।৹	৹	।৹
১০০। Native Fidelity (Authorship is ascribed to late Babu Krishna Das Pal)	১৲	৹	।√৹
১০১। Auto-biographical Memoirs to Emperor Jehanghir	১৲	৹	।√৹
১০২। Stewart's History of Bengal	১।৹	৹	।√৹
১০৩। Travels in Hindustan by Bernier	১॥৹	৹	।৶৹

ইহা ব্যতীত বঙ্গবাসী কলেজের স্বনামধন্য প্রিন্সপাল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু এম-এ প্রণীত নিম্নলিখিত কয়েকখানি পুস্তক নিম্নলিখিত মূল্যে বিক্রয়ার্থ আছে।

পুস্তকের নাম	মূল্য	ডাঃমাঃ।
১। বিলাতের পত্র ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে	।৶৹	৶৹
২। ইংরেজ-চরিত ১ম ও ২য় খণ্ড	॥৹	৴৹
৩। ইউরোপ-ভ্রমণ	॥৹	৴৹
৪। ছায়া, (পদ্য গ্রন্থ) ইংরেজ কবি টেনিসের পদ্যের ছায়া অবলম্বনে এক বিদুষী বঙ্গমহিলা কর্ত্তৃক লিখিত	॥৹	।৹

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

উপরের লিখিত গ্রন্থগুলি 'বঙ্গবাসীর' গ্রাহক বা বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠান হয় না। গ্রাহক না হইলেও, সকলে ক্রয় করিতে পারেন। সকলে আমার নামে মণিঅর্ডার দ্বারা টাকা পাঠাইবেন। বাঁধাই কি বা আবাঁধাই পুস্তক লইবেন, সকলে যেন তাহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠান। একই রকম পুস্তক যদি কেহ অধিকসংখ্যক ক্রয় করেন, বলা বাহুল্য, তিনি কোনরূপ কমিশন বা "ফাউ" স্বরূপ সেই পুস্তকের অতিরিক্ত একখানি পাইবেন না।

শ্রীবরদাপ্রসাদ বসু।

কার্য্যাধ্যক্ষ, বঙ্গবাসী আফিস।

৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

M.

কালাচাঁদ।

(মহা-উপন্যাস।)

মডেল ভগিনী, চিনিবাস-চরিতামৃত, শ্রীশ্রীরাজলক্ষ্মী, নেড়া
হরিদাস প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু প্রণীত।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৩৮।২নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ইলেক্‌ট্রোমেসিন-প্রেসে,
শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১৫ সাল।

মূল্য ৩ তিন টাকা মাত্র।

প্রকাশকের নিবেদন।

বহু পাঠকের অনুরোধে আবার অসম্পূর্ণ "কালাচাঁদ" প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয় এই কালাচাঁদ গ্রন্থ ক্রমশঃ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করিয়া শেষ করিয়া যাইবেন, এরূপ আশা ভরসা আমরা করিয়াছিলাম। তিনি আমাদিগকে এইরূপই আশা-ভরসা দিয়াছিলেন। বাঙ্গালী পাঠকবর্গও এইরূপ আশা-ভরসা পাইয়াছিলেন। কিন্তু হায়, এ মহা-উপন্যাসের সমাপ্তি আর হইল না। স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্রের অকাল লোকান্তরই এই অসমাপ্তির কারণ। এ মহা-উপন্যাসের সমাপ্তি আর কে করিবে?

এমন ভাষা, এমন ভাব, এমন অলঙ্কার, এমন ঝঙ্কার, এমন স্বভাব বর্ণন, এমন চরিত্র-অঙ্কন, বাঙ্গালায় আর কোন উপন্যাসে আছে কি? স্বর্গীয় যোগেন্দ্র চন্দ্র প্রকৃতই বাঙ্গালা উপন্যাসে অভাবনীয় অভূতপূর্ব্ব ভাবভঙ্গীর অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গসাহিত্যের দুর্ভাগ্য, এ গ্রন্থের সমাপ্তি হইল না। তবে সৌভাগ্যের কথা এই, ভবিষ্যতে বাঙ্গালায় মহা-উপন্যাস লিখিবার নিদর্শন রহিয়া গেল। যতটুকু প্রকাশিত হইল, ততটুকুই যে মহা-উপন্যাসের আদর্শ, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা চারি শত পৃষ্ঠারও অধিক। এ গ্রন্থ সমাপ্ত হইলে, কি বৃহৎ মহাভারতের আকার ধারণ করিত, ভাবিয়া দেখুন। যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থে যে সব বর্ণনা আছে, তাহার এক একটি পড়িলেই, যেন এক একখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস পাঠের

সরাস্বাদ পাওয়া যায়। ফল কথা, এ গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া অবশ্য আক্ষেপ হইতে পারে, কিন্তু এ অসম্পূর্ণ গ্রন্থ পড়িয়াই যে সুখটুকু হয়, তাহা অতুলনীয়। এই অসম্পূর্ণ গ্রন্থ সাধারণ্যে সমাদৃত হইয়াছে দেখিয়া, আমরা পুনরায় এই গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম। আশা করি, মহা উপন্যাসের নূতনত্ব নিদর্শন-স্বরূপ এ গ্রন্থ বাঙ্গালার গৃহে গৃহে পূর্ব্ববৎ সমাদৃত হইবে; আর বাঙ্গালী পাঠক ইহার নিতুই নব-রসাস্বাদে প্রীতি লাভ করিবেন।

প্রকাশক।